হাজার রহস্যের দ্বীপ
ঈস্টার আয়ল্যাণ্ড

অদ্রীশ বর্ধন

[ঈস্টার দ্বীপে একটি সত্যানুসন্ধানী বৈজ্ঞানিক অভিযানের অ্যাডভেঞ্চার-
কাহিনী অবলম্বনে]

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

সূচীপত্র

ঈস্টার দ্বীপের পাখী-মানুষ ও আকু-আকু প্রেত-

ভূমিকা □ □ □ □ □ □ □ □
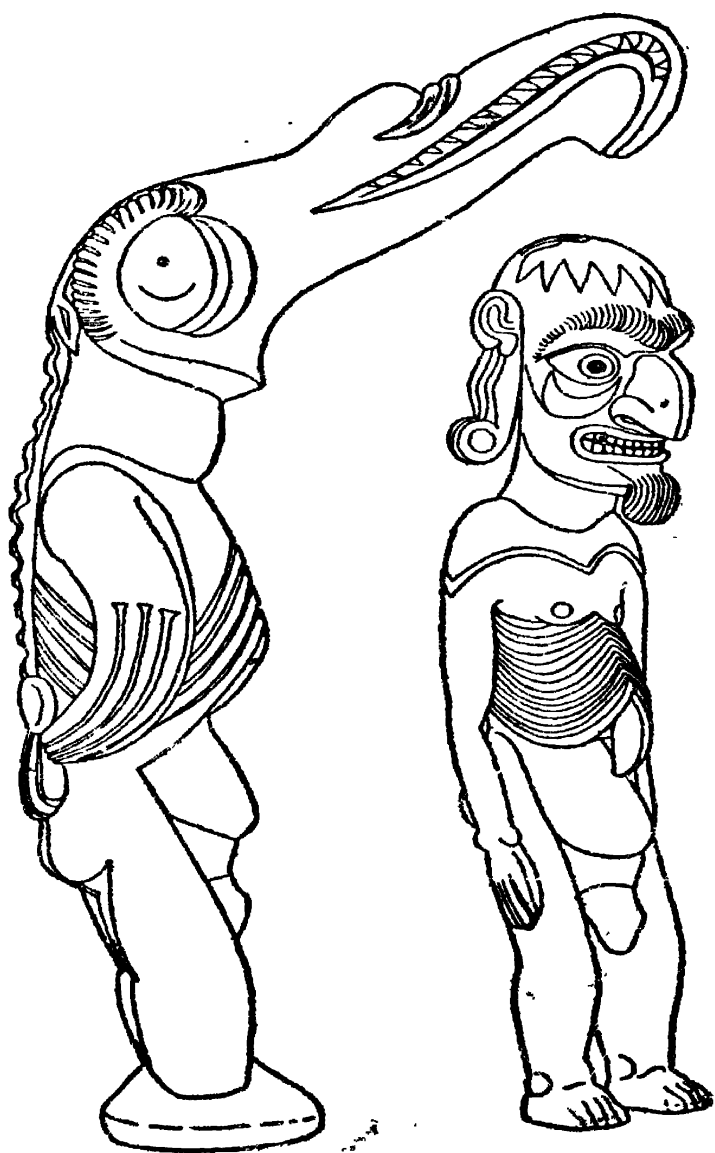
হাজার রহস্যের দ্বীপ ঈস্টার আয়ল্যাণ্ড নিয়ে সারা পৃথিবী এখন সরগরম। থর হেইয়ারডাহ্ল নামে এক ডানপিটে অ্যাডভেঞ্চারিস্ট ১৯৫৩ আর ১৯৫৫ সালে গ্যালাপাগোস্ আয়ল্যাণ্ডে আর ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডে গেছিলেন এই রহস্যের টানে। রহস্য দ্বীপের দানবিক প্রস্তর মূর্তিগুলো প্রথম তৈরী হল কি ভাবে এবং খাড়া করাই বা হল কি ভাবে, রোমাঞ্চকর সেই গবেষণা বৃত্তান্তই রইল এই গ্রন্থে। মহাডানপিটে এই নরওয়েবাসী প্যাপিরাসের নৌকায় চেপে মরক্কো থেকে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন প্রাচীন মিশরীয়রা যে এই ভাবেই মেক্সি-কো, পেরু আর চিলি:তে বসতি স্থাপন করেছিলেন—এই অনুমিতি প্রমাণ করার জন্যে। এ ছাড়াও কাঠের গুঁড়ির ভেলায় চেপে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে ইনি প্রমাণ করেছিলেন যে হাজার বছর আগে ডবল ক্যানো বা কাঠের ভেলায় চেপে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেওয়ার সম্ভাবনাটা অসম্ভব না হলেও হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা কিন্তু ভেবেছিলেন এমনটি সম্ভব নয় কোন মতেই।

এ কাহিনী গোয়েন্দা কাহিনীর চাইতেও শ্বাসরোধী এবং দ্রুতগতি। এই পৃথিবীর অনেক অব্যাখ্যাত রহস্য-কাহিনী লিখে দানিকেন যাঁদের মন কেড়ে নিয়েছেন, চাঞ্চল্যকর এই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী তাঁদের মন ভরিয়ে দেবেই।

১। পৃথিবীর শেষ প্রান্তে ছুটলেন কেন গোয়েন্দারা

ঈস্টার আয়ল্যাণ্ড পৃথিবীর সবচেয়ে নির্জন জায়গা—অথচ সেখানে মানুষ থাকে। নিরালা এই দ্বীপ একেবারেই একটেরে। সব চেয়ে কাছের ডাঙা যত কাছে মনে হয় আকাশের গ্রহনক্ষত্ররা বুঝি তারও কাছে। দ্বীপের মানুষরা গ্রহনক্ষত্রের নাম যতটা জানে, নিজেদের গ্রহের অন্যান্য দেশ বা শহরের নাম ঠিকানা তেমনটা জানে না।

দ্বীপটা সূর্যের পূবদিকে, চাঁদের পশ্চিমদিকে। কলম্বাস আমেরিকায় সাদা মানুষদের নিয়ে যাওয়ার আগে মানব জাতি অনেক বিচিত্র খেয়ালে মগ্ন ছিল বহুদূরের এই দ্বীপে। ইউরোপের মানুষ যখন জিব্রাল্টারেই পৃথিবীর শেষ, এই ধারণা নিয়ে নিশ্চিন্ত—তার অনেক আগেই দক্ষ নাবিকরা পৌঁছে গিয়ে-

ছিল প্রশান্তের মধ্যে বিন্দুর মত ছোট্ট এই দ্বীপে। পৃথিবীর নিজ'নতম পুঁচকে এই দ্বীপে তারা গাঁইতি শাবল ছেনি হাতুড়ি দিয়ে পাথর কুঁদে কেল্লা বানায় নি—বানিয়েছে মনুষ্যাকৃতি দানবিক প্রস্তর মূর্তি। বাড়ীর মত লম্বা আর রেলওয়াগনের মত ভারী ভারী মূর্তিগুলোকে তারা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছে দ্বীপের চারিদিকে।

অত্যাশ্চর্য এই ইঞ্জিনীয়ারিং সম্ভব হল কি করে, প্রশ্ন সেইটাই। যন্ত্র যুগ শুরু হওয়ার অনেক আগে এহেন অসম্ভবকে তারা সম্ভব করল কি করে? আজও কেউ জানে না এই প্রশ্নের জবাব। মূর্তিগুলো কিন্তু আজও খাড়া দ্বীপের চারিদিকে। মূর্তি যারা গড়েছে, মারা যাবার পর তাদের দেহ গোড় দেওয়া হয়েছে দানবিক এই পাথরের মূর্তিদের পায়ের কাছে। তারপরেই অকস্মাৎ একদিন স্তব্ধ হয়েছিল শাবল গাঁইতি ছেনি হাতুড়ির খটাং খটাং শব্দ। কেননা, যন্তরগুলো আজও দেখা যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে হেথায় সেথায়—অনেক মূর্তিও শেষ পর্যন্ত খোদাই হয় নি। রহস্য তমিস্রায় চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে রহস্যাবৃত ভাস্বররা।

কেন? কি ঘটনা ঘটেছিল ঈস্টার দ্বীপে? কেন মূর্তি গড়া অসমাপ্ত রেখে বিদায় নিয়েছিল কারিগররা?

থর হেইয়ারডাহ্‌ল ম্যাপ বিছিয়ে এই সব কথাই চিন্তা করেছিলেন ঈস্টার দ্বীপে রওনা হওয়ার আগে। প্রশান্ত মহাসাগরকে সবে তখন চিনতে আরম্ভ করেছেন পর-পর কয়েকটা অভিযানের পর। মারকুইসাস দ্বীপপুঞ্জের বন্য উপ-ত্যকায় ছিলেন নেটিভ কায়দায় দীর্ঘদিন—পলিনেশিয়ানরা যে-চোখ দিয়ে প্রকৃতিকে দেখে, সেই চোখে দেখতে শিখেছিলেন। মানুষ-দেবতা টাইকাই-য়ের গল্প শুনেছিলেন। কোন্‌টাইকি ভেলা নিয়ে টুয়ামোটো দ্বীপপুঞ্জের প্রবাল দ্বীপে নেমেছিলেন এবং জেনেছিলেন সাউথ আমেরিকা থেকে বহুদূরবর্তী এই সব দ্বীপে যাওয়ার হাওয়া এবং স্রোতে কখনোই ভাঁটা পড়ে না বলে ইঙ্কা-ইণ্ডিয়ানরা বালসা কাঠের ভেলা নিয়ে কিভাবে পাড়ি জমিয়েছিল দূরের এই সব দ্বীপে। গ্যালাপাগোস্‌ দ্বীপপুঞ্জের ক্যাকটাস অরণ্যে মাটি খুঁড়ে পেয়েছিলেন সুপ্রাচীন অভিযানের নিদর্শন—ভাঙা জারের টুকরো। ইঙ্কাদের সভ্যতার চিহ্ন।

গ্যালাপাগোস্‌ দ্বীপপুঞ্জে আগে কেউ যায় নি বলেই ভাঙা জারের টুকরো-গুলো দেখতে পায় নি। থর হেইয়ারডাহ্‌ল কিন্তু খুঁজে পেতে ১৩০টা বিভিন্ন জার পেয়েছিলেন। ডিটেকটিভরা ফিংগারপ্রিন্ট পরীক্ষা করে যে ভাবে, শীর্ষস্থানীয় মার্কিন বৈজ্ঞানিকরা জারগুলো দেখেছিলেন সেইভাবে।

বলেছিলেন, কলম্বাস আমেরিকার দ্বার খুলে দেওয়ার হাজার বছর আগে সেখান্‌কার ইন্কা অভিযাত্রীরা খুলে দিয়েছিল প্রশান্তের দ্বার—বারংবার দর্শনদান করে গিয়েছিল বহুদূরের গ্যালাপাগোস্‌ দ্বীপগুলোয়। ভাইকিংরা আইস্‌ল্যাণ্ডে অভিযান চালানোর অনেক আগেই তারা পলিনেশিয়ার দ্বীপ-গুলোয় বসতি স্থাপন করেছিল। সেখানে তারা মাছ ধরেছে, তুলোর চাষ করেছে। তারপর সহসা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে দিয়ে অজ্ঞাত কারণে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে।

আমাজন নদীর চেয়ে খরস্রোতা এবং তার চাইতে একশগুণ চওড়া ভয়ং-কর সমুদ্রস্রোত এই গ্যালাপাগোস্‌ দ্বীপপুঞ্জে এসে আবার বেরিয়ে গিয়ে কয়েক সপ্তাহ পরে আছড়ে পড়েছে সাউথ-সী'র দ্বীপগুলোয়।

খরস্রোতা এই স্রোতের সবচেয়ে দক্ষিণের শাখাপ্রশাখার প্রান্তে বিন্দুর মত একটা ফোঁটা—ঈস্টার আয়ল্যাণ্ড। কে যেন একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন এঁকে রেখেছে ফোঁটা-টার পাশে। প্রস্তর যুগের মানুষরা একটেরে নিরালা পাণ্ডব-বর্জিত এই দ্বীপে যখন যেতে পেরেছে—থর হেইয়ারডাহ্‌লই বা পারবেন না কেন?

ঈস্টার আয়ল্যাণ্ড চিলি-র অন্তর্ভুক্ত। বছরে একবার একটা যুদ্ধজাহাজ যায় সেখানে—বাসিন্দাদের জন্যে খাবারদাবার নিয়ে—তারপর ফিরে যায় চিলিতে। বহির্জগতের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ নেই ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের।

যুদ্ধজাহাজ ওখানে সাতদিন দাঁড়ায়। সুতরাং যুদ্ধজাহাজে গেলে সাত দিনে ঈস্টার দ্বীপে অভিযান সম্পূর্ণ হবে না। বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে বছর-খানেকের জন্য যাওয়া যায়। কিন্তু মাস ফুরোলেই পালাই-পালাই করবেন তাঁরা মনের মত কিছু সেখানে না পেলে। ভেলায় চড়ে গেলেও পুরাতত্ত্ব-বিদরা কেউ সঙ্গ নেবেন না—অথচ তাঁদের একান্ত দরকার এ-হেন অভিযানে।

কাজেই নিজের জাহাজ নিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঈস্টার দ্বীপে পনেরো দিনেই হাঁপিয়ে উঠলে অথবা খোঁড়াখুঁড়ি করে কিছু না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লে ঐ জাহাজেই নিয়ে যাওয়া যাবে ধারে কাছে অগুন্তি দ্বীপে। জাহাজ-টাও বিলক্ষণ বড় হওয়া চাই। কেননা, ঈস্টার দ্বীপে জাহাজঘাটা নেই, নোঙর ফেলবার তেমন ভাল জায়গা নেই, তেল নেই, জল নেই।

সমস্যার সমাধান করে দিল টমাস অ্যাণ্ড উইলহেম জাহাজ কোম্পানী। পাওয়া গেল একটা ডিজেল চালিত দেড়শ ফুট লম্বা জাহাজ—যার গতিবেগ

ঘণ্টায় বারো নট এবং যার খোলের মধ্যে পঞ্চাশ টন জল আর ১৩০ টন তেল নিয়ে যাওয়া যাবে অনায়াসেই। এর পরেই পাওয়া গেল মাছ ধরা একটা জাহাজ। বেশ বড়। তবে তাতে খালাসী লস্কর কিছু নেই। সব ব্যবস্থা করে নিতে হবে। জাহাজ কোম্পানীর উদ্যোগে লাইসেন্স ইত্যাদি পাওয়া গেল। ঠিক হল পাঁচজন পুরাতত্ত্ববিদ, একজন ডাক্তার, একজন ফটোগ্রাফার, তেরোজন খালাসীলস্কর, বাড়তি যন্ত্রাংশ, বিশেষ সরঞ্জাম, এক বছরের রসদ নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসে রওনা হতে হবে এই জাহাজেই।

শুরু হয়ে গেল তোড়জোড়। চার মাস বাকী বটে, কিন্তু কাজ তো অনেক, তাই পাশপোর্ট, চিঠি, লাইসেন্স, ফটোগ্রাফ, কাগজপত্র নিয়ে হিমসিম খেতে লাগলেন থর হেইয়ারডাহ্ল। হরেক রকম চার্ট, লিস্ট আর গীয়ারের নমুনা ছত্রাকার হয়ে রইল টেবিলের ওপর। পাগলামি অচিরেই সংক্রামিত হল সারা বাড়ীতে। কোরাস বাজনা বাজতে লাগল সদর দরজার কলিং বেল আর টেলিফোনের ঘণ্টাধ্বনির। সাড়া দিতে গিয়ে টপকে যেতে হল পার্শেল, প্যাকিং কেস আর বিবিধ সরঞ্জামের স্তূপ।

এরই মধ্যে টেলিফোন করা হল অসলো-র এক পাইকারী দোকানদারকে। নকল দাঁতের জন্য যে প্লাস্টার পাওয়া যায়, এখুনি তা একটন পাঠিয়ে দিতে হবে। দোকানদার গম্ভীরভাবে জানতে চাইলে, কার দাঁতে ব্যথা উঠেছে জানা যাবে কী?

'ব্যথা নয়, ব্যথা নয়', খেঁকিয়ে উঠলেন থর হেইয়ারডাহ্ল। 'ঈস্টার দ্বীপের দানবমূর্তির ছাঁচ তোলা হবে।'

টেলিফোন রাখতে না রাখতে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল থরের গৃহিণী ইভোনি, দু-হাতে একগাদা পার্শেল। আবার বাজল টেলিফোন, ধরল ইভোনি। ধরেই রিসিভার কান থেকে সরিয়ে বললে—'ভুল অর্ডার গেছে মনে হচ্ছে। দু-শো পাউণ্ড বঁড়শি নিয়ে কি হবে? দু-টন শুঁটকি মাছ তো নিচ্ছি।'

অতি কষ্টে ধৈর্য ধরে থর বললেন—'কি মুস্কিল! হাজার গজ রঙিন কাপড় নিয়েছি কেন বলো তো? নেটিভদের মন জয় করার জন্যে। বঁড়শিও নিচ্ছি সেই জন্যে।'

ইভোনি বললে—'ভালই করেছো। শোনো, সেকেণ্ড ইঞ্জিনীয়ার টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে সাউথ-সী আয়ল্যাণ্ডে তার বউ তাকে যেতে দেবে না।'

থর তৎক্ষণাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের ওপর। টেনে বার করলেন আর একজন ইঞ্জিনীয়ারের দরখাস্ত।

টেলিফোন আর কলিংবেলের ঐকতানের মধ্যে আবির্ভূত হল এক বিচিত্র মূর্তি।

ফিস ফিস করে বলে গেল, 'সাবধান! সাবধান। ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের প্রত্যেকটা দানব মূর্তির মধ্যে আছে একজন মানুষ।'

'মানুষ!' থর তো হতবাক্।

'হ্যাঁ, রাজা। মরবার পর রেখে দেওয়া হয়েছে মূর্তির ভেতরে—ঠিক যেভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে মিশরের রাজাদের পিরামিডের ভেতরে। একদিন এরা জাগবে—মূর্তি ভেঙে বেরিয়ে আসবে।'

উন্মাদটাকে বিদেয় করতে না করতেই আরো ছিটগ্রস্তের আবির্ভাব ঘটল একে একে। সেই সঙ্গে এল রাশি রাশি চিঠি। ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডে অভিযানের পরিকল্পনা খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে উদ্ভট যত চিঠির স্রোত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। কেউ লিখছেন, ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডে যদি কিছু আবিষ্কার করতে চাও বাপু, তাহলে দ্বীপের ধারে ধারে সমুদ্রের তলায় ডুবুরি নামিও। কেননা, ঈস্টার দ্বীপ আসলে একটা ডুবে-যাওয়া মহাদেশের শেষ অংশ। প্রশান্তের আটলান্টিস বলা চলে। আবার কেউ লিখলেন—'কেন খামোকা সময় নষ্ট করছেন। অতদূর যাওয়ার দরকারটা কী? ঘরে বসেই তো সমস্যার সমাধান করা যায়। ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের দানব মূর্তির আর সাউথ আমেরিকার প্রাচীন মূর্তির ফটোগ্রাফ আমাকে পাঠিয়ে দিন। শুধু ভাইব্রেশন অনুভব করে বলে দেবো দুটি মূর্তিই একই কারিগরের হাতে তৈরি কিনা। এই তো সে দিন একটা মডেল কার্ডবোর্ডে পিরামিড এঁকে তার ওপর কাঁচা মাংস রেখে এমন ভাইব্রেশন সৃষ্টি করেছিলাম যে বাড়ীর সবাইকে শেষ পর্যন্ত হাসপাতাল যেতে হয়েছিল।'

ভাইব্রেশানের ঠেলায় এবার থর নিজেই পাগল হয়ে যাবেন দেখা গেল। এর মধ্যেই জরুরী তলব এল বৃটিশ কলোনিয়াল অফিস থেকে। পিটকেয়ার্ন আয়ল্যাণ্ড সম্বন্ধে একটা প্রশ্নের জবাব দরকার। খবর এল কোস্টারিকা থেকে—কোকোস্ আয়ল্যাণ্ডে খোঁড়াখুড়ির অনুমতি মিলবে যদি কথা দেওয়া হয় যে গুপ্তধনের সন্ধান করা চলবে না।

চিঠিপত্রের বাণ্ডিল বগলে থর দৌড়োলেন ট্যাক্সির সন্ধানে। মজার চিঠি প্রায় প্রত্যেকটাই। অভিযানে অংশ নিতে চায় ছবি আঁকিয়ে লেখক, এমন কি রুটিওলাও। এখন রুটি বানায় বটে কিন্তু এককালে কারখানায় কাজ করেছে। খোঁড়াখুঁড়ির অভিজ্ঞতা আছে। একজন ঘড়িওলা রাঁধুনির কাজ চায়।

এইভাবেই এসে গেল সেপ্টেম্বর। সাদা বজরা টাইপের চকচকে মাছধরার জাহাজটা এসে দাঁড়াল অসলো সিটি হলের সামনে জাহাজঘাটায়। সামনের গলুইয়ে আঁকা একটা অদ্ভুত নীল প্রতীক চিহ্ন। সাদা বরফের পটভূমিকায় দুজন পাখী-মানুষ—ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের পবিত্র প্রাণী। দুষ্প্রাপ্য একটা শিলা-লিপি থেকে নকল করা।

জাহাজের ডেকে এবং জাহাজঘাটায় চরমে উঠল কর্মব্যস্ততা। শেষ মুহূর্তেও মনে মনে হিসেব করে গেলেন থর পাছে দরকারী কিছু বাদ পড়ে যায়। কিন্তু হিসেবের বাইরেও তো আছে অনেক বিপদ। অপ্রত্যাশিত ভাবে যদি জলের মধ্যে একটা নরকংকাল আবিষ্কৃত হয়? টিঁকিয়ে রাখবার উপযুক্ত কেমিক্যাল নেওয়া হয়েছে তো? রান্নার সসপ্যানে যদি ফুটো হয়, চোরাপাথরে প্রপেলার যদি ভেঙে যায়, অথবা অসাবধানে বিষাক্ত সামুদ্রিক প্রাণীর ঘাড়ে পা চাপিয়ে বসে যদি কোনো নাবিক? রেফ্রিজারেটার যদি বিগড়োয় খাবার দাবারের গতি কি হবে? কিন্তু শেষ মুহূর্তে এত ভেবে আর লাভ কি? গ্রীনল্যাণ্ড ট্রলার তো এক পায়ে খাড়া দুনিয়ার নির্জনতম অঞ্চলে রওনা হওয়ার জন্যে—যেখানে নেই কোনো ভাঁড়ার অথবা কারখানা।

জাহাজে যখন ঘন্টা বাজল, থর কিন্তু তখনো দাঁড়িয়ে জাহাজঘাটায়। যুক্তরাষ্ট্রে উড়ে গিয়ে তিনজন পুরাতত্ত্ববিদকে আনতে হয়েছে, চিলিতে সৌজন্য-সাক্ষাৎ করে আসতে হয়েছে—ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের দানব মূর্তিগুলোর কোনো রকম ক্ষতি না করে খোঁড়াখুঁড়ির অনুমতি পাওয়া গেছে চিলিয়ান গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে।

আস্তে আস্তে জাহাজ সরে এল জেটি থেকে। ডেকে দাঁড়িয়ে রইল থরের ছেলে—স্কুল থেকে এক বছরের ছুটি নিয়ে চলেছে বাবার সঙ্গে।

পৃথিবীটাকে অর্ধেক চক্কর দেওয়ার জন্যে পুরোদমে জল কেটে এগিয়ে গেল গ্রীনল্যাণ্ড ট্রলার—সঙ্গে নিয়ে গেল ডিটেকটিভদের—কয়েক-শ বছর আগে কোন্ সমুদ্র অভিযাত্রীরা ঈস্টার দ্বীপে রহস্য সৃষ্টি করে গেছে, সেই তথ্য উদ্ধার করতে।

২। পৃথিবীর নাভিতে গিয়ে কি দেখলেন অভিযাত্রীরা?

রাতের অন্ধকার গাঢ় হওয়ার আগেই ঈস্টার দ্বীপের স্নিগ্ধ আশ্রয়ে নোঙর ফেলল জাহাজ। মাথার ওপরে নক্ষত্রখচিত কালো আকাশ

দূরে ডাঙার রেখা, কানে ভেসে আসছে কেবল কেবিন থেকে চাপা কথাবার্তা আর জাহাজের পাশে ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চারিদিকের এই নিঃসীম প্রশান্তি সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলেন থর। জাহাজ শুদ্ধ লোকও যেন বোবা হয়ে থাকতে চাইছে। এই নিশ্চুপ প্রশান্তিকে শব্দ দিয়ে ভাঙতে চাইছে না। অন্ধকারের মধ্যে যে সীমাহীন রহস্য, তা যেন বাক্‌যন্ত্রকেও স্তব্ধ করে দিতে চাইছে।

দূরে জেগে রয়েছে হাজার রহস্যের দ্বীপ—ঈস্টার আয়ল্যাণ্ড।

অন্ধকারের দ্বীপ ঈস্টার আয়ল্যাণ্ড—যেখানে মূল ভূখণ্ড থেকে আসা ইলেকট্রিক লাইন যেন সহসা ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে—বিদ্যুৎবাতির সমারোহ নেই কোথাও—মাথার ওপর ঐ তারার রাজ্য ছাড়া।

দ্বীপের চেহারা সন্ধ্যের আগেও অবশ্য দেখে নিয়েছিলেন থর। ধূসর সবুজ খোঁচা খোঁচা পাথর দিয়ে সুরক্ষিত দ্বীপ। দূরে মরা আগ্নেয়গিরির ঢালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দানবিক মূর্তি আর মূর্তি—লাল আকাশের পটভূমিকায় সে এক ছমছমে দৃশ্য। সাধারণভাবে জল মেপে আর প্রতিধ্বনি দিয়ে জলের গভীরতা বুঝে যতখানি সম্ভব এগিয়েছে জাহাজ। তারপর নোঙর ফেলেছে স্কীপার।

তীরের ওপর কিন্তু সঞ্চরমান কিছুই দেখা যায় নি। নিথর প্রস্তর মূর্তি-গুলোর লম্বা লম্বা ছায়াগুলো দেখে কেবল মনে হয়েছে যেন এককালে এ-দ্বীপে যারা বাস করেছে, তার পৃথিবীর মানুষ নয়।

উচিত ছিল দ্বীপকে ঘুরে গিয়ে অপর পাশে নোঙর ফেলা। সেখানে মানুষ থাকে, গ্রাম আছে। গভর্ণরের নিবাসও সেখানে। কিন্তু রাত্রে তাদের উদ্ব্যস্ত করার দরকার কী? তার চাইতে কাল সকালে সব কটা ফ্ল্যাগ তুলে হাজিরা দেওয়া যাবে গভর্ণরের সমীপে—হাঙ্গারোয়া গ্রামে।

কিছুক্ষণ পরেই জাহাজশুদ্ধ লোক এসে দাঁড়াল থরের সামনে। সবশুদ্ধ তেইশ জন। এঁদের মধ্যে আছেন পুরাতত্ত্ববিদ্, ডাক্তার, ফটোগ্রাফার এবং জাহাজের ক্যাপ্টেন আর নাবিকরা। দ্বীপে পা দেওয়ার জন্যে ছটফট করছেন প্রত্যেকেই। তাই ঈস্টার দ্বীপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলে গেলেন থর।

দ্বীপের আসল নাম কি, তা কেউ জানে না। নেটিভরা নাম দিয়েছে রাপা নুই, কিন্তু গবেষকদের মতে এ নাম নাকি আসল নাম নয়।

অতি-প্রাচীন উপকথা থেকে জানা যায় নেটিভরা ঈস্টার দ্বীপের নাম দিয়েছিল 'তে পিতো ও তে হেনুয়া'—যার মানে, 'পৃথিবীর নাভিস্থল'। কিন্তু এ নাম কাব্য করে রাখা হয়েছে বলেই বিশ্বাস গবেষকদের। কেননা,

এরও পরে নেটিভরা ঈস্টার দ্বীপকে বলত 'স্বর্গ দেখার চোখ' অথবা 'স্বর্গের সীমান্ত প্রদেশ'। হাজার মাইল দূরের সভ্য মানুষরা কিন্তু এ-দ্বীপের নাম দিয়েছে ঈস্টার দ্বীপ ; কেননা, ১৭২২ সালের ঈস্টার দিবসে প্রথম ইউরোপীয় ওলন্দাজ রোগীভিন চেলা চামুণ্ডা নিয়ে এ-অঞ্চলের সমুদ্রে আসেন। তখন গোধূলি। জাহাজ থেকেই টের পান কারা যেন ধোঁয়া উড়িয়ে সংকেত করছে। রাতের আঁধার চেপে বসার আগে অদ্ভুত একটা সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করেন দ্বীপের মাটিতে। একটু পরেই জাহাজের ডেকে এল তারা। ঢ্যাঙা, সুগঠিত দেহ। তাহিতি, হাওয়াই এবং সাউথ-সী'র অন্যান্য পূর্বাঞ্চলের দ্বীপপুঞ্জে যে-সব পলিনেশিয়ানদের দেখেছেন, তাদের মত। কিন্তু খাঁটি পলিনেশিয়ান নয়। কারো গায়ের রঙ ময়লা, কেউ ধবধবে সাদা—ইউরোপীয়দের মত। কেউ লালচে—রোদে জলা তামাটে। অনেকের গালে দাড়ি। ছত্রিশজাতের মানুষ যেন মিশে গেছে আশ্চর্য সেই দ্বীপে।

তীরে নামলেন ওলন্দাজ রোগীভিন। দেখলেন দানব সদৃশ বিরাটকায় প্রস্তরমূর্তি—একটা-আধটা নয়—অগুন্তি। মাথায় চোঙা—যেন মুকুট পরে আছে। দ্বীপবাসীরা এই সব পাথরের মূর্তির সামনে আগুন জালিয়ে ভক্তি-নম্র ভঙ্গিমায় মাটিতে পায়ের চেটো সমান ভাবে রেখে বসে আছে। দু-হাত উঠিয়ে নামিয়ে যেন পূজা করছে পাথরের দেবতাদের। পরের দিন ভোরে দেখা গেল প্রস্তর মূর্তিদের সামনে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে সূর্যোদয়কে স্তুতি করছে দ্বীপবাসীরা। ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডে সূর্যপূজা এভাবে আর কেউ দেখে নি—রোগীভিন ছাড়া।

ওলন্দাজ জাহাজে প্রথম যে দ্বীপবাসীটি এল, তার গায়ের রঙ একেবারেই সাদা—শ্বেতাঙ্গ বলতে যা বোঝায়। চালচলনে জাঁকজমক লক্ষ্য করার মত। মাথায় পালকের মুকুট। দাড়ি গোঁফ কামানো। কানে মুঠোর মত বড় ফুটোর মধ্যে গোঁজা কাঠের খোঁটা। চালচলন দেখে বোঝা গেল দ্বীপের মধ্যে সে একজন গণ্যমান্য—পুরুৎ বলেই মনে হল রোগীভিনের। কান ফুটো করে টেনে লম্বা করা হয়েছে—কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছে লম্বা কান। দ্বীপের অনেকের কানই অমনি টেনে লম্বা করা। কাজের সময়ে লম্বা কান নিয়ে অসুবিধে হলে কাঠের খোঁটা ফুটো থেকে সরিয়ে কানের তলার দিকটা টেনে ওপরের দিকে তুলে বেঁধে রাখে।

বেশীর ভাগ দ্বীপবাসীই একেবারে দিগম্বর। সারা গায়ে কিন্তু বিচিত্র উল্কীর কারুকাজ। দক্ষ শিল্পীর চিত্রকর্ম—পাখী আর অদ্ভুত মূর্তি আঁকা হয়েছে গায়ে গায়ে—কোথাও ফাঁক নেই। কয়েকজনের পরনে কেবল

গাছের বাকল—লাল আর হলুদ রঙের। কারো কারো মাথায় পাখীর পালকের বাহারি শিরস্ত্রাণ—কারো মাথায় বিদঘুটে লাল টুপি। বন্ধু ভাবাপন্ন প্রত্যেকেই। কারো কাছেই অস্ত্রের বালাই নেই। তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করার মত। পুরুষের ভিড়ে গিজগিজ করছে দ্বীপ—কিন্তু মেয়েছেলে প্রায় চোখে পড়ছে না বললেই চলে। যে কজন আছে, বহিরাগতদের নিয়ে তাদের খুব একটা মাথাব্যথা নেই।

নলখাগড়ার তৈরী নিচু লম্বাটে কুঁড়েঘরে নিবাস দ্বীপবাসীদের। দেখে মনে হয় যেন উলটোনো নৌকো—জানলার চিহ্ন নেই। দরজা একটা আছে বটে, তা এত নিচু যে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। নিঃসন্দেহে দ্বীপবাসীরা এই কুঁড়েতেই থাকে—আসবাবপত্রের ধার ধারে না। মাদুর পেতে শোয়—মাথায় দেয় পাথরের বালিশ। বিচিত্র তাপসিক জীবন যাপন দেখে তাক লেগে গেল ওলন্দাজ সমুদ্রযাত্রীদের। মুরগী ছাড়া আর পশু পোষে না। চাষ করে কলা, আখ আর মিষ্টি আলুর। দ্বীপবাসীদের রোজকার রুটি নাকি এই মিষ্টি আলু।

নিঃসঙ্গ দ্বীপবাসীরা সমুদ্র অভিযানে খুব পোক্ত নয় বলেই মনে হল। কেন না, জলপোত বলতে তো একচিলতে ঐ ক্যানো নৌকো—লম্বায় আট ফুট। এত সরু যে একসঙ্গে দুটো পা-ও ভেতরে রাখা মুস্কিল এবং এমন ছিদ্রময় যে দাঁড় টানতে যতটা পরিশ্রম হয় তার চাইতে বেশী খাটতে হয় জল চেঁচে বাইরে ফেলতে। প্রস্তরযুগের মানুষরা যে ভাবে জীবনযাপন করেছে, এদের জীবনযাপনের কায়দাও প্রায় তাই। ধাতুর কোনো জিনিস নেই, রান্নাবান্না করে মাটিতে বসানো একজোড়া গনগনে পাথরের ওপর। ওলন্দাজরা তো দেখেশুনে তাজ্জব হয়ে গেল। সেই সময়কার দুনিয়ায় এত অনগ্রসর দেশ আর আছে বলে তাদের জানা ছিল না। তাই চোখ কপালে উঠে গেল যখন দেখল অনগ্রসর এই দ্বীপবাসীদের বিশাল বিশাল পাথরের মূর্তি মাথা উঁচিয়ে রয়েছে আকাশ পানে—তামাম ইউরোপে এত বড় মূর্তি দেখা যায় না। দানবিক এই মূর্তিগুলো খাড়া করা হল কি ভাবে এই ভেবে মাথা গরম হয়ে গেল ওলন্দাজদের। এ আবার কী রহস্য! নিরেট কাঠ বা মোটা দড়ি দ্বীপের কারোর কাছে নেই—তা সত্ত্বেও পেল্লায় প্রস্তর মূর্তিগুলোকে এভাবে দাঁড় করানো হল কি করে? একটা মূর্তি খুঁটিয়ে দেখল তারা। রহস্যর একটা মনগড়া ব্যাখ্যা খাড়া করে নিলে। হরি হরি! এতো নিরেট পাথরের মূর্তি নয়—কাদা মাটির মূর্তি। ছোট ছোট পাথর ঠেসে দেওয়া হয়েছে মাটির মধ্যে।

একদিন মোটে এই দ্বীপে ছিল ওলন্দাজরা। দুটো নোঙর খোয়া গেছিল।

দ্বীপ থেকে ফিরে এসে বেরিয়ে পড়ল বার সমুদ্রে। জাহাজের লগবুকে লিখে রাখল, দ্বীপের মানুষগুলো শান্তিপ্রিয় ফুর্তিবাজ বটে, কিন্তু পাকা চোর। ভুল বোঝাবুঝির ফলে জাহাজের ওপর গুলি খেয়ে অক্কা পেল একজন দ্বীপবাসী—দ্বীপের ওপর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হল আরো কয়েকজন। তাদের অপরাধ, তারা একটা টেবিল ক্লথ চুরি করেছিল, আর মাথায় পরে গেছিল কয়েকটা টুপি।

নিহত এবং আহতদের আগলে দ্বীপবাসীরা স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল দ্বীপে—দূর পশ্চিম দিগন্তে হারিয়ে গেল পালতোলা জাহাজটা। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাইরের দুনিয়া থেকে আর কেউ এল না হাজার রহস্যের দ্বীপে।

পঞ্চাশ বছর পরে এল স্প্যানিয়ার্ডরা। এল ১৭৭০ সালে। দূর থেকে দ্বীপে ধোঁয়ার সংকেত দেখে আকৃষ্ট হল দুটো জাহাজ—তাদের নেতা ডন ফেলিপি গনজালেস। জনা দুই পুরুৎঠাকুর আর এক দঙ্গল সৈন্য নিয়ে মহাসমারোহে দ্বীপে নেমে গনজালেস কুচকাওয়াজ করে গিয়ে উঠল দ্বীপের পূর্ব প্রান্তের তিনটে টিবির ওপর—কাতারে কাতারে উৎসুক দ্বীপবাসীরা এল পেছন পেছন। সেকী উল্লাস তাদের। তিনটে টিবির প্রতিটির মাথায় একটা করে ক্রস পুঁতে খাড়া করল সৈন্যরা, দুমদাম গুলি ছুঁড়ল আকাশ লক্ষ্য করে এবং ক্রসকে স্যালুট করে ঘোষণা করল এখন থেকে এ-দ্বীপ তাদের—স্প্যানিয়ার্ডদের। পুরো ব্যাপারটাকে আইন সম্মত করার জন্যে স্পেনের রাজা চার্লসের উদ্দেশ্যে লিখল একটা আবেদন পত্র এবং কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সবচেয়ে অকুতোভয় দ্বীপবাসীকে দিয়ে সই করিয়ে নিল তলায়। ফুর্তিতে ডগমগ হয়ে সই দিল লোকটা। সে কী সই! সারি সারি কতকগুলো পাখী আর বিচিত্র মূর্তি ছাড়া কিছুই নয়। ব্যস, সেই থেকে পাওয়া গেল দ্বীপের মালিক। নতুন নামও দেওয়া হল দ্বীপের—সান কার্লোজ আয়ল্যাণ্ড।

পেল্লায় মূর্তিগুলো যে কাদামাটির তৈরী—এই ধোঁকাবাজিতে কিন্তু প্রতারিত হয় নি স্প্যানিয়ার্ডরা। লম্বা বাঁটওলা কোদাল দিয়ে একটা মূর্তিকে ঠকাং করে মারতেই ঠিকরে গেল আগুনের ফুলকি—মাটি ভেঙে গেল না। দানবিক মূর্তিগুলো তাহলে শিলাময়—কিন্তু কাদের হাতে এদের সৃষ্টি—সে রহস্যের ব্যাখ্যা আর হল না।

চোরাই মাল আর উপহারের জিনিসপত্র বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল দেখে খটকা লাগল স্প্যানিয়ার্ডদের। তবে কি পাতাল সুড়ঙ্গ আছে দ্বীপে?

দ্বীপ তো ন্যাড়া, গাছপালার চিহ্ন নেই কোথাও, বাচ্চাকাচ্চাও দেখা যাচ্ছে না। কাতারে কাতারে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ আর সামান্য কজন বয়স্কা নারী ছাড়া কাউকে তো আর দেখা যাচ্ছে না! মেয়েগুলোও বস্ত্রহীন—সব পুরুষের সঙ্গেই ঢলাঢলি—কিন্তু ঈর্ষা নেই পুরুষদের মধ্যে তা নিয়ে।

দ্বীপে নামল স্প্যানিয়ার্ডরা। দেখা হল দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষদের সঙ্গে। সবচেয়ে তালঢাঙা দুজনের মাপ নিয়ে তো হতবাক স্প্যানিয়ার্ডরা। একজন ছ'ফুট সাড়ে ছ ইঞ্চি, আর একজন ছ'ফুট পাঁচ ইঞ্চি। দাড়ি আছে অনেকেরই এবং দেখতে তাদের অনেকটা ইউরোপীয়দের মত—সাধারণ নেটিভদের মত নয়। চুলও সবার কালো নয়। কারো বাদামী, কারো লালচে। 'স্পেনের রাজা দীর্ঘজীবি হোন'—এই কথাটা শেখাতে গিয়ে চমৎকৃত হল স্প্যানিয়ার্ডরা তাদের বুদ্ধিমত্তা দেখে। সব কথা ডাইরীতে লিখে নিয়ে বিদায় নিল তারা—আর কোনো দিন ফিরে আসে নি হাজার রহস্যের দ্বীপে।

এরপর এল ইংরেজরা—ক্যাপ্টেন কুকের অধীনে। তারপর এলেন একজন ফরাসী—লা পেরুসে।

বিদেশী দর্শনার্থীদের দেখেশুনে তখন বেশ আক্কেল হয়ে গেছে ঈস্টার দ্বীপবাসীদের। কুক দ্বীপে নেমে মাত্র কয়েক-শ বাসিন্দাকে দেখতে পেলেন—উচ্চতা মাঝামাঝি। অবস্থা শোচনীয়। নিরানন্দ আর নির্বিকার। ইংরেজরা ভাবল, স্প্যানিয়ার্ডরা আসার পর থেকেই বোধ হয় কপাল পুড়েছে দ্বীপবাসীদের—মারা যাচ্ছে দলে দলে। কুক কিন্তু অন্য সন্দেহ করলেন। নিশ্চয় পাতাল বিবরে গা-ঢাকা দিয়েছে বাসিন্দারা। কেননা, বিশেষ করে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী কম—সারা দ্বীপে টহল মেরে এসেও তাদের খুব বেশী দেখা যায় নি। কয়েক জায়গায় লক্ষ্য করলেন স্তূপীকৃত পাথর—সঙ্কীর্ণ পথ মাঝ দিয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে। পাতাল বিবরে প্রবেশের পথ নিঃসন্দেহে। কিন্তু যতবার সেই পথে তিনি ঢুকতে গেলেন—বাধা দিল নেটিভরা। ইংরাজরা তখন স্কার্ভি রোগে ভুগছে বলে বেশীদিন থাকতেও পারল না দ্বীপে। কিছু মিষ্টি আলু দ্বীপ থেকে সংগ্রহ করে বেরিয়ে পড়ল জাহাজ নিয়ে। দ্বীপে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলতে মিষ্টি আলুই পেয়েছিল তারা। নেটিভরা কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারেও ঠকিয়েছে তাদের। চুপড়ি ভর্তি পাথর রেখে ওপরে ছড়িয়ে দিয়েছিল সামান্য কয়েকটা আলু।

বারো বছর পরে লা পেরুসে এলেন দ্বীপে—১৭৮৬ সালে। এবারও দ্বীপবাসীরা আবির্ভূত হল দ্বীপময়—অনেকের মাথার চুল পাতলা—প্রায় অর্ধেক

কিন্তু মেয়েছেলে—যদিও বয়স্কা। সেই সঙ্গে দেখা দিল কাতারে কাতারে সব বয়সের বাচ্চাকাচ্চা—সব সমাজেই যা একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। মনে হল যেন আচম্বিতে সবাই উঠে এসেছে দ্বীপের তলা থেকে দ্বীপের ওপরে—যেখানে গাছপালার বালাই নেই—চন্দ্রপৃষ্ঠের মতই যা বিলকুল ন্যাড়া। মনে হওয়া শুধু নয়—চোখের সামনে দেখাও গেল সেই দৃশ্য। স্তূপীকৃত পাথরের ফাঁকে সরু মুখ সুড়ঙ্গ বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল তাদের। ইংরেজদের অনুমান যে অভ্রান্ত, তার প্রমাণ পেল ফরাসীরা। পাথরের সুড়ঙ্গ দিয়ে বাস্তবিকই গুপ্ত প্রকোষ্ঠে আত্মগোপন করে বাসিন্দারা। ক্যাপ্টেন কুক দ্বীপে যখন নামেন, ওলন্দাজরা যখন প্রথম দ্বীপের মাটি স্পর্শ করে, তখন অন্ধকারময় এই পাতাল বিবরেই দ্বীপের খানদানী মানুষরা মেয়ে আর বাচ্চাদের নিয়ে লুকিয়ে ছিল। লা পেরুসে আন্দাজে বুঝলেন, ক্যাপ্টেন কুক কোনো রকম উৎপাত অশান্তি না করে দ্বীপ ছেড়ে গিয়েছিলেন বলে মনে বল পেয়েছে বাসিন্দারা। সবাই বেরিয়ে এসেছে পাতাল ঘর ছেড়ে—সবাই বলতে যদিও সংখ্যায় হাজার দুই মাত্র।

ক্যাপ্টেন কুকের দ্বীপ পরিদর্শনের সময়ে দলে দলে পাতাল বিবরে ঠাঁই নিলেও, দ্বীপের পেল্লায় পাথরের মূর্তিগুলো তারা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে নি। গোঁয়ার গোবিন্দর মত দ্বীপে দাঁড়িয়ে থেকেছে বিশালকায় স্ট্যাচুগুলো। ক্যাপ্টেন কুক এবং লা পেরুসে দুজনেই ধরে নিলেন, মূর্তিগুলো নিশ্চয় প্রাচীন কালের স্মৃতিচিহ্ন—দ্বীপবাসীদের চোখে এখন যা স্মৃতিসৌধ ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনো রকম যান্ত্রিক সাহায্য ছাড়াই এত বড় মূর্তি যারা উঁচু জায়গায় নিয়ে গিয়ে খাড়া করতে পারে, অজ্ঞাত সেই ভাস্করদের দক্ষতা আঁচ করে নিয়ে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন কুক। দ্বীপের বর্তমান বাসিন্দারা যে এসব মূর্তি গড়ে নি, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন তিনি। মূর্তি গড়া তো দূরের কথা মূর্তিগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণের দিকেও নজর ছিল না তাদের। ফলে পাথরের দেওয়াল অনেক জায়গাতেই হেলে পড়েছিল ভিত কমজোরি হওয়ায়। সুতরাং এ কীর্তি যাদের, তারা নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান এবং শক্তিমান—নির্জন এই দ্বীপেই একদা তারা নিবাস রচনা করে গেছে। অনেকগুলো মূর্তিও হেলে পড়েছিল। অথবা চিৎপাত হয়ে পড়েছিল পাথরের মঞ্চে—মূর্তি ধ্বংসের প্রচেষ্টাও যে হয়েছে, সে প্রমাণও পেয়েছিলেন ক্যাপ্টেন কুক।

যে সব মঞ্চের ওপর দাঁড় করানো হয়েছে মূর্তিগুলো, ক্যাপ্টেন কুক পরীক্ষা করেছিলেন সেই মঞ্চগুলো এবং হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিটি মঞ্চই নির্মিত হয়েছে বড় বড় পাথরের চাঁই দিয়ে। প্রত্যেকটা চাঁই

পাথর কেটে এমন নিখুঁত সমান ভাবে পালিশ করা অবস্থায় তৈরী যে পাশাপাশি জুড়ে দেওয়া হয়েছে কোনোরকম সিমেন্ট না লাগিয়েই। ইংলণ্ডের নবসেরা ইমারতেও পাথরের এমন চমৎকার কাজ দেখেন নি কুক। মহাকাল কিন্তু এত প্রযত্ন, এত প্রচেষ্টা, এত দক্ষতাকে সহিষ্ণুতার চোখে দেখে নি —ধ্বংস করে আনছে তিল তিল করে।

তাহিতি দ্বীপের একজন খাঁটি পলিনেশিয়ান ছিল ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজে। সেই সময়ে ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের দ্বীপবাসীরা যে ভাষায় কথা বলত, তার কিছু কিছু সে বুঝতে পারত। ভাঙা ভাঙা কথার মধ্যে থেকে যে খবর জোগাড় করা গেল, তা থেকে ইংরেজরা এইটুকু জানল যে মূর্তিগুলো কোনো দেবমূর্তি নয়—সেকালের রাজা বা পুরুৎদের মূর্তি। দ্বীপে এখন যারা থাকে এই মূর্তির মঞ্চেই তারা নিজেদের মৃত আত্মীয় স্বজনদের কবর দিয়েছে—বিস্তর নরকংকালই তার প্রমাণ। মৃত্যুর পর জীবনের অস্তিত্বে যে তারা বিশ্বাসী, তার প্রমাণ স্বরূপ বহুবার দ্বীপবাসীরা আকারে ইঙ্গিতে জানালে কংকাল নিষ্প্রাণ অবস্থায় মর্ত্যে পড়ে আছে বটে, আত্মা কিন্তু উধাও হয়েছে স্বর্গ অভিমুখে।

ঈস্টার দ্বীপের স্থানীয় সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করেছিলেন লা পেরুসে। দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার ঠিক আগে বেশ কিছু শুওর, ছাগল আর ভেড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিছু শস্যও রোপন করে গিয়েছিলেন। কিন্তু পেটে যাদের আগুন জলছে, তারা এ সবের কিছুই রাখেনি। খেয়ে সাবাড় করেছে—দ্বীপটা যা ছিল, তাই রয়ে গেছে।

গত শতাব্দী শুরু হওয়ার আগে নির্জন এই দ্বীপে আর কেউ আসে নি। তারপরেই আচম্বিতে এসে পৌঁছোলো আমেরিকানরা। উপকূল বরাবর পাথরের খাড়া পাথরের প্রাচীরে আবার জড়ো হল দ্বীপবাসীরা—পাতালবিবরে গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করল না। আমেরিকান স্কুনারের ক্যাপ্টেন দাঙ্গাহাঙ্গামা চালিয়ে বন্দী করে নিয়ে গেল বারোজন পুরুষ আর দশজন স্ত্রীলোককে। তিনদিন জাহাজ চালিয়ে যাওয়ার পর কয়েদীদের ছেড়ে দিল জাহাজের ডেকে। সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিল পুরুষ ক'জন—জল সাঁতরে এগিয়ে গেল ঈস্টার দ্বীপ যেদিকে, সেইদিকে। ক্যাপ্টেন ওদের নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ফের জাহাজ নিয়ে গেল ঈস্টার দ্বীপে। ফের আক্রমণ চালালো নিরীহ নেটিভদের ওপর।

পরের জাহাজগুলো থেকে কিন্তু দ্বীপে লোক নামানো গেল না। খাড়াই উপকূল বরাবর দ্বীপবাসীরা দমাদম পাথর ছুঁড়ে গেল। জাহাজ থেকে নৌকো

নিয়ে গিয়ে দ্বীপে ওঠা আর গেল না। বারুদ ফুটিয়ে, গুলি চালিয়ে একটা রাশিয়ান দল গায়ের জোরে দ্বীপের ওপর পা দিয়েও পিছু হঠে এল শেষ পর্যন্ত। জাহাজ নিয়ে সরে পড়া ছাড়া পথ রইল না।

গেল অনেকগুলো বছর। আস্তে আস্তে ফিরে এল দ্বীপবাসীদের আস্থা। পাথর ছোঁড়াও কমে এল একটু একটু করে। মেয়েরাও আরো বেশী সংখ্যায় বেরিয়ে এল দিনের আলোয়, কয়েকটা জাহাজ অল্পসময়ের জন্যে নোঙর ফেলে দ্বীপ দেখে গেল। তারপরেই ঘটল বিপর্যয়।

সাতটা পালতোলা পেরুভিয়ান জাহাজ এল দ্বীপে। নোঙর ফেলল দূরে। দলে দলে নেটিভরা এল জাহাজে। এক তা কাগজে সই করিয়ে নেওয়া হল প্রত্যেককে দিয়ে। এবারের চুক্তি অন্য রকমের। পেরু উপকূলের কাছে গুয়ানো দ্বীপগুলোয় ব্যাগাড় খাটতে যেতে হবে। সই দিয়ে যেই ওরা নামতে গেল জাহাজ থেকে। বেঁধে ফেলা হল প্রত্যেককে—ঢুকিয়ে দেওয়া হল জাহাজের খোলে। তারপর নৌকো নিয়ে আটজন ক্রীতদাস-শিকারী এল দ্বীপে—সঙ্গে নিয়ে এল চড়া রঙীন কাপড় এবং আরো অনেক সস্তার উপহার। উপকূলে নেমে জিনিসগুলো ছড়িয়ে দিতেই আনাচে কানাচে থেকে গুটিগুটি বেরিয়ে এল দ্বীপবাসীরা। এল কয়েক-শ। যারা হাঁটু গেড়ে বসে চকচকে বস্তুগুলো হাতে নিয়ে দেখছিল, হঠাৎ তাদের হাত বেঁধে ফেলা হল। যারা পালাবার চেষ্টা করল, তাদের পেছন থেকে গুলি করা হল। দুজন গুহায় লুকিয়ে পড়েছিল—আসতে চায় নি। বুঝিয়ে সুঝিয়ে ব্যর্থ হয়ে দুই গুলিতে তাদের খতম করে দিলে ক্যাপ্টেন।

১৮৬২ সালের খৃষ্টমাস ঈভ দিবসে ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডে ঘটল এই কাণ্ড। দ্বীপে যারা তখনও নিহত হয় নি এবং হাতবাঁধা অবস্থায় যারা পড়েছিল তীরে, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল পাতাল বিবরে—পাথর গড়িয়ে এনে বন্ধ করে দিলে সঙ্কীর্ণ প্রবেশ পথ। নিঝুম হয়ে গেল নির্জন দ্বীপ। সোল্লাসে ফেটে পড়ল কিন্তু সাত-সাতটা জাহাজের মানুষ-পশুরা। বড়দিন উদ্‌যাপন করার পর নোঙর তুলল জাহাজের।

পৃথিবীর নাভিস্থলে বাসিন্দারা হাড়ে হাড়ে টের পেল বড়দিন কাকে বলে, ঈস্টার দিবস কি জিনিস। কিন্তু দুর্গতির সেই শুরু। এক হাজার গোলাম নিয়ে জাহাজ সাতটা এল পেরুর কাছে দ্বীপগুলোয়—পাখীর বিষ্ঠা গুয়ানো খুঁড়ে তোলার কাজে মোতায়েন করা হল বিনা বেতনে। প্রতিবাদ জানালেন তাহিতির বিশপ। কর্তৃপক্ষ হুকুম দিলে, একি নিষ্ঠুরতা! এখুনি ফিরিয়ে দেওয়া হোক এদের ঈস্টার দ্বীপে।

কিন্তু ফিরতি জাহাজ যখন এল তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, দেখা গেল হাজার জনের মধ্যে ন'শজন মারা গেছে অনাহারে অপুষ্টিতে। এক শ জনের মধ্যে মারা গেল পঁচাশিজন জাহাজেই। বাকী পনেরোজন গায়ে বসন্ত নিয়ে নামল দ্বীপে। হু-হু করে ছড়িয়ে পড়ল মহামারী। পাতাল বিবরের দূরতম, গভীরতম, অন্ধকারতম অঞ্চলে লুকিয়েও রেহাই পেল না কেউ। বেঁচে গেল মোটে ১১১ জন—বাচ্চাবুড়ো মিলিয়ে। খাঁ-খাঁ করতে লাগল ঈস্টার দ্বীপ।

ইতিমধ্যে একজন পাদরী এল দ্বীপে। উদ্দেশ্য তার মহৎ। বিদেশী। প্রাণপাত সেবা করে গেল হতভাগ্যদের। কিন্তু তার সর্বস্ব চুরি হয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত এমনকি পরনের প্যান্টও। এরপরেই যে জাহাজটা প্রথম এল দ্বীপে, পাদরী বেচারী সেই জাহাজেই চম্পট দিল স্বদেশে। কিন্তু ফিরে এল শ-খানেক সহকারী নিয়ে। বছর কয়েকের চেষ্টায় অবশিষ্ট দ্বীপবাসীরা ধর্মান্তকরণে রাজী হল বটে, কিন্তু হঠাৎ ধূমকেতুর মত কোত্থেকে হাজির হল এক ফরাসী অ্যাডভেঞ্চারিস্ট। নেটিভদের সে খেপিয়ে তুলল পাদরীদের বিরুদ্ধে। ক্ষিপ্ত দ্বীপবাসীরা দূরদূর করে তাড়িয়ে দিল পাদরীদের—কিন্তু খুন করল ফরাসীকে। পাদরীদের সমস্ত চিহ্ন দ্বীপ থেকে মুছে দিয়ে গান গাইতে বসল পরমানন্দে।

শতাব্দীর শেষে ইউরোপীয়রা দেখল, ঈস্টার দ্বীপের বিরাট মূর্তিগুলোর আশেপাশে সবুজ ঘাসভর্তি মাঠগুলোয় দেদার ভেড়া চড়ে খেতে পারে। তাই দ্বীপটাকে নিজেদের বলে ঘোষণা করল চিলি সরকার। একজন গভর্ণর, একজন পাদরী আর একজন ডাক্তারকে রেখে দিলে দ্বীপে। এখন আর দ্বীপ-বাসীরা গুহা বা কুঁড়েতে থাকে না। ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের পুরোনো সংস্কৃতি পালটে দিয়েছে বাইরের সভ্যতা। যা হয়েছে সাউথ-সী'র অন্যান্য দ্বীপে, এস্কিমো আর রেড ইণ্ডিয়ানদের ক্ষেত্রে।

কাহিনী শেষ করলেন থর। বললেন—'অতএব বুঝতেই পারছেন, ঈস্টার দ্বীপে আমরা নেটিভ পর্যবেক্ষণ করতে আসিনি—এসেছি খুঁড়ে দেখতে। দ্বীপের রহস্য পাতালেই আছে—আমরা দেখতে চাই সেই পাতালের চেহারা।'

একজন জিজ্ঞেস করেছিল—'এর আগে কেউ এসে খোড়াখুঁড়ি করে নি?'

'দ্বীপে মাটি থাকলে তো খুঁড়বে। সবারই বিশ্বাস, এ দ্বীপে মাটি নেই। আগেও ছিল না—এখনো নেই। মরা ঘাস থেকে তো আর মাটি হয় না। গাছপালাও নেই, তাই খোঁড়াখুঁড়ির সখ কারো হয় নি।'

প্রকৃতপক্ষে মাত্র দুটি পুরাতত্ত্ববিদদের অভিযান এসেছিল আশ্চর্য, দ্বীপ ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডে। প্রথমটা বেসরকারী বৃটিশ অভিযান—ক্যাথরিন রাউট-লেজের নেতৃত্বে। উনি দ্বীপে প্রথম আসেন ১৯১৪ সালে। এসেছিলেন নিজের পালতোলা বজরা প্যাটার্ণের জলপোতে। জমির ওপরে যা কিছু দেখেছেন, জরীপ করে ম্যাপ এঁকে রেখেছেন। বিদঘুটে পথ, দেওয়াল, পাথুরে ছাদ, এবং দ্বীপময় ছড়ানো চারশ-রও বেশী প্রস্তর মূর্তি। ভদ্রমহিলা এইসব কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে পদ্ধতিমাফিক খোঁড়াখুঁড়ির দিকে নজরই দিতে পারেন নি। মূর্তিগুলো ঘিরে বহুবছরের ঘাসপচা মাটি জমেছিল—সে সবও তাঁকে সাফ করতে হয়েছে। কিন্তু কপাল খারাপ পরবর্তী যুগের অভিযাত্রী-দের—কেননা ওঁর বৈজ্ঞানিক লেখা সবই হারিয়ে গেছিল—পাওয়া গেছিল কেবল একটা বই। ওঁরই লেখা। জাহাজে পৃথিবী পরিক্রমার বিবরণ। এই বইতে রাউটলেজ লিখেছেন, ঈস্টার দ্বীপের সর্বত্রই থমথম করছে রহস্য এবং বিস্ময়। বিপুল এই বিস্ময়বোধ থেকে রেহাই পায় না কেউই। দ্বীপের আসল অধিকর্তা যেন বর্তমান বাসিন্দারা নয়—দানবিক প্রস্তরমূর্তিদের নির্মাতাদের ছায়া যেন এখনও রয়েছে হাজার রহস্যের দ্বীপের প্রতিটি ধূলি-কণায়। অব্যাখ্যাত এই রহস্যের কোনো ব্যাখ্যা তিনি খুঁজে পান নি। দানব মূর্তিগুলো যেন অতীতের এই ভাস্করদেরই প্রজা—ভাস্কররাই যেন বেশী সক্রিয় এই দ্বীপে—বর্তমান বাসিন্দাদের চেয়ে। মরা আগ্নেয়গিরির চেহারা পালটে দিয়েছে এরা গাঁইতি দিয়ে পাথর খুঁড়ে এনে—যে পাথর দিয়ে বানিয়েছে মূর্তি আর প্রাচীর। কেন যে এই বিপুল কর্মকাণ্ডে তারা এত পরিশ্রম করে গেলো—আজও তা রহস্যে ঢাকা।

লণ্ডন থেকে প্রকাশিত (১৯১৯) 'মিস্ট্রি অফ ঈস্টার আয়ল্যাণ্ড: দ্য স্টোরি অফ অ্যান এক্সপিডিসন' গ্রন্থে রাউটলেজ লিখেছিলেন, এ-দ্বীপের সর্বত্রই যেন স্বর্গের বাতাস বইছে। চারপাশে ধূ-ধূ সমুদ্র, মাথার ওপর অনন্ত আকাশ। সীমাহীন মহাকাশ আর নিবিড় নৈঃশব্দ। বাসিন্দারা যেন জন্ম মুহূর্ত থেকে তাই কান পেতে কিছু শুনতে চায়—কিন্তু কি যে শুনতে চায়, তা তারা নিজেরাই জানে না। অজ্ঞাতসারেই উপলব্ধি করে এক মহাসত্য—এমন এক গোপন প্রকোষ্ঠে তাদের নিবাস যার বাইরে রয়েছে বিপুল মহাশূন্যতা—দৃষ্টিসীমা এবং জ্ঞানের সীমার বাইরে।

ঠিক এইভাবেই ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডকে দেখেছিলেন মিসেস রাউটলেজ। দ্বীপের রহস্য তিনি উপলব্ধি করেছেন। বিনীতভাবে তা লিপিবদ্ধও করে গেছেন। রহস্য সমাধানের ভার ছেড়ে দিয়েছেন ভবিষ্যতে যারা আসবে—

তাদের ওপর। বিশ বছর পর একটা ফ্রাঙ্কো-বেলজিয়ান অভিযান এল দ্বীপে—যুদ্ধজাহাজে। পরে তাদের দ্বীপ থেকে তুলে নিয়ে গেল আর একটা যুদ্ধ জাহাজ। সমুদ্রপথেই মারা গেল একজন পুরাতত্ত্ববিদ; দ্বীপবাসীদের এথ্‌নোগ্রাফি (মানবজাতিসমূহের বিজ্ঞান সম্মত বিবরণ) সম্বন্ধে নেটিভদের মুখ থেকে বিস্তর তথ্য সংগ্রহ করলেন ফরাসী মেট্রক্স। বেলজিয়ান লাভাচারি কিন্তু বৃক্ষহীন দ্বীপের সর্বত্র ছড়ানো হাজার হাজার পাথর-খোদাই আর অদ্ভুত পাথরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত রইলেন সর্বক্ষণ। ফলে এই অভিযানেও দ্বীপের কোথাও খোঁড়াখুঁড়ির কাজ হয় নি।

মূর্তি নিয়ে গবেষণা করা ফ্রাঙ্কো-বেলজিয়ান অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল না—ওঁরা ব্যস্ত ছিলেন অন্যান্য বিষয় নিয়ে। মেট্রক্সের ধারণা হয়েছিল, রহস্যটা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। আরও পশ্চিমের দ্বীপ থেকে নেটিভরা এসেছিল হয়ত মূর্তি গড়ার অভিলাষ নিয়ে। যেহেতু দ্বীপে গাছ নেই, তাই কাঠের অভাবে পাহাড় কেটে পাথর কুঁদে বানিয়ে গেছে একটার পর একটা মূর্তি।

অন্যান্য গবেষক এবং সমুদ্রযাত্রীরাও নেমেছেন দ্বীপে—আগে এবং পরে। কখনো থেকেছেন কয়েকদিন—কখনো কয়েক ঘন্টা। দ্বীপবাসীদের কাছ থেকে কিংবদন্তী, কাঠ খোদাই জিনিসপত্র, জীবন্ত প্রাণী অথবা বিস্তৃত ভূমিখণ্ড থেকে উদ্ভিদ সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন। ছোট্ট দ্বীপটা এইভাবে আরো রিক্ত হয়ে এসেছে—যা কিছু ছিল একটু একটু করে ঠাঁই পেয়েছে পৃথিবীর নানান জাদুঘরে এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়। যা কিছু নেওয়া যায়, তার বেশীর ভাগই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাথুরে মূর্তিগুলো কেবল বিচিত্র পাথুরে হাসি মুখে নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী—লিলিপুটদের অভ্যর্থনা করেছে নীরবে, বিদায়ও দিয়েছে নীরবে। রহস্য-তিমির কুয়াশাময় অবগুণ্ঠনের মত ঢেকে রেখে দিয়েছে ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডকে।

সংক্ষেপে, এই হল গিয়ে ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের ইতিহাস।

ইতিহাস শেষ করলেন থর। জাহাজের স্কীপার বিনীত ভাবে বললে—'এমন কোনো কিংবদন্তী জানে কি নেটিভরা যা এখনো সভ্যমানুষের কানে তোলা হয়নি?'

ঠাট্টা করে বললেন থর—'ওহে আশাবাদী, আশার ছলনে ভুলি আপনি তো কাল স্বয়ং দ্বীপে অবতীর্ণ হচ্ছেন—নেমে যাদের সঙ্গে দেখা করবেন, তারা কিন্তু আপনার আমার মতই সভ্য মানুষ। কিংবদন্তী প্রথম যিনি সংগ্রহ করেন দ্বীপবাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তাঁর নাম পেমাস্টার থমসন—আমে-

রিকান। সালটা ১৮৮৬। শ্বেতাঙ্গরা আস্তানা গেড়ে বসার আগেই যে সব নেটিভ এই দ্বীপেই বড় হয়েছে, ১৮৮৬ সালে তখনও তাদের কিছু কিছু বেঁচে ছিল। তারাই বলেছিল, ওদের পূর্বপুরুষরা নাকি পূর্ব দিক থেকে এসেছিল বড় পালতোলা জাহাজে চেপে—সূর্য ডুবছে যেদিকে, সটান সেই দিকে ষাট দিন একনাগাড়ে জাহাজ চালিয়ে পেঁছোছিল এই দ্বীপে। আদিতে দু-ধরনের মানবজাতি বসবাস করেছে ঈস্টার দ্বীপে। একদল লম্বকর্ণ আর একদল হ্রস্বকর্ণ। হ্রস্বকর্ণরা বাকী সবাইকে একটা যুদ্ধে মেরে সাবাড় করে এবং দ্বীপে রাজত্ব চালিয়ে যায়।'

পুরাতত্ত্ববিদের এক ছাত্র ফোড়ন দিলে তৎক্ষণাৎ—'দ্বীপে তো এখন শুধু নেটিভরা থাকে না—সাদা মানুষও আছে। আর আছে একটা স্কুল আর হাসপাতাল।'

থর বললেন—'ঠিক কথা। কাজেই খোঁড়াখুঁড়ির ব্যাপারে হাত লাগানো ছাড়া নেটিভরা আর কোনো সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয় না। খুব জোর কিছু তরিতরকারী জোগাড় করে দিতে পারে—তার বেশী নয়।'

'হুলা নাচটা শিখিয়ে দেওয়ার মত দু-চারটে বোন তো পাওয়া যাবে,' বিড় বিড় করে বললেন এক ইঞ্জিনীয়ার। হাসিতে ফেটে পড়লেন আর সবাই। সোল্লাসে সমর্থন জানালো খালাসীরা।

ঠিক এই সময়ে একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। দুর্বোধ্য একটা মন্তব্য। ভ্যাবাচাকা খেয়ে দৃষ্টিবিনিময় করলেন প্রত্যেকে। কে কথা কয়? অন্ধকারাচ্ছন্ন ডেকে আলো ফেললেন মেট। কিন্তু কেউ তো নেই সেখানে। কাজেই বোকা বোকা হাসি হাসতে হল সবাইকে। হুলা মেয়েদের নিয়ে নতুন রসিকতা করলেন ইঞ্জিনীয়ার—সঙ্গে সঙ্গে আবার শোনা গেল কর্কশ কণ্ঠের দুর্বোধ্য সেই মন্তব্য। ডেকের বাইরে থেকে কেউ হেঁড়ে গলায় গিটকিরি ছাড়ছে নাকি? টর্চ নিয়ে সবাই দৌড়ে গেলেন রেলিংয়ের ধারে। জলে আলো ফোকাস হল। আলো কিন্তু জলে পড়ল না—পড়ল ওপর পানে চেয়ে থাকা সারি সারি কতকগুলো মুখের ওপর। বোম্বেটেদের মুখ। ছোট একটা নৌকোয় গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে প্যাট প্যাট করে দেখছে জাহাজের অভিযাত্রীদের।

থর পলিনেশিয়ান ভাষায় অভ্যর্থনা জানালেন তৎক্ষণাৎ—'আইয়া—ও—রানা।'

কোরাস গলায় জবাব এল—'আইয়া—ও—রানা।'

যাক, এরা তাহলে পলিনেশিয়ান। থরের চোখে কিন্তু মনে হল অনেক

কিছুর জগাখিচুড়ি।

দড়ির সিঁড়ি ছুঁড়ে নামিয়ে দিতেই মূর্তিমানরা একে একে উঠে এল ডেকে। বেশীর ভাগই সুস্বাস্থ্যর অধিকারী। গড়নপেটন চমৎকার। কিন্তু পরিধেয় সবারই শতচ্ছিন্ন। মাথায় লাল ন্যাকড়া জড়িয়ে আর দাঁতে একটা পুঁটলি কামড়ে ধরে প্রথম জন উঠে এল ডেকের আলোয়, পায়ে জুতো নেই, সার্ট ছেঁড়া, ফালি ফালি প্যান্টের পা গুটিয়ে হাঁটু পর্যন্ত তোলা। তার পরেই এল বিরাটকায় যে লোকটা, তার মুখে বসন্তর দাগ, খালি পা, গায়ে সবুজ রঙের পুরোনো আর্মি ওভারকোট, হাতে একটা কাঠের গদা, কাঁধে থলি ভর্তি খোদাই কাঠের ছড়ি। পেছনে পেছনে উঠে এল একটা গোল-গোল চক্ষু ছাগুলে দাড়ি কাঠের মূর্তি—ঠেলে তুলে দিল একজন নেটিভ—মাথায় খালাসীদের টুপি। ডেকে উঠেই থলি খুলে হাতে হাতে পাচার করল কাঠখোদাই জিনিসগুলো—কাড়াকাড়ি শুরু হল তাই নিয়ে। নেটিভদের দিকে আর কারো নজর রইল না।

কাঠ খোদাই মূর্তিগুলোর মধ্যে একটা বিশেষ মূর্তি দেখা গেল বারবার। নাক তার বাজপাখীর চঞ্চুর মত টিকোলো এবং ধারালো। চিবুকে ছাগুলে দাড়ি, কানের লতি ঝুলছে নাকের ওপর। কোটরে ঢোকানো চোখ, দাঁত বার করে হাসছে শয়তানি হাসি। পেট ভেতরে ঢোকানো, কিন্তু শিরদাঁড়া আর পাঁজরাগুলো ঠেলে বার করা, ছোট আকারে এবং বড় আকারে এই মূর্তিকেই দেখা গেল প্রায় প্রত্যেকের ঝোলায়—দেখতে প্রায় একই রকম। এ ছাড়াও আছে পাখীর ডানা আর মাথাওলা মূর্তি, আছে বিচিত্র কারুকাজ করা কাঠের গদা আর মুখোস, চন্দ্রাকৃতি বক্ষাবরণ—তাতে এমন সব চিত্র-লিপি খোদাই করা যার মানে জীবন্ত কোনো প্রাণীর পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটা বস্তুই নিখুঁতভাবে খোদাই করা এবং চকচকে পালিশ করা—পোর্সিলেনের জিনিসের মত। এ-ছাড়াও আছে মূর্তিদের প্রস্তর নকল মূর্তি, ভারি সুন্দর পাখীর পালকের মুকুট, সঙ্গে লাগোয়া পালক দিয়ে তৈরী পোশাক।

অন্যান্য পলিনেশিয়ান দ্বীপের বাসিন্দারা এত পরিশ্রমী হয় না—কুঁড়ের হদ্দ। ঈস্টার দ্বীপের বাসিন্দারা হাতের কাজে বেশ চৌকস দেখা গেল। এরা শুধু কাঠ খোদাইয়েই পোক্ত নয়—দুর্বার এবং সীমাহীন কল্পনা শক্তিরও অধিকারী। সৃষ্টি করার মধ্যে যে আনন্দ, তা এরা পায় বলেই এত জিনিস বানাতে পারে। তবে সব জিনিসই বিশেষ কয়েকটা প্যাটার্নের নকল।

চিলি-তে ন্যাশনাল মিউজিয়াম ঘুরে এসেছিলেন থর। সেখানে দেখেছেন

ডক্টর মোসনি সংগৃহীত ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের আধুনিক জনপ্রিয় শিল্পসৃষ্টি। নেটিভদের জিনিসপত্র দেখেই তাই তিনি পটাপট নাম বলে গেলেন। শুনে তো অবাক নেটিভরা। সেকালে ইউরোপীয়রা দ্বীপ থেকে যা সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে এবং এখন যা মিউজিয়ামে ঠাঁই পেয়েছে—নেটিভরা সেই-সবেরই নিখুঁত নকল বানিয়ে এনেছে কেবল—নতুন কিছু নয়। মূল বস্তু-গুলোর দাম এখন অনেক। কিন্তু যেহেতু এখন আর তা পাওয়া যায় না. নেটিভরা তাই নকল বানিয়ে বাজার গরম রেখেছে।

শতচ্ছিন্ন পোশাক দেখিয়ে কাষ্ঠহাসি হেসে নেটিভরা জানালে তাদের দরকার প্যাণ্ট, জামা আর জুতো—বিনিময়ে দেবে কাঠের এইসব দামি দামি জিনিস, সঙ্গে সঙ্গে দাতাকর্ণ হয়ে উঠল খালাসিরা। দৌড়োলো কেবিনে। ছেঁড়া আর বাতিল প্যাণ্ট, জামা, জুতোয় ডেক ভরে গেল। থরের মেয়ে অ্যানেতি একটা পাখী মানুষ নিয়ে টানাটানি করতেই উদারভাবে এক জন নেটিভ খেলনাটা তুলে দিল তার হাতে। ওর মা দৌড়োলো কেবিনের মধ্যে বিনিময়ে এক পুঁটলি বাতিল জামা আর জুতো আনতে।

একপাশে দাঁড়িয়েছিল হাসিমুখে বিচিত্র এক মূর্তি। গায়ের রঙ আরবদের মত পাণ্ডুর। নাকের নিচের হিটলারী গোঁফ। তার কাছে রয়েছে চ্যাটালো পাথরে খোদাই বিদঘুটে পাখী-মানুষের মূর্তি। জিনিসটা বানিয়েছে নাকি তার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ। থর কিন্তু দেখেই চিনলেন। জিজ্ঞেস করলেন—'তোমার তৈরী তো?'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল হিটলারী গোঁফ। পরক্ষণেই কাষ্ঠহাসি হেসে স্বীকার করলে। অবশ্যই তার সৃষ্টি এই অনুপম শিল্প নিদর্শন—সে ছাড়া আর কারো ক্ষমতা আছে এমন কি জিনিস বানানোর?

ফটোগ্রাফার দৌড়ে এসে প্যাণ্টের বিনিময়ে দখল করল পাখী মানুষের চ্যাটালো পাথরের মূর্তি।

আর একটা নৌকো এসে ভিড়ল জাহাজের গায়ে। ডেকে উঠে এল একজন শ্বেতকায়। স্মার্ট ইয়ংম্যান—নেভি অফিসার। গভর্ণরের সহকারীও বটে। অভিযাত্রীদের সুস্বাগতম জানিয়ে সে বললে, রাত্রে গ্রামে নানা মুস্কিল ঠিকই, কিন্তু সকাল হলেই যেন জাহাজ যায় সেখানে। নেভীর লোক-জন থেকে সবাইকে নামতে সাহায্য করবে। ছ-মাস আগে একটা যুদ্ধজাহাজ এসেছিল দ্বীপে চিলি থেকে। গত বছর এসেছিল একটা লাক্সারী জাহাজ। দ্বীপে জেটি নেই, হোটেল নেই শুনে কেউ জাহাজ থেকে নামে নি। দ্বীপের লোক জাহাজে গিয়ে দ্রব্য বিনিময় সেরেছে। তারপর লাক্সারি জাহাজ-

চেপে রওনা হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপ অভিমুখে।

শুনে হেসে ফেললেন ধর। বললেন—'আমরা কিন্তু দরকার হলে সাঁতার কেটেও দ্বীপে উঠবো।' ভদ্রলোক তখন কল্পনাও করতে পারেন নি, বাস্তবিকই সাঁতার কাটতেই হবে তাঁদের।

নেভী অফিসার জানালো—'দ্বীপের মেয়রকে গাইড করে নিয়ে যান। দ্বীপে নামতে সুবিধে হবে। যদিও এরা পাকা চোর—তাহলেও সঙ্গে রাখুন।'

'দ্বীপের মেয়র? সে কে?'

'আলাপ হয়নি বুঝি? ঐ তো রয়েছে দাঁড়িয়ে।'

আকর্ণ হেসে এগিয়ে এল হিটলারী গোঁফ। এখন আর ঈস্টার দ্বীপে সর্দার বলে কেউ নেই—বছর বছর তাই তাকেই মেয়র পদে নির্বাচন করে এসেছে দ্বীপবাসীরা। এই রকম একটা নির্বোধ গত আটাশ বছর ধরে একনাগাড়ে মেয়র নির্বাচিত হয়েছে শুনে অবাক হলেন ধর।

মেয়র ছাড়া আর সবাইকে জাহাজ থেকে জোর করে নামিয়ে দিল নেভী অফিসার। বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চারে কিন্তু মূল ভূমিকা নিয়েছিল এই মেয়র—ধর সেই মুহূর্তে যদিও তাকে আকাট মূর্খ বলেই মনে করেছিলেন।

পরের দিন ভোর হতে না হতেই নোঙর তোলা হল জাহাজের। ভোরের সূর্যালোকে ঝলমল করছে সবুজ আর হলদে ঈস্টার দ্বীপ—রাতের সেই মায়া-ময় পরিবেশ আর নেই। বিরাট মূর্তিগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে আকাশপানে মাথা তুলে—যেমন দাঁড়িয়ে থেকেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। বেদীমূলে কিন্তু কেউ হোমাগ্নি জ্বালছে না, পূজো করছে না। কারও টিকি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। জনমানবহীন বিজন বন্ধুর প্রান্তরের পানে তাকিয়ে মনে হল, সেকালের মত সেদিনও প্রথম জাহাজের আবির্ভাবে দ্বীপবাসীরা লুকিয়েছে পাতাল বিবরে।

মেয়র এসে ব্যাখ্যা করল সেই রহস্য। দ্বীপের এ অঞ্চলে এখন শুধু নেভীর ভেড়া চড়ে—মানুষ থাকে না। সত্যিই দেখা গেল ভেড়ার পালকে। জমি ধূসর হয়ে গেছে তাদের গাত্রবর্ণে।

খাড়াই উপকূলের গা ঘেঁসে এগিয়ে চলল জাহাজ গ্রামের দিকে। আগ্নেয় শিলা ক্ষয়ে গেছে দামাল ঢেউয়ে—পাথর তাই সিধে উঠে গেছে অনেক উঁচু পর্যন্ত—বহু উঁচুতে দেখা যাচ্ছে প্রাচীন প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ। হেলে আছে—টিঁকে আছে কোনমতে। ছুরি দিয়ে কেক কাটলে যেমন হরেক রঙ দেখা যায়, ঢেউ আগ্নেয় শিলা কেটে সেইরকম রঙের বাহার ফুটিয়ে তুলেছে। রোদ্দুরে ঝকঝক করছে লালচে বাদামী আর হলদে-ধূসর শিলা। বহু উঁচুতে

খাড়াই পাথরের শীর্ষে দেখা যাচ্ছে সবুজ ঘাসের চিহ্ন। মাইলের পর মাইল এই দৃশ্য। তারপর খাড়াই পাথর একটু একটু করে মিলিয়ে এসেছে--কিন্তু দ্বীপের মধ্যেকার সবুজ আস্তরণ জল পর্যন্ত এসে পৌঁছোলো না একবারও—কালো আগ্নেয়শিলার চাঁই দিয়ে ঘেরা যেন দ্বীপের কিনারা। এক জায়গায় কেবল দেখা গেল রৌদ্রালোকিত ঝকঝকে সমুদ্রসৈকত—সানন্দে যেন ডাকছে অভিযাত্রীদের।

সশ্রদ্ধভাবে মেয়র বললে—'এই হল আনাকেনা। সেকালে রাজারা থাকত এখানে। আমাদের পূর্বপুরুষ হোতু মাতুয়া এই খানেই নেমেছিল জাহাজ থেকে।'

'এখন কে থাকে এখানে?

'কেউ না। মেষ পালকদের একটা কুঁড়ে ছাড়া কিছু নেই।'

শেষ হয়ে গেল সমুদ্রসৈকত। আবার শুরু হল খাড়াই পাহাড়। আলগা শিলা। পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে দেখা গেল ঢালু হয়ে নেমে এসেছে ঈস্টার দ্বীপ সমুদ্রের ধারে। দেখা যাচ্ছে হাঙ্গারোয়া গ্রামের একগুচ্ছ সাদারঙ করা বাড়ী। বেড়া দিয়ে ঘেরা। ইউক্যালিপটাস আর তালবৃক্ষ। বাদবাকী জমি নেভীর—ভেড়া চড়ানোর ক্ষেত্রভূমি।

সগর্বে চেয়ে রইল মেয়র। এই তার নিবাস।

সব ক'টা পতাকা উড়িয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। বাজানো হল সাইরেন। উপকূলে পতপত করে খুঁটির ডগায় উড়িয়ে দেওয়া হল চিলি সরকারের একটা পতাকা।

সানন্দ অশ্রু মুছল মেয়র জামার হাতা দিয়ে।

বলল—'সিনর, এই আমাদের হোতু মাতুয়ার দেশ। আমার দেশ। আটাশ বছর মেয়র রয়েছি এখানে। আমিই ঈস্টার দ্বীপ—ঈস্টার দ্বীপই আমি। আমাকে এ দ্বীপে সবাই চেনে—চেনে পৃথিবীর লোক। কে চেনে গভর্ণরকে? জার্মানী থেকে লোক এসে নিয়ে যায় আমার কানের রক্তের নমুনা, গ্লাসগো আর অস্ট্রিয়া থেকে কাঠের মূর্তির অর্ডার আসে মেয়রের কাছে। গোটা দুনিয়া চেনে শুধু আমাকেই। বন্ধু, হাতে হাত মিলোন!'

লোকটাকে ভাল লাগল থরের। হাত মিলোলেন। মেয়র সবিনয়ে বললে, এখন থেকে থরকে সে সিনর কোনটাইকি বলে ডাকবে, কেননা, কোনটাইকি ভেলায় চেপে সমুদ্র পাড়ির দুঃসাহসিকতা তিনি দেখিয়েছিলেন।

কাতারে কাতারে মানুষ ছুটে এল জলের ধারে—কেউ ঘোড়ায় চেপে,

কেউ দৌড়ে।

আবার একটা অন্তরীপে এসে পড়ল জাহাজ। ডুবো পাথরের চারপাশ দিয়ে জল ঘুরপাক খেয়ে ছুটছে, ফুঁসছে। জাহাজ দূরে নিয়ে গিয়ে নোঙর ফেলল ক্যাপ্টেন। ঘোড়ায় চেপে আর পায়ে হেঁটে দ্বীপের মানুষগুলো এসে পৌঁছোলো সেখানকার সমুদ্রতীরে। এখানে পাথর তেমন খাড়াই নয়—উপকূল কিন্তু তেমনি উঁচু এবং এবড়ো খেবড়ো। পাথরের খাঁজ থেকে ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল একটা নৌকো। তার পেছনে আরও একটা নৌকো।

উত্তাল জাহাজে দাঁড়িয়ে গা-পাক দিয়ে উঠেছিল মেয়রের। গা এলিয়ে দিয়েছিল ডেক চেয়ারে। থরকে ডেকে বললে—'সিনর, আমাদের ভাষায় 'আইয়ো-ও-রানা কুরুয়া' মানে 'দিনটা ভালো কাটুক প্রত্যেকের'। আপনি ঐ বলে হাঁক দেবেন—ওরা খুশী হবে।'

ফেণাময় সমুদ্র পেরিয়ে তীরে পৌঁছোতে হবে এবার। বেছে নিলাম মাত্র কয়েক জনকে। একটা বিরাট লাভা-চাঁইয়ের পাশ দিয়ে নৌকো পৌঁছোলো অপেক্ষাকৃত শান্ত জলে। কিন্তু জেটির বালাই নেই, বড় ঢেউকে ভেঙে দেওয়ার ব্রেকারও নেই, প্রকৃতির উদ্দাম কল্পনা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের পেছনে স্থির দেহে দাঁড়িয়ে সারি সারি দ্বীপবাসীরা। পাথরগুলো সিঁড়ির আকারে যেন সাজিয়ে রেখেছেন প্রকৃতিদেবী।

গলা চড়িয়ে চিৎকার করলেন থর—'আইয়ো-ও-রানা কুরুয়া।'

সমস্বরে জবাব এল দ্বীপবাসীদের তরফ থেকে—'আইয়ো-ও-রানা কুরুয়া।'

সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হল সবাই। একযোগে হুড়োহুড়ি করে নেমে এল জলের ধারে—কে আগে হাত ধরে নামিয়ে নেমে থরকে সেই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। দ্বীপের নানা বাসিন্দা এসে জড়ো হয়েছে জলের ধারে। পলিনেশিয়ান প্রত্যেকেই—কিন্তু ধমনীতে রয়েছে মিশ্রিত রক্ত। পরনেও ইউরোপীয় পরিচ্ছদ—রকমারি। নৃতাপর নৌকো থেকে তীরে পা দিতে না দিতেই মাথায় রুমাল বাঁধা এক বুড়ি ধরে ফেলল থরকে।

এক চুপড়ি আলু এগিয়ে দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীর মত গাঢ় স্বরে বললে বুড়ি—'সিনর, এই দেখুন আমার সিক্রেট।' বলে তুলল একটা বড় আলু। আলুর তলায় দেখা গেল এক টুকরো কাপড়ের কোণ। কিন্তু সিক্রেটটা কি, তা নিয়ে আর কৌতূহল প্রকাশ করলেন না থর। দ্বীপের প্রায় প্রত্যেকের কাছেই

এমনি সিক্রেট রয়েছে কাঁধের ঝোলায়। কিন্তু কেউ তা ফাঁস করছে না। থর পা-পা করে এগোলেন। যার পাশ দিয়ে গেলেন, সে-ই 'আইয়ো-ও-রানা' বলে সাদর সম্ভাষণ জানালো তাঁকে।

কৃষ্ণকায় নেটিভদের কালো ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল একটা শুভ্র মূর্তি। শ্বেতবসন শ্বেতমূর্তি। শিরদাঁড়া সিধে রেখে চুপা-ফাঁক করে তাকিয়ে রয়েছে থরের দিকে। মাথার টুপি নামানো। গালের সাদাদাড়ি খুব বেশী সাদা দেখাচ্ছে পেছনকার অবিশ্বাস্য নীল আকাশের পটভূমিকায়।

দেখেই চিনলেন থর। ইস্টার দ্বীপের মুকুটহীন নৃপতি—ফাদার সিবাস-টিয়ান এঙ্গলার্ট। অতিকায় ক্ষমতাবান—দ্বীপের লোক তাঁর কথায় ওঠে বসে। এঁর সুনজরে পড়া মানে পার পেয়ে যাওয়া—কুনজরে পড়লে কপালে অনেক দুর্গতি লেখা আছে। ঈস্টার দ্বীপ সম্বন্ধে একটা কেতাবও লিখেছেন ইনি। চিলিতে এঁর সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শুনে এসেছেন থর।

বুক চিতিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন ইনি ভরাট গম্ভীর স্বরে—'সুস্বাগতম আমার দ্বীপে।'

আমার দ্বীপে! বিশেষণটা কানে জড়িয়ে গেল থরের।

ফাদার তা লক্ষ্য করলেন। বললেন—'হ্যাঁ আমার দ্বীপে। আমি মনে করি এ দ্বীপ আমার—মুখেও বলি তাই। কুবেরের টাকা এনে দিলেও এ দ্বীপ হাত ছাড়া করব না।' থর তা বুঝলেন। বললেন—'আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় রইলাম আমরা সবাই।'

হেসে উঠলেন ফাদার—'নেটিভদের পছন্দ হয় তো?' বলেই ছুরির মত ধারালো চোখে তাকালেন থরের দিকে।

থর বললেন—'যত খাঁটি হয় পছন্দ হয় তত বেশী।'

আলো ঝলমল করে উঠল যেন ফাদারের চোখেমুখে।

'তাহলে আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম।'

থর আলাপ করিয়ে দিলেন পুরাতত্ত্বের ছাত্র গনজালো, ক্যাপ্টেন, ডাক্তার এবং আরো যারা এসেছে—তাদের সঙ্গে। তারপর উঠে বসলেন জীপে। ডেলা ডেলা লাভার মাঝে দাঁড়িয়েছিল জীপটা। খোলা জায়গায়—আশেপাশে ঘাস খাচ্ছে ঘোড়া। আঁকাবাঁকা রাস্তা বেয়ে নাচতে নাচতে দ্বীপের ভেতর দিকে গেল জীপ। বেড়া পেরিয়ে ঢুকল গ্রামের মধ্যে। দাঁড়ালো গভর্ণরের নিরালা বাংলোবাড়ীর সামনে।

লোহাপেটা শরীর নিয়ে ছোটখাট একটা মানুষ বেরিয়ে এল খাকী ইউনিফর্ম পরে। খাতির করে নিয়ে গিয়ে বসালো ভেতরে। থরের সামনে এখন দ্বীপের

দুই সর্বশক্তিমান পুরুষ। একজন বৃদ্ধ—ফাদার সিবাসটিয়ান। অপরজন তরুণ—কম্যাণ্ডাণ্ট আনাস্তো কুর্তি—মিলিটারী গভর্ণর। প্রথম জন আছেন বিশ বছর, থাকবেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। দ্বিতীয়জন এসেছেন ছ-মাস আগে চিলি সরকারের মিলিটারী জাহাজে—থাকবেন দু-বছর দ্বীপের শাসন ভার নিয়ে। কার হাতে ক্ষমতা বেশী, এই প্রশ্নেরও জবাব পেলেন থর দুদিন যেতে না যেতেই। দুজনেই একত্রে সমান শক্তিমান—দ্বীপের সব সমস্যা দুজনেই মিলেমিশে সমাধান করেন। বিশ্বের সবচেয়ে নিরালা দ্বীপে অদ্ভুত বাসিন্দাদের মধ্যে বিচিত্র সমাধান এইভাবেই বুঝি সম্ভব।

প্রথমে আড়ষ্টভাবে কর্তব্যকর্ম শেষ করলেন গভর্ণর। জাহাজে যারা এসেছে, তাদের লিস্ট দেখলেন। ডাক্তারের কাছ থেকে তাদের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট নিলেন। তারপর কাগজপত্র সরিয়ে রেখে কাষ্ঠা গলায় বললেন —'মনের আনন্দে খোঁড়াখুঁড়ি চালান। শুধু দুটো নিষেধাজ্ঞা রইল— নেটিভদের অ্যালকোহল আর অস্ত্র, এই দুটি জিনিস একদম দেবেন না।'

তা আর বলতে!

ঘাড় দুলিয়ে বললেন গভর্ণর—'আর একটা কথা। নেটিভদের কাছে আপনি অচেনা নন। একটা বড় রকমের সমস্যা বানিয়ে বসে আছেন আপনি এই দ্বীপে।

হেসে ফেললেন ফাদার। দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন—'বেশ তো, এখন থেকে মিস্টার থরের জাহাজ না হয় আপনার গার্ডদের কাজ করবে।' থর হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলেন। এ আবার কি হেঁয়ালি! ধাঁধাঁর জবাব পাওয়া গেল অচিরে। কোনটাইকি ভেলায় চড়ে উত্তর দিক দিয়ে গিয়ে সাউথ সী দ্বীপে নেমেছিলেন থর—নেটিভদের কানে খবরটা পৌঁছোতেই উল্লসিত হয় তারা। তাদেরও পূর্বপুরুষ এইভাবে ডানপিটেমি করেছে এককালে—তারাই বা বাদ যাবে কেন? কিন্তু দ্বীপে তো গাছ নেই বললেই চলে —গুঁড়ি কোথায় যে ভেলা বানাবে? শেষকালে জনা কয়েক নেটিভ খান কয়েক তক্তা ঠুকে একটা নৌকা বানিয়ে মাছ ধরতে বেরুলো বার সমুদ্রে। দেখতে দেখতে ঈস্টার দ্বীপ হারিয়ে গেল দিগন্তে। কোনটাইকি যে পথ বেয়ে গিয়েছিল, না জেনে সেই পথেই নৌকো ভাসিয়ে দিলে তারা। পাঁচ হপ্তা পরে অনাহারে অবসন্ন দেহ নিয়ে পা দিল টুয়ামোটু দ্বীপপুঞ্জের ছোট্ট একটা দ্বীপে। সেখান থেকে রওনা হল তাহিতি অভিমুখে।

বাস, উল্লাসে হল উল্লোল ঈস্টার দ্বীপবাসীরা। একটা নৌকো তৈরী করল কয়েকজন। মুখে বলল মাছ ধরতে যাবে বার-সমুদ্রে। কিন্তু নৌকার মধ্যে

বেশ কয়েকটা টিন ভর্তি খাবার জল দেখেই সন্দেহ হল গভর্ণরের। এই নৌকো নিয়ে দামাল সমুদ্রে পাড়ি জমানো অতীব বিপজ্জনক—তাই হুকুম দিলেন নৌকো তোলা হোক তীরে। হুকুম সত্ত্বেও নেটিভরা নৌকো নিয়ে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করতে গভর্ণর বাধ্য হয়ে একজন সশস্ত্র নেটিভকে রক্ষী হিসাবে মোতায়েন করলো নৌকোয়। ফল হল উল্টো। আরও একজন দোস্ত বাড়ল নৌকোয়। সবাই মিলে ভেগে পড়ল নৌকো নিয়ে রাতের অন্ধকারে। প্রথম নৌকোর চেয়ে এ-নৌকো গেল আরো পশ্চিমে—তাহিতিরও অনেক দূরে আতিইউ দ্বীপে পৌঁছোলো অনেকদিন পরে—পথে আর কোনো দ্বীপ তাদের চোখে পড়ে নি। এর পর থেকেই সমুদ্রে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পেয়েছে দ্বীপবাসীদের। দ্বীপের ভেতর দিকে তুজন খালাসি নৌকো বানিয়েছে অনেকগুলো—জলে পড়ার অপেক্ষায় তৈরী প্রতিটি নৌকো। গ্রামবাসীরা জানে আসল মতলব কী। দ্বীপে শ্বেতাঙ্গ রক্ষী খুব কম। তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একজনকে দিবারাত্র নৌকো প্রহরায় মোতায়েন রেখেছেন গভর্ণর।

বললেন—'এবার ওদের জানিয়ে দিচ্ছি—নৌকো নিয়ে দূরে পালানোর চেষ্টা করলেই জাহাজ গিয়ে ধরে আনবে।'

থর রাজী হয়ে গেলেন এক কথায়।

গভর্ণর বললেন—'রক্ষীর দরকার অন্য কাজে। নেটিভরা পয়লা নম্বরের চোর। দ্বীপের তু হাজার ভেড়া থেকে আরম্ভ করে কিছুই বাদ দেয় না। সবচেয়ে বদ চোরের জন্যে জেলখানা বানিয়েছি বটে, কিন্তু যেহেতু জেলখানায় ঢুকলেই ভালমন্দ খাওয়া যায়—তাই সবাই উঠে পড়ে লেগেছে চুরিচামারি করে জেলে ঢোকার জন্যে। ক্ষিদের জ্বালা ওদের বড্ড বেশী। কিন্তু এই চুরি ছাড়া ওদের মত মানুষ হয় না। মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা দ্বীপে কখনোই হয় না। চুরি ওরা করে বটে—চিরকাল করে এসেছে—কিন্তু দিয়েছে এবং দিচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী। সম্পত্তি জিনিসটা এদের হাত দিয়ে বড় সহজে বেরিয়ে যায়—ধরে রাখতে জানে না।'

ফাদার সিবাসটিয়ান কথা দিলেন, ভালো রেশন আর উপযুক্ত বেতনে বাড়তি কয়েকজন খনক সংগ্রহ করে দেবেন। থর অবশ্য দেখেছেন, নোট বা সোনার চাইতে বেশী কাজ হয় জিনিসপত্র দিয়ে। কেননা টাকা নিয়ে খরচ করবে কোথায়? দ্বীপে সিনেমা নেই, দোকান নেই, এমন কি নাপিতের সেলুনও নেই।

ঠিক হল, দ্বীপের অপর প্রান্তে আনাকেনা উপসাগরে মূল শিবির করা

হবে। অভিযানের পক্ষে এর চাইতে ভালো জায়গা আর নেই। গ্রাম থেকে জায়গাটা বেশ দূর। ফলে চুরিচামারি বা অন্যান্য হাঙ্গামার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া, একমাত্র বালুকা সৈকত শুধু ঐখানেই। ফলে, জাহাজ থেকে ভেলায় করে যন্ত্রপাতি টেনে আনা যাবে বালির ওপর। সবচেয়ে বড় কথা, এই সেই ভ্যালি অফ কিংস—রাজাদের উপত্যকা—যেখানে কিংবদন্তীর নায়ক এবং বহু গল্পে বিখ্যাত হোতু মাতুয়া এসে অবতরণ করেছিলেন ঈস্টার দ্বীপে। এর চাইতে সেরা জায়গা আর কোথায়?

গভর্ণরের বাংলায় পেট ঠেসে উত্তম খানা খেয়ে জাহাজে ফিরে এলেন থর ফাদার সিবাসটিয়ানের কথায় কিছু নেটিভকে উঠতে দেওয়া হল জাহাজে—ঘুরে ফিরে দেখার জন্যে। এদের পরনে ছেঁড়া পোশাক কিন্তু নেই। এমন কি মেয়রও বাড়ী থেকে আস্ত জামা গায়ে চাপিয়ে এসেছে। মেয়রকে তা বলতেই ফিক করে হেসে বললে—'সিনর, ওটা আমাদের একটা কায়দা। ছেঁড়া জামা না দেখালে গোটা জামা মিলবে কেন?'

সমুদ্র তখন এত উত্তাল যে বেশী নেটিভ আসতে পারল না জাহাজে। থর কথা দিলেন, এরপরের বার নিয়ে আসবেন যারা আসতে চায়। যারা এসে ছিল তাদেরকে দ্বীপে পাঠানোর ঠিক আগেই হন্তদন্ত হয়ে এল জাহাজের স্কীপার—হাতে ভিজিটর্স বুক।

বলল—'এদের নামগুলো লিখে রাখা যাক।'

বলে, সবচেয়ে বুদ্ধিমান চেকনাই চেহারা যারা, খাতাখানা দিল তাকে। খাতা নিয়ে সে গেল দলের সবার কাছে। মাথা এক করে গুজগুজ ফিসফাস করল অনেকক্ষণ। তারপর খাতা ফিরিয়ে আনল গম্ভীর মুখে।

খাতায় কারো সই নেই।

স্কীপার তো অবাক—'এ'কী কাণ্ড। নাম সই করতেও জানো না কেউ?'

'সবাই জানি। কিন্তু করব না।'

'কেন?'

'এইভাবেই নাম লিখিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের ক্রীতদাস করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পেরুতে—তাই।'

তাও তো বটে! ক্রীতদাস হয়ে যারা গেছিল, তাদের বংশধররা এই দলে হাজির না থাকলেও এদের বাবারা হয়তো সেই সময়ে জন্মেছিল ঈস্টার দ্বীপে!

ঝটপট সরিয়ে ফেলা হল খাতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাহাজ ছেড়ে নড়ে না কেউ। ভোঁ বাজানো হল, জোরে ইঞ্জিন চালানো হল—অনেকরকম জগ

ঝম্প আওয়াজ সৃষ্টি করা হল। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! গ্যাট হয়ে বসে রইল নেটিভরা। সন্ধ্যা নামবার আগেই বাতাস যেখানে জাহাজ দোলাবে না —সেই জায়গায় নিয়ে গিয়ে জাহাজের নোঙর ফেলা হল। তার আগেই অবশ্য কিছু নেটিভ দুখানা নৌকোর একখানায় চেপে সরে পড়েছিল দ্বীপে—আর একটা পেছনে টেনে নিয়ে গেছিল জলভর্তি অবস্থায়। নৌকো নিয়ে ফিরে আসছি বলেও তারা যখন চম্পট দিলে, তখন ভাবনায় পড়লেন থর। কি আর করেন, ডাহা চোর নেটিভদের নিয়ে রাত কাটানো ছাড়া উপায় কি। খেতে বসলেন সবাই। নেটিভদের খাবার দেওয়া হল। গোগ্রাসে গিলেই তারা দৌড়োলো রেলিংয়ের ধারে বমি করার জন্যে—জাহাজ যে দুলছে!

তারপর একজন গিটার বার করে ধরল গান আর হুলা নাচ। তখন ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। উদ্দাম নাচগানে ভিড়ে গেল জাহাজের প্রত্যেকেই। অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একটা নৌকো—ভিজে কাকের মত মেয়র এসেছে তিন সঙ্গী নিয়ে।

শেষ পর্যন্ত মেয়রকে তিন সঙ্গী সমেত পেট পুরে খাইয়ে তাকে দিয়েই নেটিভদের বিদেয় করা হল জাহাজ থেকে গানবাজনা শেষ হওয়ার পর।

ফলে পরের দিন ভোরবেলা রাজাদের উপত্যকায় যখন পা দিলেন থর, ঈস্টার দ্বীপের মেয়র তখন জাহাজের সেলুনে টেবিলে শুয়ে নাক ডাকছে!

৩। আগ্নেয় গ্যাস সুড়ঙ্গে

সৈকতভূমি থেকে দ্বীপের ভেতরে রওনা হলেন থর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে। তাঁবু খাটাবার সবসেরা জায়গাটা আগে খুঁজে বার করা দরকার। কাকপক্ষী দেখতে পেলেন না আশেপাশে—খাঁ-খাঁ করছে চারদিক। কিন্তু কিছুদূর এগোতেই পাথরের কিনারা টপকে আবির্ভূত হল একটি ঘোড়া। পিঠে বসে একজন নেটিভ। অভিযাত্রীদের দেখেই লাফিয়ে নামল নিচে। দৌড়ে এল কাছে। রাজাদের উপত্যকায় একটি মাত্র সাদা চুনকাম করা পাথরের কটেজে সে থাকে। দ্বীপের এই অঞ্চলে ভেড়াদের দেখাশুনার ভার তার ওপর। আনকেনা উপত্যকায় থাকবার জন্যে আস্তানা খোঁজা হচ্ছে শুনে তৎক্ষণাৎ আঙুল তুলে দেখাল একটা খাঁড়ি—সারি সারি গুহা রয়েছে সেখানে। ঈস্টার দ্বীপের প্রথম মানুষ রাজা হোতু মাতুয়া নাকি থাকতেন সেখানে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে। এ দ্বীপের প্রকৃত আবিষ্কর্তা তিনিই। পরে নিচে

জলে গজানো নলখাগড়া দিয়ে কুঁড়ে বানিয়ে নিয়েছিলেন—গুহায় আর থাকেন নি। হোতু মাতুয়া সম্বন্ধে লম্বা চওড়া কথাবার্তা শুনে সত্যিই অবাক হলেন থর। কৌতুক বোধও করলেন। কুইন ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে যে কোনো ইংরেজ যেমন পঞ্চমুখ, হোতু মাতুয়া সম্পর্কেও এরা সেই রকম পঞ্চমুখ। অথচ অবাক হতে হচ্ছে এই ভেবে যে হোতু মাতুয়া সম্পর্কে কিস্‌সু জানে না দ্বীপের একজনও। হোতু মাতুয়া যেন এদের কাছে ধর্মের আদম আর ইতিহাসের কলম্বাসের সংমিশ্রণ—বর্ণমালার ক থেকে বিসর্গ পর্যন্ত সব কিছু।

থর বললেন—'গুহায় থাকবো কেন? আমরা তো ওয়াটার টাইট কাগজে তৈরী কুঁড়েঘর সঙ্গেই এনেছি।' শুনেই তৎক্ষণাৎ উল্টোদিকে আঙুল তুলে দেখাল মেষপালক।

বললে—'ক্যানভাস এনেছেন? তাহলে তো ভালই হোল। হোতু মাতুয়া আগে যেখানে ঘুমোতেন—সেখানে থাকুন গিয়ে। চমৎকার জায়গা।'

জায়গাটা সমুদ্রসৈকত—বালিতে ছাওয়া।

পেছন পেছন এল মেষপালক। গম্বুজাকৃতি ছোট্ট একটা টিলার পাদদেশে চমৎকার একটা সমতল ক্ষেত্র। লুপ্ত বিশালতার চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চারদিকে। বালুকা সৈকতের মাঝামাঝি জায়গায়, দ্বীপের ভেতর দিকে, তিনদিকে তিনটে মন্দিরের মত উঁচু চাতাল বা বেদী। অতিকায় পাথরের চাঁই দিয়ে নির্মিত তিনটে চাতালই ফেরানো সমুদ্রের দিকে। দেখে মনে হবে যেন সমুদ্রের হামলাবাজি থেকে সমতল দ্বীপকে সুরক্ষিত রাখবার জন্যেই চাতাল তিনটের সৃষ্টি। কিন্তু ঠিক পেছনেই বালির ওপর মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকা পেল্লায় মূর্তিগুলো দেখলে এ-ভুল ভেঙে যায়। এককালে মন্দিরের মত উঁচু পাথরের এই বেদীর ওপরেই দাঁড় করানো ছিল মূর্তিগুলো। এখন মুখ গুঁজড়ে পড়েছে দ্বীপের ভেতর দিকে, অর্থাৎ খাড়া যখন ছিল, তখন প্রত্যেকেই মুখ ফিরিয়ে ছিল দ্বীপের দিকে—পিঠ ছিল সমুদ্রের দিকে। কুঁদে কেটে ধূসর রঙের প্রতিটি মূর্তির মাথায় মরচে-লাল রঙের পাথরের চোঙা ছিল এককালে—এখন কোথায় হোথায় পড়ে বালির ওপর। মাঝের চাতালে এমনি মূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল সারি সারি—এখন সবাই মুখ গুঁজড়ে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে বালির ওপর।

একদম পূবের সুউচ্চ চাতালের ওপর একদা খাড়া ছিল একটি মাত্র মূর্তি—এখন অবশ্য সাষ্টাঙ্গে শুয়ে বালির ওপর। পাশের চাতালের মূর্তিগুলোর চেয়ে এই মূর্তিটার পিঠ বিলক্ষণ চওড়া—আয়তনেও বেশী। কারণ, এই চাতালের পাশেই নিবাস ছিল পরম শ্রদ্ধেয় হোতু মাতুয়ার। মেষপালক আঙুল

তুলে দেখাল পাথুরে বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ। এখন অবশ্য পাথরের নিরেট ভিতটুকুই কেবল আছে। কিন্তু মেষপালকের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল, এর চাইতে পবিত্র স্থান বুঝি দুনিয়ায় আর নেই। সামনেই একটা বিচিত্র দর্শন পাঁচ ঝিক-ওয়ালা উনুন। এই উনুনেই নাকি রান্নাবান্না হত হোতু মাতুয়ার। এ-হেন অঞ্চলই খোঁড়াখুঁড়ির উপযুক্ত জায়গা। তাই তাঁবু পাতা হোক এইখানে। জায়গা নির্বাচিত হল সমতল মন্দির-চত্বরের সামনের দিকে ভূপাতিত দানবমুণ্ডের মাথার কাছে।

মেষপালক কিন্তু এত সহজে রেহাই দিল না পবকে। পই পই করে বোঝাতে লাগল স্থান মাহাত্ম্য। এ বড় সকক্ষ জায়গা নয়। রাজা থাকতেন এখানে। শেষ কালে এক প্যাকেট সিগারেট বাগিয়ে ফুঁকতে ফুঁকতে বিদেয় হল পরমানন্দে।

শুরু হল জিনিসপত্র নামানো। উপসাগরের মাঝামাঝি জায়গায় সমুদ্র সৈকতে পাথর নেই, ফেণাও কম। তাই অ্যালুমিনিয়াম ভেলায় চেপে ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে প্রথমেই সেখানে নামলেন ফটোগ্রাফার। জাহাজের বোট ভাসছিল জাহাজ আর অ্যালুমিনিয়াম ভেলার মাঝামাঝি জায়গায়। দূর থেকে দেখা গেল উত্তাল একটা ঢেউ মাথার ওপর তুলে আছাড় মারল নৌকোটাকে। আরও একটা তার চাইতে বড় ঢেউ ধেয়ে আসছে দেখে পুরোদমে ইঞ্জিন চালিয়ে বার সমুদ্রে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে বোট। থর অ্যালুমিনিয়াম ভেলায় ঝটপট সেদিকে যেতে গেলেন। বিরাট একটা ঢেউ খাড়াই দেওয়ালের মত মাথা তুলল সামনে। পরক্ষণেই গোটা ভেলাটাকে বন্‌বন্‌ করে ঘুরিয়ে দিল উল্টে। মাথায় দারুণ চোট পেয়ে জলের তলায় গোঁৎ মারলেন থর—নইলে তো আবার ভেলার চোট লাগবে মাথায়। চোখ বন্ধ করে রইলেন জলের তলায়--মিছে ঘোলা জলের বালি চোখে ঢোকে। একটু পরেই দম নেওয়ার জন্যে ভেসে উঠে দেখলেন সঙ্গী সাথীরা উলটোনো ভেলার ওপর উঠে বসে আছে। বার-দরিয়াও দিব্বি শান্ত।

ভাল শিক্ষা হয়ে গেল অভিযাত্রীদের। আনাকেনা উপসাগর কখন যে ফোঁস করে উঠবে, তা বলা যায় না। তখন ঢেউয়ের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার দুঃসাহস না দেখানোই ভাল। অত সরঞ্জাম নিয়ে ঝুঁকি নেওয়া যায় না। তলা-চ্যাপ্টা অ্যালুমিনিয়ামটাকে জেটির মত করে বেঁধে রাখা হল বালির তীরে--বোটে করে সরঞ্জাম রাখা হল সেখানে—তারপর গোটা ভেলাটাকে টেনে আনা হল বালির ওপরে। এই ভাবে সমস্ত দামী দামী জিনিসপত্র নামানো হল তীরে। প্রত্যেকবার বোট পাঠানোর জন্যে নিশান উড়িয়ে

সংকেত করা হল দ্বীপ থেকে এবং জাহাজ থেকে সাইরেন বাজানো হল বোট রওনা হওয়ার আগে। তা সত্ত্বেও তীরের কাছে প্রতিবার প্যান্টের পা ভিজল অভিযাত্রীদের। পাচক ঠাকুর আর স্টুয়ার্ডকে তো ওয়াটার-টাইট থলি বোঝাই সদ্য তৈরী রুটি নিয়ে স্রেফ সাঁতার কেটে উঠতে হল দ্বীপের সৈকতে। দ্বীপে পৌঁছোনোর পর কিন্তু রোদ্দুর ঝলমলে উষ্ণ সৈকত ভূমির মনোরম পরিবেশে দেহমন জুড়িয়ে গেল অভিযাত্রীদের। ঝটপট সবুজ তাঁবু খাটিয়ে ফেলা হল রাজাদের উপত্যকায়—উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা দৈত্য আর হোতু মাতুয়ার রাজবংশ শুরু হয়েছিল যে প্রস্তর-নিবাসে—তার মাঝে। জিনিস পত্র জাহাজ থেকে নামাতে সাহায্য করেছিল যে সব নেটিভরা, উঁচু পাঁচিল পেরিয়ে এসে সবুজ তাঁবু কোথায় খাটানো হয়েছে দেখে তারা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল অবশ্য। মেয়র গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে ভক্তিরসঘন কণ্ঠে শুধু বললে—'এই সেই জায়গা যেখানে প্রথম বাড়ী বানিয়েছিলেন হোতু মাতুয়া—ঐ দেখুন তাঁর রান্নাঘর।'

আবার এক প্রস্থ হোতু মাতুয়া মাহাত্ম্য শুনতে হল অভিযাত্রীদের। বাধা দিল না কেউই। বরং স্বেচ্ছায় হাত লাগালো বাদবাকী তাঁবুগুলো খাটাতে। রাত নামবার আগেই চার জন নেটিভ সহকারী গিয়ে পাকড়াও করে আনল সাজহীন চারটে ঘোড়া—অভিযাত্রীদের হাজার ধন্যবাদ জানিয়ে টগ-বগিয়ে উধাও হল গ্রাম অভিমুখে।

ঘুমে তখন চোখ জুড়ে আসছে থরের। তাঁবুর মধ্যে শুয়ে দেখতে লাগলেন তাঁবুর পাতলা কাপড়ের মধ্যে দিয়ে চাঁদের আলো। কানে ভেসে এল ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ—বহু শতাব্দী আগে ঠিক ঐ জায়গাটিতে দ্বীপে নেমে এমনি করে হয়ত ঢেউয়ের গজরানি শুনেছিলেন হোতু মাতুয়া। কিন্তু তিনি এসেছিলেন কি ধরনের জলপোতে চেপে— বলতেন কোন ভাষা—কে তা জানে! উপত্যকার চেহারাটাই বা তখন ছিল কি রকম? অন্যান্য সাউথ-সী দ্বীপে যেমন গাছপালা দেখা যায়, তেমনি বৃক্ষ সমারোহ কি ছিল এখানেও? হোতু মাতুয়ার বংশধরেরাই কি গাছ কেটে সাবাড় করেছে? উনুন ধরিয়েছে? ধূ-ধূ ঢেউ খেলানো প্রান্তরে ছায়া দেওয়ার গাছও আর রাখেনি?' এমনও তো হতে পারে যে বৃক্ষ সমারোহ এ-দ্বীপে কস্মিনকালেও ছিল না? থাকলে গাছ পচা মাটি নিশ্চয় জমতো দ্বীপের ওপর। কিন্তু তা তো নেই। হোতু মাতুয়ার বসতবাড়ীর অবশিষ্ট আর উনুন পর্যন্ত যখন দেখা যাচ্ছে, তখন মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে হয়ত অনেক লুপ্ত বিস্ময়, এমন আশা করাটা কি ঠিক? খোঁড়াখুঁড়ি করাটা শেষ পর্যন্ত পণ্ডশ্রম হবে না

তো ? বালিয়াবি আর পাথরের ফাঁকে জমা মেঘের বিষ্ঠা ছাড়া জমিতে কোনো পরিবর্তন এসেছে বলে তো মনে হয় না সুদূর হো: মাতুয়ার সময়কাল থেকে। মনটা খারাপ হয়ে গেল থরের। কালসিটেতে হাত বুলিয়ে মনকে শক্ত করলেন। না খুঁড়ে তিনি হাল ছাড়বেন না। তারপর না হয় প্রোগ্রাম-মাফিক যাওয়া যাবে অন্যান্য দ্বীপে।

দ্বীপে নেমে প্রথম দিনগুলোয় পুরাতত্ত্ববিদরা পূব আর পশ্চিমে টহল দিতে বেরুলেন। বাকী সবাই সরঞ্জামাদি নিয়ে বসলেন অভিযানের খুঁটি-নাটি বিষয়ে আলোচনায়। দ্বীপের কোথাও পাহাড়ি ঝর্ণা বালাই নেই। কিন্তু তিনটে মরা আগ্নেয়গিরির একটা জ্বালামুখের গভীরে আছে জলা জায়গায় খোলা জল—তাও নলখাগড়ায় ভর্তি। সমুদ্র সৈকত থেকে চারমাইল দূরে দ্বীপের ঠিক মাঝখানে উঁচু জায়গায় চেইতিয়ায় ভেড়ার খোঁয়াড় থেকে জল আর কাঠ বয়ে আনতে হবে অভিযাত্রীদের। সেখানে এই শতাব্দীতেই একটা ইউক্যালিপটাস কুঞ্জ সৃষ্টি করে গেছে ইউরোপীয়রা। 'রানো আরোআই' আগ্নেয়গিরি থেকে পাইপে করে খাবার জলও আসে সেখানে। ইউরোপীয়রা প্রথমে এ দ্বীপে গাছপালা পায়নি—'রানো কাযো' আগ্নেয়গিরির গভীরতম জ্বালামুখের তলদেশে দেখেছিল কিছু গাছের জটলা। আজ পর্যন্ত সেইখান থেকে কাঠের চালান এসেছে কাঠখোদাইয়ের কারিগরদের কাছে। ঐ গাছের নাম 'তোরো মিরু'। গভর্ণরের কৃপায় একটা বড়সড় নৌকো পাওয়া গেল। জাহাজে মাল বোঝাই আর খালাস করার কাজে লাগে এই নৌকো। জাহাজের জীপ এই নৌকোয় চাপিয়ে আনা হল দ্বীপে। জল আর কাঠ আনার সমস্যা মিটল জীপ আসার পর।

ঈস্টার দ্বীপে অতি প্রাচীনকালে রাস্তাঘাট ছিল। তার ক্ষীণ চিহ্ন এখনও বর্তমান। ভেড়ার খোঁয়াড়ের ম্যানেজার যাচ্ছেতাই পাথর দিয়ে এই রাস্তার সংখ্যা আরো বাড়িয়ে নিয়েছে। লম্বায় দশ মাইল ঈস্টার দ্বীপের যত্রতত্র এই সব পথ বেয়ে জীপ গাড়ীতে চড়ে নাচতে নাচতে যাওয়া যায়। ফাদার সিবাসটিয়ান এবং গভর্ণর বেশ কিছু ঘোড়া জোগাড় করে দিলেন অভিযাত্রী-দের—সেই সঙ্গে ঘরে তৈরি কাঠের ঘোড়ার-সাজ। দ্বীপে সবচেয়ে গরীব মানুষটারও জিন লাগানো ঘোড়া অন্তত: একটাও আছে। কঙ্করাকীর্ণ এই দ্বীপের মাটিতে পা ফেলে হাঁটাও যে ঝকমারি। লালচে-বাদামী আর কালো কয়লার মত লাভা ছড়িয়ে আছে দ্বীপের সর্বত্র। তাই বাচ্চাবেলা থেকেই অশ্বারোহণে পটু এরা। থর নিজেও দেখলেন, দুধের বাচ্চারা হাঁটতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে টক করে লাফিয়ে উঠছে ঘোড়ার খালি পিঠে, কেশর খামচে ধরে,

একজন বসে সামনে—আরেক জন পেছনে।

উপকূল বরাবর মান্ধাতার আমলের কয়েকটা কুয়ো আছে। পাকা হাতে খোঁড়া কুয়ো—পাথর দিয়ে বাঁধানো। সামান্য নোনা জল খেতে অভ্যস্ত হয়েছিল আদি বাসিন্দারা। সন্ধান পেয়েছিল কয়েকটা পাতাল স্রোতস্বিনীর। সুপ্রাচীন পাথর বাঁধাই এই সব পাতকুয়োর ওপর এখন নির্মিত হয়েছে হাওয়াকল। পাম্প করে সামান্য নোনা জল তোলা হয় ঘোড়াদের জন্যে। অভিযাত্রীদের ঘোড়াগুলোর জল খাওয়ার ব্যবস্থা হল এই সব পাত কুয়োয়—এখান থেকেই ক্যাম্পে জল নিয়ে আসা হলো কাচাকুচির জন্যে।

মেরো মত মাছি উড়ছে। তাই বড় আকারের যেন তাঁবুর মধ্যে মশারী খাটিয়ে তার মধ্যে টেবিল সাজিয়ে ফেলেছে ছুতোর মিস্ত্রী। খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে মশারীর মধ্যেই।

থরের স্ত্রী একদিন বললেন—'দেখো বাপু, হাওয়া যে-দিক আসছে ঐ দিকে তাঁবুর পর্দা ঝুলিয়ে দিও। ধুলো আটকাবে।'

'ধুলো?'

বইয়ের তাকের ওপর আঙুল টেনে দেখালেন গিন্নী। সত্যিই ধুলোর স্তর পড়েছে—আঙুলের টানে বোঝা যাচ্ছে।

উল্লসিত হলেন থর। ধুলো তাহলে আছে আয়ল্যাণ্ডে। জোর হাওয়ায় সাহারের মিহি ধুলো যুগ যুগ ধরে এইভাবেই উড়ে এসে ছড়িয়ে পড়েছে দ্বীপময়—বেশীর ভাগই গিয়ে পড়েছে সমুদ্রে। কিন্তু শতাব্দী সঞ্চিত ধুলোর স্তর নিশ্চয় অনেক কিছুই ঢেকে রেখেছে আয়ল্যাণ্ডের ওপর—খুঁড়লে দেখা যাবে।

পুরাতত্ত্ববিদরাও টহল দিয়ে ফিরে এসে খবর দিলে, দ্বীপে খনন কার্য চালালে বিফল হবার কারণ নেই। ইউরোপীয়রা আসবার আগে ঈস্টার দ্বীপে দুটো বিভিন্ন মানবজাতি বসবাস করে গেছে। তাদের সভ্যতার চিহ্নও দেখা যাচ্ছে। আগে অবশ্য ক্যাম্পের কাছাকাছি কোথাও অল্প বিস্তর খনন চালিয়ে দেখা দরকার।

ঠিক হল, হোতু মাতুয়ার পূত অঞ্চলেই প্রথম প্রচেষ্টা হোক। তাঁর উনুনটা দিয়েই কাজ আরম্ভ হোক। গাঁইতি-শাবল কোদাই দিয়ে এ কাজ হয় না। রাজমিস্ত্রীর কর্ণিক দিয়ে একটু একটু করে চাঁচতে হবে মাটি। যত নিচে নামা হবে, ততই পুরোনো নিদর্শন উঠে আসবে চোখের সামনে।

ঘাসের চাপড়ার ঠিক নিচেই পাওয়া গেল একটা সেকেলে পাথরের গামলা—পাথর বর্শার ফলক এবং অন্যান্য ধারালো যন্ত্রপাতি—কালো আগ্নেয়

কাঁচ দিয়ে তৈরী। তারও নিচে পাওয়া গেল মানুষের হাড় এবং পালিশ করা পাথরের তৈরী মাছ ধরার বঁড়শি। ফুটখানেক নিচে কর্ণিক ঘসে গেল শক্ত পাথরে। পাওয়া গেল আর একটা পাঁচ-ঝিঁক-ওয়ালা উনুন—অবিকল ওপর ধার উনুনের মত।

অবাক কাণ্ড! দ্বীপবাসীরাও বলতে পারল না এ উনুনে কার রান্নাবান্না হয়েছে। তারা জানে এ জায়গা হোতু মাতুয়ার—তিনিই দ্বীপে প্রথম অবতরণ করেছিলেন। তাই যদি হয়তো তারও আগে এই উনুনে কার রান্নাবান্না হয়েছে? কে তিনি? এসেছিলেন কোথেকে?

আরও নিচে নামার পর পাওয়া গেল ভাঙা বঁড়শির বেশ কিছু টুকরো, শামুকের খোলা, কুচো হাড়, কাঠকয়লা, মানুষের দাঁত। দ্বিতীয় উনুনের নিচে গিয়ে পাওয়া গেল একটা ভেনিস-মুক্তো!

কিন্তু ভেনিস-মুক্তো তো এনেছিলেন রোগীভিন—১৭৭২ সালে। দুটো মুক্তোর মালা, একটা আয়না আর একটা কাঁচি উপহার দিয়েছিলেন প্রথম যে নেটিভ জাহাজে উঠেছিল—তাকে। বিদেশীর উপহার-সামগ্রী রাজার কাছে আসবে। এ আর আশ্চর্য কী! কিন্তু নিদর্শন যা পাওয়া গেল—তা দশ বছরের বেশী প্রাচীন নয়—ইউরোপীয়দের আবির্ভাবের আগের সময়ের নয়। ভেনিস-মুক্তোর নিচের মাটিতে বঁড়শি ছাড়া তো আর কিছুই নেই।

যাই হোক, একটা ব্যাপার অন্তত পরিষ্কার হয়ে গেল। দ্বীপে খনন কার্য চালিয়ে রিক্ত হাতে ফিরতে হবে না। কিছু জিনিস পাওয়া যাবেই, সেজন্যে অবশ্য চাই নেটিভ খনক, বিশেষ করে বড় রকমের কয়েকটা খনন কাজে।

দ্বীপে নামবার পর খুব বেশী নেটিভ উঁকিঝুঁকি মারে নি ক্যাম্পে। চুরি চামারি যাতে না হয়, তাই ফাদার সিবাসটিয়ান হুকুম দিয়েছেন দড়ি দিয়ে যেন ক্যাম্প ঘিরে রাখা হয়—নেটিভদের প্রবেশ নিষেধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযাত্রীদের মধ্যে যারা দ্বীপবাসিনীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চায়, করতে পারে। তবে ক্যাম্পে নয়—গ্রামে যেতে হবে ঘোড়ায় চেপে।

প্রথমদিকেই অবশ্য রাতের অন্ধকারে চুরি গেল দুটো জলের টিন। যে দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল ক্যাম্প, তারও বেশ খানিকটা উধাও হল। বোঝা গেল, সমুদ্র যাত্রার জন্যে যে দুটো ভেলা তৈরী হচ্ছে দ্বীপের মাঝখানে—দড়ি চালান গেছে সেইখানেই। কি আর করেন গভর্ণর, নিকোলাস আর কাসিমিরো নামে দুজন নেটিভ পুলিশ দিলেন ক্যাম্প পাহারা দেওয়ার জন্যে। দুজনেই বুড়ো। নিকোলাস লম্বা ছিপছিপে। কাসিমিরো ঠিক উল্টো—মোটা, গোলগালের মত। ঈস্টার দ্বীপের কাঠখোদাই মূর্তির মত

অবিকল। ভাগ্যিস আসল মূর্তিটা পাওয়া গেছে, নইলে সন্দেহ হত মূর্তি খোদাইয়ের মডেল হিসাবে এই কাসিমিরোকেই সামনে বসিয়ে রাখে কারিগররা। কাসিমিরোর কোমরে ঝোলে একটা বিরাট রিভলবার—চামড়ার খাপে। নেটিভ দেখলেই তেড়ে যায় রিভলবার নিয়ে। দূরদূর করে তাড়িয়ে দিয়ে ঢুলতে ঢুলতে ফিরে এসে ঢুলতে থাকে হদ্দকুঁড়ের মত। খেতে দিলে খায় গোগ্রাসে—যেন কতদিন খায় নি। পকেটভর্তি সিগারেট নিয়ে মাঝেমাঝে ঘুরপাক দিয়ে আসে তাঁবুর আশেপাশে। সুখের এ-রকম সপ্তম স্বর্গে থেকে বেচারাকে আলসেমিতে পেয়ে বসল। একদিন অবশ্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ থরের কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, পাখী-দ্বীপের একটা রত্ন গুহার সন্ধান সে জানে। থরকে নিয়ে যাবে—বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে সে নিজে। রত্ন যা মিলবে, তার অর্ধেক কিন্তু কাসিমিরো নেবে। ছেলেবেলায় তার বাবা আরও কয়েকজন ছেলেমেয়ে আর কাসিমিরোকে নিয়ে গিয়েছিল ঐ দ্বীপে। গুহার মুখ পাথর দিয়ে বন্ধ করা। কাসিমিরোকে দূরে দাঁড় করিয়ে কোন্ পথ দিয়ে যেন পাতাল রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল পিতৃদেব।

এতবড় একটা খবর পেয়েও থর কিন্তু দু-হাত তুলে নেচে উঠলেন না। উনি তো জানেন ঠিক এইভাবে ঠকেছেন রাউটলেজ আর ফাদার সিবাসটিয়ান। দ্বীপবাসীদের অন্তর জয় করলেই তারা চুপিচুপি খবর দেয় এমনি সব গুহার—যাদের মুখ পাথর দিয়ে বন্ধ করা। গুহার মধ্যে হয়ত আছে সাংকেতিক লিপি খোদাই করা পাথর—টাকা দিয়ে যার দাম হয় না। কেন না এরকম সাংকেতিক ছবি-কথা খোদাই করা পাথর সারা পৃথিবীর মিউজিয়াম খুঁজলে পাওয়া যাবে কুড়িটা, দেখা যাবে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে, ভূমিকম্পের ধাক্কায় সে সব গুহা মুখই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বন্ধ হয়ে গেছে পাথরের ধস নামায়।

ঈস্টার দ্বীপের ভাষায় এই ধরনের সাংকেতিক ছবি-কথার নাম রোঙ্গো-রোঙ্গো। রোঙ্গো-রোঙ্গো প্রস্তর ফলকের সন্ধানে রোঙ্গো-রোঙ্গো গুহা আবিষ্কার করা তাই আকাশকুসুম বললেই চলে।

দ্বীপে নামার পর প্রথম রোববারে থর সবাইকে নিয়ে গেলেন গির্জেতে। আস্তিক হোক কি নাস্তিক হোক, রোববারে গির্জেতে যে না যাবে, দ্বীপের মানুষ তাকে একঘরে করবে—ভাববে বিধর্মী অথবা স্বধর্ম বিদ্বেষী। তাই কাজ গুছোনোর জন্যে থর গেলেন গির্জেতে।

ফাদার সিবাসটিয়ান সাদা আলখাল্লার ওপর সবুজ হাতাহীন কোট চাপিয়ে

দাঁড়িয়ে ছিলেন গির্জের বাইরে। গাঁ খালি করে নেটিভরা এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে। প্রত্যেকের পরনে ধোয়া এবং ইস্ত্রী করা সাদা পোশাক। অভিযাত্রীরা পৌঁছোতেই সবাইকে নিয়ে ঢুকলেন গির্জের ভেতরে। দেওয়াল আর ছাদের ফুটো দিয়ে শুধু রোদ্দুর নয়, পাখী পর্যন্ত ঢুকছে ভেতরে। বেঞ্চিতে ঠাসাঠাসি করে বসে পড়ল ছেলে বুড়ো, মেয়ে বাচ্চা, জোয়ান ছোঁড়ারা। একমনে শুনে গেল ফাদারের কথা। সবশেষে ফাদার বললেন, দ্বীপে যাঁরা এসেছেন—তাঁদের খোঁড়াখুঁড়ির কাজে সবাই যেন সাহায্য করে।

ব্যস, সেইদিন থেকে দ্বীপের মানুষদের মধ্যে মিশে গেলেন অভিযাত্রীরা। ফাদার যখন বলছেন, তখন তো তাঁরা পর নন, ভিনদেশী হলেও কাছের মানুষ।

প্রার্থনার পর খাওয়া হল পেট ঠেসে। দ্বীপের মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গরা এল খাবার টেবিলে। এল দুজন সন্ন্যাসিনী—ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের কুষ্ঠকলোনীর তত্ত্বাবধান করে, এল চিলি সরকারের এয়ারফোর্স ক্যাপ্টেন—ঈস্টার দ্বীপে বিমান ঘাঁটি গড়বার মতলব নিয়ে যার আগমন। এল গভর্ণরের দুজন সহকারী। এল না কেবল দ্বীপের ডাক্তার আর স্কুলমাস্টার। ঈস্টার দ্বীপে যদ্দিন ছিলেন থর, এই দুই ব্যক্তিকে কোথাও যেতে দেখেন নি। গির্জেতে তো নয়ই—এমনকি গভর্ণরের অসুখ বিসুখ হলেও ডাক পড়েছে জাহাজের ডাক্তারের।

খাওয়া দাওয়ার পর সন্ধ্যানাগাদ থর সদলবলে রওনা হলেন ক্যাম্প-অভিমুখে। পথিমধ্যে গাঁট্টাগোট্টা এক ব্যক্তি পাকড়াও করলেন তাঁকে। লোকটার চুল আর চোখ—দুটোই মিশমিশে কালো এবং বেশ চকচকে। ঈস্টার দ্বীপের ডাক্তার সে। হুলা নাচ দেখাবার জন্যে থর এবং সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে গেল মেয়রের বোনের বাড়ী। কি ভিড় সেখানে! ছোট ঘরটা যেন ফেটে পড়তে চাইছে। জানলা দিয়ে ঢুকতে হল কয়েকজনকে। একটা জাগভর্তি সাদা তরল পদার্থ হাতে হাতে ফিরছে এবং গেলাসে নিয়ে চুমুক দেওয়া হচ্ছে দেখে আঁৎকে উঠেছিলেন থর। পরে জানলেন জিনিসটা টাটকা জল, ঘরের চাল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

হুলা নাচের আসরে যাওয়ার আগে ডাক্তার কিছু কূটনৈতিক কথাবার্তা বলে নিয়েছিল থরের সঙ্গে। তার আর স্কুল মাস্টারের ধমনীতে রেডই-ইণ্ডিয়ান রক্ত আছে—কালো চোখই তার প্রমাণ। তারা চায় দ্বীপের মানুষদের মুক্তি দিতে—বাইরের জগতের আলো দেখাতে—জুতো পরিয়ে সভ্য করতে।

কিন্তু ধর তো জানেন ফাদার সিবাসটিয়ান মোটেই তা চান না। দ্বীপের মানুষ দ্বীপেই থাকুক—মূল ভূখণ্ডে গেলে মদ খেয়ে গোল্লায় যাবে। আর জুতো? ঈস্টার দ্বীপের ধারালো লাভা কাঁকরের যা মহিমা! শুধু পায়ে যারা হেঁটে অভ্যস্ত তাদের পায়ের চামড়া এত শক্ত হয়ে গেছে যে কেটে কুটে যায় না। কিন্তু এরাই জুতো পরা অভ্যেস করলে পায়ের তলার চামড়া পাতলা হয়ে যায়। জুতো ছিঁড়ে গেলে পা কেটে রক্তারক্তি হয়। সুতরাং কি দরকার আপদ বাড়িয়ে? তাই ডাক্তারের কুমন্ত্রণার শরিক হলেন না ধর।

শুরু হল নাচ। ভলায় নাচে মেয়েরা টেনে নিয়ে গেল নাবিক আর আড়ষ্ট বৈজ্ঞানিকদেরও। নাচ শেষে ডাক্তার বললেন—'গীটার যারা বাজালো, ওদেরকে এক হাজার পিসোস্ অথবা পনেরোটা ডলার দিন। নইলে নাচের পার্টিতে আর থাকবে না।'

কিন্তু একটা কানাকড়িও না দিয়ে চলে এলেন ধর। সিগারেট আর চকোলেট বিলিয়েছেন দেদার। আবার কী?

তার জন্যে কিন্তু নাচের পার্টিতে আমন্ত্রণের অভাব হয়নি ভবিষ্যতে।

বেশ কিছু নেটিভ শ্রমিক জুটিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন ধর। গ্রাম থেকে রোজ তারা ভোর বেলা চলে আসত ঘোড়ায় চেপে। সবাই অবশ্য নয়। কিছু শ্রমিক আস্তানা নিল নিকটস্থ গুহায়। কাজের লোক বাড়ানোর জন্যে কাচাকুচি আর ক্যাম্পের কাজে নিয়োগ করা হল দুজন দ্বীপবাসিনীকে। এক-জনের নাম ইরোরিয়া। দারুণ খাটিয়ে মেয়ে—প্রথম শ্রেণীর নারী বলতে যা বোঝায়—তাই। কিন্তু এ হেন মেয়েই সময় বিশেষে বজ্রগর্ভ মেঘ হয়ে দাঁড়াতো কেউ ঘাঁটাতে এলে। ভুল বুঝতে পারলেই বজ্রচিহ্ন মিলিয়ে যেত মেঘ-মুখ থেকে—রোদ্দুর ঝলমলে হাসি হেসে আলাপ জমিয়ে নিত ইরোরিয়া। ফাদারের বাড়ীতে কাজ করত মেয়েটা। উনিই ধার দিয়েছিলেন ধরকে খুব বিশ্বাসী বলে। ইরোরিয়ার সঙ্গে এসেছিল তার প্রৌঢ়া বৌদি মারিয়ানা। দুজনেই ঈস্টার দ্বীপের সমস্ত গুহা চষে ফেলেছে। পকেট বোঝাই মোমবাতি নিয়ে ঘুরেছে গুহায় গুহায়, ছোট্ট লোহার শিক দিয়ে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করেছে পূর্বপুরুষদের হাড়ের অস্ত্রশস্ত্র আর পাথর খোদাই সামগ্রী। ফাদার সিবাসটিয়ানের ক্ষুদে সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ হয়েছে এই দুটি দ্বীপবাসিনীর প্রচেষ্টায়।

ফাদার সিবাসটিয়ানও একদিন বললেন—'পুরাকালের সামগ্রী যদি চান

তো গুহা খুঁজে দেখুন। ইয়োরিয়া আর মারিয়ানাকে নিয়ে যান—দ্বীপের সমস্ত পুরোনো গুহা ওদের নখদর্পণে।'

খনন কাজ নিয়ে অভিযাত্রীরা মত্ত হতেই থর একদিন চারটে ঘোড়া নিয়ে রওনা হলেন। সঙ্গে এল ফটোগ্রাফার, ইয়োরিয়া আর মারিয়ানা। প্রথম দিন সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত বিস্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহায় ঢুকে আবার বেরিয়ে এলেন থর। কিছু গুহামুখ বেশ প্রশস্ত, হেঁট হয়ে ঢোকা যায়। কিছু পাথর দিয়ে বন্ধ করা—একটুখানি চৌকোনা জায়গা বাদে। সেখান দিয়ে ঢুকতে হলে শুয়ে পড়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে অতিকষ্টে ঢুকতে হয়। আগে পা—হাত থাকে পেছনে, মাথার পেছনে। কখনো ভেতরকার সুড়ঙ্গ পথ অনুভূমিক ফানেলের মত লম্বালম্বি ভাবে গেছে নেমে। কখনো নেমেছে ঢালু হয়ে। প্রতিবারেই হাঁটু ছড়ে গেছে। গুহার ভেতরে ঢোকার পর ঘাড় বেঁকিয়ে কোনো মতে বসে থাকতে হয়েছে, নয়তো দু-পাই মুড়ে বসে থাকতে হয়েছে—ছাদ নিচু হলে যা হয় আর কি।

বাইরের বিপদ থেকে এই খানেই আত্মগোপন করে থাকত অধিকাংশ দ্বীপবাসী। প্রথম যখন ইউরোপীয় জাহাজ এসেছিল দ্বীপে, লুকিয়েছিল এই সব পাতাল বিবরে। প্রতিটা গুহাকক্ষই সাইজে মাঝারি কলতলার মত। মেঝে শক্ত পাথরের। তার ওপর শক্ত হয়ে জমে গেছে বাসিন্দাদের দেহনিষ্কাশিত আবর্জনা—হাজার হাত আর হাঁটুর চাপে তা এখন মোটর টায়ারের মত কঠিন। ছাদ আর দেয়ালগুলো পালিশ করা—পাকা রাজমিস্ত্রীর হাতে বানানো যেন।

এক জায়গায় হামাগুড়ি দিয়ে যেন একটা প্রকাণ্ড খোলামুখ পাত-কুয়োয় প্রবেশ করলেন থর। তলদেশে পৌঁছে গুঁড়ি মেরে ঢুকতে হল একটা সরু মুখ গর্তে। তার ভেতরে পর পর তিনটা প্রশস্ত গুহা ওপর ওপর সাজানো—তিনতলা বাড়ীর মত। ইয়োরিয়ার ঠাকুর্দা থাকত এখানে। শ্রদ্ধায় তাই তার মাথা নুয়ে এল গুহার সামনে। গুহার মেঝে কিন্তু লণ্ডভণ্ড করে ছেড়েছে মেয়েটা। কিছু আর বাকি নি শিক দিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে। অনেক চেষ্টার পর শুধু করাত দিয়ে কাটা একটা মানুষের হাড় পেলেন থর—একপ্রান্তে একটা ফুটো। গলায় ঝোলানো হত 'রক্ষচর'।

আর একটু এগিয়ে উপকূলের দিকে একটা ভিত দেখালো মারিয়ানা। এককালে উল্টানো নৌকোর আকারে নলখাগড়ায় তৈরী একটা কুঁড়ে ছিল সেখানে। তার শ্বশুর, ইয়োরিয়ার বাবা, থাকত সেখানে। খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গাঁ শুদ্ধ মানুষ হাঙ্গারোয়া গ্রামে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এই

অঞ্চলেই ছিল তাদের নিবাস।

সেদিন তাহলে বেশী দিন আগের ব্যাপার নয়। ট্রাউজার পরা মেয়ে দুটোকে কিন্তু দেখে তা মনে হয় না। মনে হয় যেন সোয়ার আমল থেকেই ওরা এই ধরনের চালচলনে অভ্যস্ত। কুঁচে ঘরের সাইজ আঁচ করে নেওয়া গেল। এ রকম ভিত আরও দেখতে পেলেন ধর। এই সব কটা ঘরে যদি মানুষ থেকে থাকত এককালে, তাহলে ঈস্টার দ্বীপের জনসংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না।

বেশীর ভাগ গুহায় তল্লাসি চালিয়ে গেছে এই দ্বীপবাসিনী। যেগুলোতে ঢোকে নি—সেগুলোর মুখ পাথর দিয়ে বন্ধ করা। এক রকম একটা গুহায় সঙ্কীর্ণ প্রবেশ পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকে চোদ্দটা কাঁকড়া বিছেকে সারি সারি রণংদেহী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন ধর। আর একটায় ঢুকে দেখেছিলেন টর্চের আলোয় মানুষের হাড় আর একটা মাথার খুলি। সন্তর্পণে খুলি উল্টোতে চোখে পড়েছিল কালো বর্শার ফলা আর ভীমরুলের চাক। ভাগ্য ভাল তাতে ভীমরুল ছিল না। থাকলে ফুলে ঢোল করে বেরোতে হত সরু গুহামুখ দিয়ে।

ক্যাম্পের পশ্চিমদিকে পাথুরে উপত্যকায় পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামলেন ধর। মারিয়ানার ছেলে নাকি খবর দিয়েছে এখানে একেবারে অন্য ধরনের একটা গুহা আছে। চারিদিকে ছড়ানো লাভাস্তূপের মধ্যে একেবারে অন্য ধরনের গুহার সন্ধান পেল কি করে ছেলেটা ভেবে খটকা লাগল ধরের।

কিন্তু পাতাল শহরের গোলকধাঁধায় ঢোকবার ঠিকানা জানবার পর বসে থাকবার পাত্র নন তিনি। গুহায় ঢোকবার কায়দাটা তিনি রপ্ত করে নিয়েছিলেন দুই দ্বীপবাসিনীর কাছ থেকে। আগে পা ঢোকাতে হয়—তারপর হাত মাথার ওপর তুলে বাকী দেহটা। সুড়ঙ্গ অনুভূমিক থাকলে চিৎ হয়ে—লম্বালম্বিভাবে নেমে গেলে বুকে শুয়ে। এই গুহাটার প্রবেশ পথ কিন্তু চৌকোনা—পাতকুয়োর মত নেমে গেছে পাতালে। মোমবাতির আলো দেখালো মারিয়ানা। মসৃণ পাথর দিয়ে তৈরী ঠিক যেন একটা ফানেল। উরু আর ঘাড়ের ছালচামড়া ছিঁড়ে গেল মাধ্যাকর্ষণের টানে নিচে নেমে আসার সময়ে। ফানেলের তলদেশে পৌঁছে গৌরাঙ্গের মত দুহাত মাথার ওপর তুলে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন ধর। দেখলেন দেওয়ালের গায়ে একটা চৌকোনা ছেঁদা। পা দুটো আগে ঢোকালেন সেই ছেঁদায়। পাথর ঠেকল বুকে, মুখে, পিঠে। কেঁচোর মত কিল বিল করে বাকী দেহটাকে টেনে

আনলেন অনুভূমিক সুড়ঙ্গের মধ্যে—দু-হাত কিন্তু তখনো তোলা রইল মাথার ওপর—এতটুকু জায়গা নেই যে হাত নামাবেন।

লিফট-সহ আধুনিক ইমারত যে কত আরামের তা হাড়ে হাড়ে সেদিন টের পেলেন খর সাহেব। শেয়ানো গৌরাঙ্গ-পঞ্জিসনে ঘসটে ঘসটে সর্বাঙ্গের ছাল চামড়া উঠিয়ে পায়ের দিকে খানিকটা নামলেন। পা ঠেকে গেল শক্ত পাথরের দেওয়ালে। এ অবস্থায় পা নেড়ে দেখলেন সমকোণে সুড়ঙ্গ বেঁকে গেছে একদিকে—হাঁটু মেলা যায় সেইদিকে। শুয়ে শুয়ে সমস্ত দেহটা পাক খাইয়ে উপুড় হলেন—হাঁটু চালান করলেন নতুন গুহায়। পেছন পেছন এল বাকী বপু। ঘসটে ঘসটে কিছুদূর যাওয়ার পর আবার পা ঠেকলো শক্ত পাথরের দেওয়ালে। এবার লম্বালম্বি ভাবে আরো পাতালে গুহা নেমে গেছে পাতকুয়োর আকারে। আবার দেহটাকে মোচড় মেরে ঘুরতে হল সেইদিকে—পা নামিয়ে দিলেন নিচে—একটু একটু করে বাকী দেহটাকে নামিয়ে আনলেন নিচে। কিছুদূর নেমেই পাতকুয়োর তলদেশে পৌঁছোলেন। পা নেড়ে নেড়ে দেখলেন পাশের দিকে নতুন একটা ছেঁদা—একটা অনুভূমিক ফানেল। আবার দেহটাকে মুচড়ে পা ঢোকালেন তার মধ্যে। একটু যেতেই সরে গেল দুপাশের দেওয়াল। হাত নামিয়ে আনলেন, উঠে মুখ চোখ থেকে বালি আর ধুলো ঝাড়লেন, কিন্তু দাঁড়ালেন না মাথা ঠুকে যাবার ভয়ে।

দু একটা গুহায় ঢুকেই আক্কেল হয়ে গিয়েছিল খরের। সঙ্গে পকেট-টর্চ রাখতেন। টর্চ জ্বেলে দেখে নিতেন কি ধরনের গুহা দিয়ে নামছেন। টর্চের আলোয় দেখছেন, চৌকোনা চিমনীর আকারে পাথর কেটে তৈরী হয়েছে সুড়ঙ্গপথ। ঠিক এই ধরনের ফুটোওলা পাথর তিনি দেখে এসেছেন জমির ওপর মনখ'গড়া দিয়ে তৈরী কুঁড়েঘরে। খুঁজলেন, কুঁড়েতে বসবাস তুলে দিয়ে পাতাল বিবরে নিবাস রচনা করেছিল আদিবাসীরা সেখানকার পাথর তুলে এনে। গুহার মুখ তাই পালিশ করা পাথর দিয়ে এমনভাবে তৈরী যে ইঁদুর ধরা কল বললেই চলে।

পাতাল গুহায় এই প্রথম অভিযানে কিন্তু সঙ্গে টর্চ আনেন নি খর। তাই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভূতের মত বসে রইলেন একলা। একটু পরেই নেমে এল মারিয়ানা—হাতে জলন্ত মোমবাতি। পকেট থেকে একটা মোমবাতি বের করে দিল খরের হাতে—জ্বালিয়ে দিল নিজের মোমবাতির শিখায়। বলিরেখাঙ্কিত মাকড়শার জাল জড়ানো অদ্ভুত মুখখানার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলেন খর। যেন জানলার কাচে চেপে ধরা বিদ্‌ঘুটে একটা মুখ!

হাঁসফাঁস করতে করতে এবার নেমে এল ইবোরিয়া। দুই দীর্ঘাঙ্গিনীর

মুখে শোনা গেল, এ গুহা সাধারণ গুহা নয়। যুদ্ধের সময়ে থাকবার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত। মেঝের জমাট বাঁধা পুরু মনুষ্য-পুরীষ দেখে আঁচ করলেন থর, সেকালের সেই যুদ্ধ তাহলে দু-চার দিনে শেষ হত না—চলত দীর্ঘকাল। তাছাড়া শত্রুপক্ষ গুহামুখ পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিলে পাতালেই পাতালবাসীদের কবর রচনা করে দেওয়া সম্ভব ছিল। তবে হয়ত এই একই কায়দায় শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দিয়েছে পাতালবাসীরা; পাথর গড়িয়ে এনে গুহামুখ নিজেরাই বন্ধ করে রেখেছে—শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দিয়েছে।

দেওয়ালের গায়ে আবার একটা ফুটো দেখলেন থর। এবার পায়ের কাছে ইরোরিয়া আর মারিয়ানাকে নিয়ে আগে নিজে ঢুকলেন ভেতরে। ক্রমশঃ চওড়া হয়েছে সুড়ঙ্গ। তারপর একটা ঘর। এত উঁচু যে মোমবাতির আলোয় ছাদ দেখা যায় না। এর পরেই রেলওয়ে টানেলের মত উঁচু সুড়ঙ্গ। আবার কোথাও হামাগুড়ি দিতে হল রাবিশের মধ্যে দিয়ে। তারপরেই হয়ত ইঁদুর গর্তের মত সরু সুড়ঙ্গ দিয়ে অতিকষ্টে গা-হাত-পা ছেঁচে যেতে হল কোনমতে। এই ভাবেই কিছুদূর যাওয়ার পর আবার হয়ত দেখা গেল পেল্লায় হলঘর। বিচিত্র! বিস্ময়কর!

মারিয়ানা নজর রেখেছে থরের ওপর। থর সাহেবও বার বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখছেন দুই দ্বীপবাসিনী পেছন পেছন আসছে কিনা। মারিয়ানা বার বার হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে—মাথার ছাদ আর পাশের দেওয়ালের দিকে যেন নজর রাখা হয়—আলগা পাথর খসে পড়তে কতক্ষণ। একটা বড় গুহা-ঘরের মধ্যে দেখা গেল পাতাল-স্রোতস্বিনী ঝিরঝির ধারায় বয়ে চলছে। আদিবাসীরা চৌবাচ্চা কেটে জমিয়ে রাখত এই জল। জলধারার ওপর আরো কয়েকটা অল্প-গভীর খোঁদল তারাই পাথর খুবলে বানিয়ে রেখেছে। স্রোতস্বিনীর জল এই রকম একটা খোঁদলে তুলে এনে পান করলেন থর। শরীর জুড়িয়ে গেল! শীতল তো বটেই, প্রথম শ্রেণীর খাঁটি সুরার মতই সুপেয়। শহরের মানুষরা ধাতুর পাইপে করে টেনে আনা জল খেয়ে অভ্যস্ত —এ জল তারা কল্পনাতেও আনতে পারবে না।

যেতে যেতে দেখা গেল মাঝে মাঝে অনেক শাখায় ভাগ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। কখনো সরু হয়েছে। কখনো ঘরের মত প্রশস্ত হয়েছে। ছাদ রয়েছে একই উচ্চতায়। দেখে মনে হয় যেন মানুষ কারিগরের সৃষ্টি। কিন্তু তা নয়। আশ্চর্য এই পাতাল গোলকধাঁধার সৃষ্টি আগ্নেয়গিরির প্রলয়লীলার সময়ে। ঈস্টার দ্বীপ তখন আগ্নেয়দ্বীপ ছাড়া কিছুই নয়। চকচকে মসৃণ

প্রস্তর সৃষ্টি হয়েছে সেই সময়ে—আগ্নেয় গ্যাসের ভয়ংকর চাপে সৃষ্টি হয়েছে গুহাঘরের পর গুহাঘর– ছোট, বড, মাঝারি, প্রকাণ্ড। কখনো গম্বুজের মত বিচিত্রসুন্দর। কখনো এত সংকীর্ণ অথবা কাণাগলি যে এগোনো সম্ভব নয়।

যেন মুক্তার মালা সাজানো পাতালদেশে। বড বড সারি সারি ঘর চলেছে তো চলেইছে। প্রবেশপথগুলো পাকা হাতে পাথর দিয়ে বন্ধ— ঢুকতে হবে ফানেলের মত একটিমাত্র ছেঁদা দিয়ে - সে পথ কখন আঁকাবাঁকা, কখনো লম্বালম্বি পাতকুয়োর মত। মহা শত্রুর পক্ষেও সে পথে আসা অসম্ভব। আলো জ্বেলে পেছায় ঘরে পাতাল স্রোতস্বিনীর সন্ধান পেলেন থর। তৃতীয় ঘরে দেখলেন রীতিমত একটা পুকুর। তার পরের ঘরেই বরফঠাণ্ডা জল ভর্তি একটা পাতকুয়ো। দশফুট উঁচু চাতাল দিয়ে চারপাশ পরিপাটিভাবে বাঁধানো। সুবিশাল এই পাতালরন্ধ্রে ঈস্টার দ্বীপের সমস্ত মানুষের ঠাঁই হয়ে যায়। দেখেশুনে মনে হল, এক একটা ঘরে থাকত এক একটা পরিবার। রোদ্দুর ঝলমলে কুঁড়েঘর ছেড়ে এই অন্ধপুরীতে ছুচুন্দরের মত থাকা নিশ্চয় আহাম্মুকি। কিন্তু সভ্যদেশের মানুষও তো ইদানীং অ্যাটম বোমার ভয়ে পাতালপুরী নির্মাণ করে চলেছে।

আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ আর ফানেল বেয়ে জমির ওপরে উঠে এসে খুশী হলেন থর। আরও বেশী খুশী হয়েছিলেন অবশ্য পাতালপুরীতে হামাগুড়ি দেওয়ার সময়ে।

পাতাল পরিভ্রমণে সময় লাগল মোট আশি মিনিট। গুহা মুখ দিয়ে রোদ্দুরে এসে দাঁড়াতেই দেখলেন মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে ফটোগ্রাফার। বেচারী কিছুটা পথ নেমে ভয়েভয়ে উঠে এসেছে ওপরে। গোঁপে এক টার মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবার পরেও কাউকে বেরোতে না দেখে ভেবেছে থর সাহেব পথ হারিয়েছেন। বিষম উদ্বেগে হেঁকেছেন গুহার মধ্যে মুণ্ড বাড়িয়ে। হাঁকডাক প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে গেছে অনেকদূরে। গমগমে ধ্বনি শুনে বিভলবার উঁচিয়ে তেড়ে এসেছে কাসিমিরো—অনুগত অনুচরের মত পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছে নিশ্চুপ হয়ে।

মারিয়ানা বললে—‘সিনর, এবার থেকে গুহায় ঢুকলে বাইরে টুপি রেখে যাবেন। টুপি না থাকলে যা হয় কিছু রেখে যাবেন। চিলি থেকে এক গুপ্তধন সন্ধানী এরকম একটা গুহায় ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। ভাগ্যিস কোট আর টুপি বাইরে রেখে গেছিল, তাই দ্বীপের লোক দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে।’

পুরাতত্ত্ববিদরা কিন্তু গুহায় গিয়ে জঞ্জালের মধ্যে মাছের কাঁটা আর

মুরগী-ইঁদুর-কচ্ছপ-মানুষের হাড় ছাড়া কিছু পেল না। গুহাবাসীরা উচ্ছিষ্ট ফেলে এমন পাহাড় বানিয়েছে যে মাথা ঠেকে যায় ছাদে। নরখাদকও ছিল গুহায়, ইঁদুর খেয়ে আশ মেটে নি—বিপদ শত্রুদের ধরে এনে মিটিয়েছে পেটের খিদে—সরু সরু হাড়গুলো চুষে ফেলেছে জঞ্জালের গাদায়। গর্ত গনে পাথরের উনুনে অবশ্য রেঁধেছে নরমাংস—চিহ্ন এখনো বর্তমান।

মাথা গুলিয়ে গেল থরদায়েরের। এ আবার কি হেঁয়ালী? যারা মানুষ খায়, দ্বীপের ওপরে কুঁড়েঘরে থাকতে চায় না—তারা অমন বিকট বিচিত্র মূর্তি নির্মাণের দক্ষতা অর্জন করল কি করে? বিরাট মূর্তিগুলো খাড়া করার পেছনে যে গভীর ইঞ্জিনীয়ারিং জ্ঞানের প্রয়োজন, সে জ্ঞানে তারা জ্ঞানী হল কি ভাবে?

মানুষের পোড়া হাড় আর কুকুরে-দাঁত আবিষ্কৃত হল এমনি একটা গুহার মধ্যে। নরখাদকরা নরমাংস খেতে খেতে দাঁত উপড়ে ফেলেছে—গুহার মধ্যেই ফেলে গেছে শদন্ত।

ঈস্টার দ্বীপের ইতিহাসে এ নজীর অবশ্য আছে। পালাবিণ ওপলক্ষোই যে এরা নরমাংস খেয়েছিল—তা নয়। 'লম্বকর্ণ'রা বেশী খাটাতো 'হ্রস্বকর্ণ'-দের—শেষোক্ত ব্যক্তিরাই কিন্তু দ্বীপের পুরোনো বাসিন্দা। একদিন খেপে গেল 'হ্রস্বকর্ণ'রা। খতম করল সমস্ত লম্বকর্ণকে—একটা খানায় ফেলে পুড়িয়ে দিল লাশগুলো। তারপর থেকেই গৃহযুদ্ধ, পারিবারিক অন্তদ্বন্দ্ব এবং মারপিট লেগেই ছিল ঈস্টার দ্বীপে। দু-পুরুষ আগে ফাদার সিবাসটিয়ান এসে সবাইকে ঠাণ্ডা করে বসতি করলেন হাঙ্গাবোয়া গ্রামে।

ফাদার সিবাসটিয়ান নিজেও বললেন, ঈস্টার দ্বীপে দুটো পৃথক মানব জাতি বসবাস করেছে এককালে। সায় দিল দ্বীপবাসীরা। আরও জানা গেল, সাউথ-সী দ্বীপসমূহের অন্যান্য বাসিন্দাদের মত নয় ঈস্টার দ্বীপের বাসিন্দারা। শ্বেতাঙ্গদের বংশধরেরাও একসময়ে সংসার করে গেছে এই দ্বীপে। দ্বীপের কিংবদন্তী অনুসারে, ঈস্টার দ্বীপের আদি-বাসীদের অনেকের চুল ছিল লাল, চোখ নীল, চামড়া সাদা। ফাদার সিবা-সটিয়ানও অবাক হয়ে গেছিলেন বাদামী মানুষদের মধ্যে বহু সাদা চামড়ার মানুষ দেখে। মিসেস রাউটলেজকে দ্বীপবাসীরা বলেছিল—তাদের শেষ রাজার গায়ের রঙ ছিল ধবধবে সাদা।

সম্মান আর শ্রদ্ধা করা হত সাদা চামড়ার মানুষদের। আজও অন্যান্য সাউথ-সী দ্বীপে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বিশেষ প্রক্রিয়ায় গায়ের রঙ সাদা করে নেয় বেশী সম্মান পাওয়ার জন্যে। ঈস্টার দ্বীপে তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

ঈস্টার দ্বীপে শ্বেতসুন্দরী বানানোর কারখানাও দেখে এলেন থরসাহেব।

ফাদার সিবাসটিয়ান নিয়ে গেলেন ওঁকে 'আনা-ও-কেকে' নামক সেই পবিত্র স্থানে। 'নেরু' কুমারীদের শ্বেতসুন্দরী বানানো হত সেখানে প্রাচীন কালে। 'নেরু' হল সেই সব বিশেষ নির্বাচিত কুমারীদের নাম যাদের গভীর গিরিকন্দরে অন্তরীণ রাখা হত বিশেষ ধর্মীয় উৎসবের জন্যে। গভীর গুহায় দিনের পর দিন অসূর্যম্পশ্যা থেকে বেচারীরা ফ্যাকাশে আর সাদা হয়ে যেত। দীর্ঘকাল তাদের সূর্যের আলো দেখতে দেওয়া হত না— আত্মীয়স্বজনের মুখ পর্যন্ত দেখতে পেত না। মেয়েরা খাবার নিয়ে গিয়ে গুহার মধ্যে ঠেলে দিত। বসন্ত মহামারী দ্বীপের সব মানুষকে গ্রাস করেছিল, 'নেরু' কুমারীদের গায়ে কিন্তু আঁচ পর্যন্ত লাগে নি। বসন্তে মারা না গেলেও হতভাগিনীরা মারা গেল স্রেফ অনাহারে। খাবার নিয়ে যাওয়ার মত কেউ আর ছিল না দ্বীপে।

'আনা-ও-কেকে' গুহা ঈস্টার দ্বীপের একদম পূব প্রান্তে—পয়েক অন্তরীপে। 'আনা-ও-কেকে' মানে—যে-গুহায় সূর্য হেলে পড়ে। স্প্যানিয়ার্ডরা দ্বীপে নেমে তিনটে ঢিবির ওপর ক্রশ পুঁতে গেছিল—ঢিবি তিনটে চোখে পড়ল পূবপ্রান্তে যাওয়ার পথে। এখানেও একটা গুহা আছে। আর আছে পাথর খুদে তৈরী ভয়ংকর-দর্শন একটা দানবের মুখ। বৃষ্টির জল ঝর্ণার মত পড়ছে হাঁ-করা মুখের মধ্যে দিয়ে। বিকট হাঁ-টা বিরাট। এত বিরাট যে থরসাহেব সটান ঢুকে গেলেন মুখ বিবরে এবং নিচের ঠোঁটের আড়ালে দিব্বি লুকিয়ে ফেললেন নিজেকে।

ফাদার সিবাসটিয়ান কিন্তু ওঁদের নিয়ে গেলেন আরো দক্ষিণে। হন্‌হন্‌ করে হেঁটে চললেন বিষম খাড়া প্রাচীর-সমান পাহাড়ের ওপর দিয়ে— অন্তরীপ ঘিরে রয়েছে এই পাথুরে প্রাচীর—সটান নেমে গেছে জলের দিকে। একটু পা ফসকালেই সলিল সমাধি। প্রচণ্ড হাওয়ার ঝাপটায় পা ফেলা দায়—হেলে পড়ে দেহ সমুদ্রের দিকে। ফাদারের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। লম্বা আলখাল্লা পত পত করছে দামাল হাওয়ায়। ভারী কালো বুট পরে গট গট করে হেঁটে চলেছেন সবার আগে একদম কিনারা দিয়ে। বিপদ ঘটতে কতক্ষণ! বারণ করলেন থরসাহেব। কানে তুললেন না ফাদার। উনি খুঁজছেন কুমারীদের গুহা—ঠিকানা তো জানেন না। আচমকা একটা হলদে-বাদামী পাথর খসিয়ে নিয়ে মাথার ওপর তুলে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন সোল্লাসে—রোদে জলে ক্ষয়ে এসেছে পাথরের টুকরোটা। পরমুহূর্তেই দামাল হাওয়া জাহাজের পালের মত ফুলিয়ে তুলল তাঁর লটপটে আলখাল্লা—

পরক্ষণেই আর দেখা গেল না তাঁকে।

মুখে হাত চাপা দিয়ে বসে পড়ল থরসাহেবের এক সঙ্গী। দৌড়ে গেলেন থরসাহেব। বহু নিচে দেখা যাচ্ছে ফেনিল সমুদ্র। খাড়া পাহাড় সটান নেমে গেছে সেইদিকে। টিকটিকির মত পাথর বেয়ে বেয়ে হনহন করে নেমে যাচ্ছেন ফাদার সিবাসটিয়ান। মুখ তুলে তাকালেন থরসাহেবের দিকে। হাসলেন। মুখে হাত দিয়ে ইসারায় বললেন, খাবারের প্যাকেটটা যেন সঙ্গে আনা হয়—মধ্যাহ্ন ভোজ নিচে খাওয়া হবে।

থরের তখন আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড় দুর্দান্ত হাওয়ার দাপটে। নড়বড়ে পাথরে পা রাখা দায়—নামবেন কি করে? ফাদারের সাহস দেখে মনটা শ্রদ্ধায় ভরে গেল তাঁর। কিছু হটে এসে গায়ের জামা খুলে ফেললেন। খাবারের প্যাকেট নিয়ে সন্তর্পণে নিচে নামতে লাগলেন।

কিন্তু কোথায় ফাদার? ছ-শ ফুট নিচ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—ফাদারের আলখাল্লা তো দেখা যাচ্ছে না। বহু নিচে ঝাঁপাই জুড়েছে কেবল ক্ষুব্ধ সমুদ্র।

হাওয়াও যেন সেদিন বড় প্রবল, বড় দামাল। পা টিপে টিপে অনেকখানি নেমে এলেন থর। এক জায়গায় একটা মাটির ঢিপি ধরে কোন মতে বাঁক নিলেন দেখতে পেলেন ফাদার সিবাসটিয়ানের হাসি হাসি মুখ। কুকুরের ঘর যত বড়, তার অর্ধেক সাইজের একটা গুহামুখের ভেতর সমস্ত শরীরটা ঢুকিয়ে শুয়ে আছেন তিনি—বেরিয়ে আছে কেবল মুণ্ড আর ঘাড়। থর সাহেবকে দেখেই হেঁকে উঠলেন— আসুন আমার গুহায়।'

সে দৃশ্য জীবনে ভুলবেন না থরসাহেব। হাওয়ায় সাদা দাড়ি উড়ছে বৃদ্ধ পাদরীর। হাসিতে সমুজ্জ্বল মুখচ্ছবি। ফাদার সিবাসটিয়ান এই মূর্তি নিয়েই চিরকাল জাগত থাকবে তাঁর স্মৃতি পটে।

শরীরটাকে গুটিয়ে ফের ভেতরে ঢুকে গিয়ে থরসাহেবকে ঢোকবার পথ করে দিলেন ফাদার। একসঙ্গে দুজনের ঢোকবার মত পথ তো নেই। একই কায়দায় আগে পদযুগল, পরে বপু প্রবিষ্ট করালেন থর। ভেতরে গুহামুখ খাড়াই নেমে গেছে নিচের দিকে। চক্ষের নিমেষে উধাও হল হাওয়ার ঝাপটা, আলো এবং সমস্ত শব্দ। পাঁচফুট উঁচু একটা গুহায় মধ্যে বসে পড়লেন দুজনে। অপ্রশস্ত এই গুহাঘরে খুব জোর বারোজন বাচ্চা পাশাপাশি বসে থাকতে পারে। এই সেই বিখ্যাত কুমারীদের গুহা—এইখানে তারা হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস—অথবা হয়ত বছরের পর বছর অন্তরীণ থেকেছে চামড়া সাদা করার জন্যে।

পকেট টর্চ জ্বালালেন থর। নানারকম অদ্ভুত মূর্তি আঁকা দেখলেন দেওয়ালে। শ্বেতসুন্দরী বানানোর কারখানাই বটে।

গুহামুখ অন্ধকার করে এসে ঢুকল থরসাহেবের একজন নেটিভ বন্ধু। তারও পেছনে আরো দুজন। মোট পাঁচজনে গুহার মেঝেতে বসে হাসিঠাট্টা করলেন কিছুক্ষণ। গুহার পেছন দিকে একটা ছেঁদার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন ফাদার। ঐ গুহা দিয়ে আরও চারশ গজ ভেতরে যাওয়া যায়। উনি এইমাত্র গিয়ে দেখে এসেছেন মানুষের হাড়ের আর দাঁতের স্তূপ। কিন্তু পথ এত সঙ্কীর্ণ যে দ্বিতীয়বার আর যাবেন না। এত সরু পথ দিয়ে মানুষ যেতে পারে না—মড়া টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিভাবে, ভেবে মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়েছে ওঁর। সামনে ঠেলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়--পেছনে টেনে আনলেও জ্যান্ত মানুষটার ফিরে আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

সার্ট পরে নিলেন থরসাহেব। দেখে আসবেন গুহার অন্দর মহল। অট্টহেসে উঠলেন ফাদার। অন্দর মহলের চেহারা দেখলে আর দ্বিতীয়বার নাকি যেতে চাইবেন না থরসাহেব। সঙ্গে এল কেবল নেটিভ বন্ধু। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলেন তিনি সরু গুহা দিয়ে। দু-ভাগ হয়ে গিয়ে আবার এক সঙ্গে মিলেছে দুটো সুড়ঙ্গ। সেখান থেকে গুহা বেশ বড় হয়ে উঠেছে। উঠে দাঁড়িয়ে পকেট টর্চ জ্বালিয়ে সামনের পথ দেখে নিলেন থরসাহেব। ক্যাম্পে তখন হয়েছিল ব্যাটারী। পাছে নিভে যায়, এই ভয়ে জ্বালিয়ে রাখবার ভরসা হল না। টর্চ নিভিয়ে দৌড়ে গেলেন কিছুটা পথ। মাকড়শার জালে মুখ ঢেকে গেল। গুহার ছাদে তিন চার বার মাথা ঠুকে গেল। ঝুরঝুর করে গুঁড়ো পাথর জামার মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর একটু একটু করে নীচু হতে লাগল গুহা। শেষ কালে ছাদ এত নিচে নেমে এল যে বুকের ওপর শুয়ে কেঁচোর মত কিলবিলিয়ে এগোনো ছাড়া উপায়ান্তর রইল না। ফাদার যদি এই ভাবে যেতে পারেন, থরসাহেবকেও যেতে হবে—ফিরলে চলবে না। গুহার মেঝে কিন্তু প্যাচপেচে কাদা আর জলে ভর্তি। সার্ট আর প্যান্ট জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল। তবুও এগোলেন থরসাহেব। সকৌতুকে কয়েকবার বললেন বটে—'চমৎকার রাস্তা হে।' কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর কৌতুকবোধ উবে গেল। নেটিভ বন্ধুটি আর থাকতে না পেরে বলে উঠল –'খুবই খারাপ রাস্তা, স্যর।'

পকেট টর্চটা ওয়াটার-টাইট। তাই জল কাদার মধ্যেও জ্বালতে পারলেন থরসাহেব। কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকারে চারপাশের চেপে ধরা পাথর ছাড়া কিছু দেখলেন না। পাঁচ গজ পথ অতিকষ্টে এগোলেন এইভাবে। জল কাদায়

মাথামাথি হয়ে অবশেষে বেরিয়ে এলেন চওড়া গুহায়। চওড়া মানে কোনো মতে হামাগুড়ি দেওয়া যায়। আরও একটু এগোতে পেলেন একটা গম্বুজাকৃতি গুহা। মনে হয় যেন মানুষ কারিগরের সৃষ্টি—আসলে আগ্নেয় গ্যাসের একটা বুদ্বুদ ছিল সেখানে—তাই এমন চমৎকার চেহারা নিয়েছে।

মেঝেতে পড়ে রাশিকৃত কংকাল! কুমারীদের হাড়। বেচারীরা না খেয়ে হয়ত ছুটে এসেছিল এখানে—আর ফিরতে পারে নি!

ফাদার সিবাসটিয়ান একটা মোমবাতি রেখে গেছিলেন এই ঘরের মেঝেতে। থরসাহেবের হিপ-পকেটেও ছিল মোমবাতি। ফাদারের মোমবাতি জ্বালাতে গিয়ে পারলেন না। দেশলাই বিগড়েছে।

পেছনের গুহা দিয়ে বেরিয়ে এল কাদা মাখা বিকট একটা মূর্তি—নেটিভ দোস্ত!

বদ্ধ বাতাসে দম আটকে আসছিল থরসাহেবের। তাই বেরিয়ে পড়লেন গম্বুজ গুহা ছেড়ে। আবার বুকে হেঁটে গেলেন জল কাদা ভেঙে। পেছনে নেটিভ সঙ্গী। কিছুদূর গিয়েই অতর্কিতে ওপর দিকে বাঁক নিয়েছে রন্ধ্রপথ। আসবার সময় হয়ত এই বাঁক দিয়ে নামতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু যাওয়ার পথে কালঘাম ছুটে গেল। অতিকষ্টে ঘাড় মুচড়ে শরীর বেঁকিয়ে রন্ধ্রপথে এগোলেন থরসাহেব। মাথা বাড়িয়ে দেখলেন সামনে একটা ছোট্ট ফুটো মুণ্ড গলবারও উপযুক্ত নয়!

ভুল পথে এসেছেন। এদিকে গোটা পয়েক অন্তরীপ চেপে বসেছে পিঠের ওপর। দেহটাকে কোনমতে পাতলা করার চেষ্টা করেও রেহাই পেলেন না। দম আটকে এল প্রচণ্ড চাপে। পাথর চারদিক থেকে যেন পিষে মারতে চায় তাঁকে।

চিৎকার করে বললেন—'এ রাস্তা নয়, পেছনে চলো!'

নেটিভ দোস্ত বললে রুদ্ধশ্বাসে—'এই রাস্তাই—সামনে চলুন।'

আরও খানিকটা এগোলেন। অসম্ভব। ঐ ছেঁদা দিয়ে বেড়াল গলতে পারে—মানুষ নয়।

দম আটকানো গলায় ফের বললেন—'পেছনে যাও!'

বেঁকে বসল নেটিভ। সে আর পেছবে না। কাকুতি মিনতি করলেন থরসাহেব—কিন্তু বৃথাই।

টর্চ জ্বালিয়ে দেখলেন থরসাহেব। কাদায় তাঁর সার্টের বোতামের ছাপ পড়েছে, আঙুলের দাগও রয়েছে। কিন্তু সামনে কোনো দাগ নেই।

ওপথ দিয়ে তিনি আসেন নি।

আবার বললেন—'গো ব্যাক! গো ব্যাক!'

কে কার কথা শোনে। পেছন থেকে ঠেলছে নেটিভ।

'গো ব্যাক! গো ব্যাক!'

মাথা দিয়ে গুঁতোচ্ছে নেটিভ সঙ্গী!

খেপে গেলেন থরসাহেব। লাথি মারলেন মাথায় পা দিয়ে।

কাজ হল তাতে। পিছু হটে গেল নেটিভ ইঞ্চি ইঞ্চি করে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে পেছিয়ে এলেন থর। দেখলেন ডানদিকে একটা রন্ধ্রপথ—ভুল করে তিনি বাঁদিকের খাড়াই রন্ধ্রপথে ঢুকে পড়েছেন।

ঢুকলেন নতুন পথে। আবার দম আটকানো বাতাস. আবার জল কাদা, আবার পয়েক অন্তরীপের কোটি কোটি টন পাথরের চাপ। পিষে মারা যাবেন যেন।

আবার সামনে সেই ছোট্ট ফুটো—মুণ্ড পর্যন্ত ঢোকে না।

'গো ব্যাক! গো ব্যাক!'

মুহ্যমানের মত পেছিয়ে গেল নেটিভ। পেছিয়ে এলেন থর। তাঁরও মাথা ঘুরছে। চিন্তাশক্তি আবিল হয়ে উঠেছে। শুধু জানেন ডানদিকে··· আরও ডানদিকে। পেয়ে গেলেন ডাইনে আবার একটা রন্ধ্রমুখ। ঢুকলেন ভেতরে। কোথায় যাচ্ছেন, জানেন না। জীবন্ত আর বেরুতে পারবেন কিনা তা নিয়েও আর ভাবছেন না।

রন্ধ্রপথ আরও সরু হল। তারপরেই প্রশস্ত হ'ল। মুখে লাগল ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা। পাগলের মত হাঁচড়-পাঁচড় করে বেরিয়ে এলেন বাইরে। চওড়া গুহা। উন্মাদের মত দৌড়ে ফিরে এলেন ফাদারের গুহায়।

কাদামাখা বিকট চেহারা দেখে হাসতে হাসতে হাসতে বললেন ফাদার —'হল?'

থর তখন কথা বলতে পারছেন না। খাবি খেতে খেতে বললেন—'এ গুহায় মানুষের হাড কেন থাকে, হাড়ে হাড়ে তা বুঝে এলাম।'

'চামড়া সাদা করার গুহায় গেছিলে নাকি? ক্যাম্পে ফিরে আসার পর কর্দমাক্ত কালো চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন থর-গৃহিণী।

জবাব দেননি থরসাহেব। জামাপ্যান্ট পরেই দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ফেনিল লোনা সমুদ্রে।

৪। ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের দানব-রহস্য

চাঁদে বেড়িয়ে আসার স্বপ্ন যদি কারো থাকে, তিনি যেন ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের মরা আগ্নেয়গিরির চূড়ায় এসে আয়ল্যাণ্ডের চেহারাখানা দেখে যান। অনুর্বর চন্দ্রপৃষ্ঠ কি রকম তার খানিকটা আন্দাজ পাবেন। আকাশ সমুদ্রের মাঝে স্থির এই চাঁদের জ্বালামুখগুলির গায়ে বৃক্ষ বলে কোন বস্তু নেই—আছে কেবল ঘাস আর শ্যাওলা। সেই পুরাকালে আগুন যখন লেলিহান শিখা মেলে ধরত আকাশ পানে. তখনও বুঝি এই রকম অলস নিদ্রালু চেহারা ছিল এদের। হাঁ করে আকাশ পানে তাকিয়ে আছে তো আছেই। বেশ কয়েকটা এমনি প্রশান্ত আগ্নেয়গিরি ছড়িয়ে আছে দ্বীপময়। এদের বাইরে সবুজ, ভেতরেও সবুজ, অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে অনেক আগে। তাই জ্বালামুখের তলদেশে আকাশ-নীল জলে নলখাগড়ার বন—বাণিজ্যবায়ুতাড়িত মেঘের ছায়া পড়ে আয়নার মত স্থির জলে।

জলভর্তি এইরকম একটা আগ্নেয়গিরি হল 'রানো রারাকু'। চাঁদের মানুষরা এখানেই যেন তৎপর হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। কিন্তু হাতের কাজ হঠাৎ ফেলে ছড়িয়ে চম্পট দিয়েছে। দেখা পাবেন না কারোর। তবুও মন বলবে, আশেপাশেই পাহাড়-কন্দরে হয়তো লুকিয়ে আছে। অথবা পায়ের তলায় লুকোনো গর্তে ঘাপটি মেরে আছে। আপনি এসে পড়ায় এইমাত্র যেন লুকিয়ে পড়েছে—বাধা পড়েছে হাতের কাজে। এই সভ্যতা যে ক্ষণস্থায়ী, মহাকাল যে একদিন মানবগর্ব চূর্ণ করবেই—রানো রারাকু তার নিদর্শন। এতবড়, এত মহান স্মৃতিসৌধ পৃথিবীতে আর নেই। গোটা পাহাড়টার গা খুবলে খুবলে পাহাড়ের চেহারা পালটে দেওয়া হয়েছে। কঠিন পাথর নয় যেন—নরম কেক। ইচ্ছেমত ছুরি চালিয়ে কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাজার হাজার ঘনফুট পাথর। ক্ষতবিক্ষত পাহাড়ের ব্যাদিত মুখবিবরে পড়ে দেড়শ'র বেশী প্রস্তরমূর্তি, দানব মূর্তি। কোনো মূর্তি সবে শুরু হয়েছে, কোনোটার কাজ কিছু এগিয়েছে, কোনোটা প্রায় শেষ হতে চলেছে। পাহাড়ের সানুদেশে দাঁড়িয়ে সারি সারি সমাপ্ত মূর্তি। কাছে গেলে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে হবে। যেন সারবন্দী রক্ষীরা পাহারা দিচ্ছে দ্বীপের রহস্য নীরবে, নিঃশব্দে।

এ অঞ্চলে যেতে হলে পুরাকালের কারিগরদের তৈরী প্রাচীন পথ বেয়েই যেতে হবে জীপে অথবা ঘোড়ায়।

ঘোড়া থেকে রানো-রারাকু পাহাড়ের চাঁইটার সামনে নামলেন, ভাল করে দেখুন তো ওটা কী? একটা দানবিক প্রস্তর মুণ্ড। এত বিরাট যে থরসাহেবের পুরো দলটা, মানে তেইশজন অভিযাত্রী, মুণ্ডের তলায় আশ্রয় নিতে পারে বৃষ্টিবাদলার সময়ে। সবচেয়ে সামনের ঐ যে মূর্তিটা দেখছেন, যে-মূর্তি বুক পর্যন্ত মাটিতে ঢুকে গেছে—লাফঝাঁপ করেও ওর চিবুক পর্যন্তও নাগাল পাবেন না। চিৎপটাং হয়ে যারা শুয়ে আছে, তাদের পেটে উঠলে নিজেকে মনে হবে লিলিপুট। শয়ান গোলিয়াথের বুক আর পেটের ওপর স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়ান—একটুও অসুবিধা হবে না। নাকের ওপর শুয়ে পড়ুন—মনে হবে যেন লম্বা চওড়া খাটে শুয়ে আছেন। প্রায় সব মূর্তিই তিরিশ ফুটের মতন লম্বা—সবচেয়ে বড় যে মূর্তিটা আগ্নেয়গিরির গায়ে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় গড়াগড়ি যাচ্ছে—তার দৈর্ঘ্য ঊনসত্তর ফুট। প্রতি তলা দশ ফুট হিসেবে সাততলা বাড়ীর সমান পাথর মানুষটা।

ঈস্টার আইল্যাণ্ডের রহস্য খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করবেন এই রানো রারাকু-র মধ্যে। রহস্যমদির এখানকার বাতাসও। চারদিক থেকে শ'-দেড়েক জোড়া চক্ষু স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছেন তো তাকিয়ে আছে আপনার দিকে। এদের কেউ সমাপ্ত, কেউ অর্ধসমাপ্ত, কেউ আস্ত, কেউ ভাঙা। কেউ খাড়া, কেউ শুয়ে। পাহাড়ে প্রতিটা খাঁজ থেকে, প্রতিটি স্তর থেকে, সব রকমের উচ্চতায়, প্রতিটা গুহা থেকে দানবিক মুণ্ড আর মূর্তি নিমেষহীন নয়নে চেয়ে আছে দেখুন আকাশের পানে। চোখে তাদের অলৌকিক দৃষ্টি—অপার্থিব চাহনি। মুখ তাদের কিন্তু ভাবলেশহীন। সুখদুঃখের অতীত স্তব্ধতা তাদের সহসা গ্রাস করেছে—কিন্তু তারা যেন বিচলিত হয় নি। কেউ রোগশয্যায় কেউ সুখশয্যায় থেকে তাই আজও নির্বাক নিষ্কম্প। মাথার ওপর চলমান মেঘপুঞ্জ ছাড়া কিছুই গতিমান নয় এখানে—এই প্রস্তর মানবদের এলাকায়। ঠোঁট টিপে। এমনভাবে চেপে আছে যেন হাজার বাটালি মেরেও ঠোঁট ফাঁক করানো যাবে না। কথা বলানো ও যাবে না।

থাক তাদের মুখবন্ধ। দিব্যি গেলে মুখে চাবি যখন ঝুলিয়েছে, নাইবা খোঁচাতে গেলেন। টহল দিয়ে আসুন বরং রানো রারাকুর রহস্যময় এই জ্বালা-মুখের ঢাল বেয়ে। অনেক জিনিস জানবেন। চোখ খুলে যাবে আপনার। যেখানেই দাঁড়াবেন, যেখানেই থামবেন, দেখবেন সামনে থেকে, পেছন থেকে, ওপর থেকে, নিচ থেকে থমথমে মুখে প্রস্তরমূর্তিরা নজরে রেখেছে

আপনাকে। এ যেন মুকুরমহল—যেদিকে তাকান—কেবল মূর্তি আর মূর্তি। বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখে তাজ্জব বনে যাবেন—যেন একই ছাঁচে ঢালা অগুন্তি মূর্তি—একইরকম দেখতে, একই চাহনি, একই মুখভাব, একই রকমের অদ্ভুত লম্বা কান। উঁচুন নাকের ওপর, চিবুকের ওপর, বুকের ওপর—তফাৎ কিছু দেখতে পাচ্ছেন? বিস্ময়কর এই শিল্প নিদর্শন পাহাড়ের পায়ের দিক থেকে শুরু করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মাথা পর্যন্ত। গোটা পাহাড় ছেয়ে আছে মুণ্ড আর ধড়ে। পাঁচশ ফুট ওপরে এসেও দেখছেন সেই একই দৃশ্য। অর্ধসমাপ্ত মূর্তিরা পলকহীন চোখে চেয়ে আছে আকাশ পানে—যেখানে উড়ছে কেবল পাখীর রাজা ঈগলপক্ষীরা। পাথরের মূর্তিরা দলে দলে কেবল এখানেই নেই—চূড়া টপকে জ্বালা মুখের ভেতরেও নেমে গেছে। অর্ধ সমাপ্ত এবং সম্পূর্ণ। ভাঙা এবং গোটা, শোয়ানো এবং দাঁড়ানো মূর্তির দল এখানেও লাইন দিয়ে নেমে গেছে জ্বালামুখের তল-দেশ পর্যন্ত—যেখানে চকচক করছে নলখাগড়া বোঝাই উজ্জ্বল সবুজ সরোবর। যেন দানব-রোবট বাহিনী তৃষ্ণায় আকুল হয়ে অন্ধের মত ধেয়ে গেছে জীবনবারির সন্ধানে।

সঙ্গে যদি আপনার বাচ্চা মেয়ে থাকে, তুলে দিন তাকে দানবিক মুণ্ডের ঠোঁটের ওপর। ঠোঁট থেকে নাকের ওপর উঠতে বলুন। পারবে না—এত উঁচু!

খুঁড়ে দেখতে চান? বেশ তো, লেগে পড়ুন থরসাহেবের মত দলবল নিয়ে। আরো অবাক হয়ে যাবেন। ভলক্যানোর গায়ে জমির ওপর জেগে থাকা পৃথিবী বিখ্যাত ঈস্টার আয়ল্যাণ্ড মুণ্ড এমনিতেই প্রকাণ্ড, খুঁড়তে খুঁড়তে গলা আর বুক পর্যন্ত পৌঁছে দেখবেন বিরাটত্ব সম্বন্ধে আপনার ধারণায় ভুল ছিল। তারও নিচে পাবেন নাদা পেট, দীর্ঘ হাত আর লম্বা লম্বা সরু আঙুলের ডগায় ডগায় অবিশ্বাস্য চোখা বাঁকানো নখ।

এ-বিস্ময় মিসেস রাউটলেজেরও হয়েছিল। থরসাহেব একটা দাঁড়ানো মূর্তির ওপরে দড়ি ছুঁড়ে দিয়ে একজনকে বলেছিলেন দড়ি বেয়ে মাথায় উঠতে। দড়ি টাইট হয়ে লেগেছিল কপালে—ধরবার জায়গা ছিল না। তিনতলা অথবা চারতলা সমান এ-হেন মূর্তিই সারি সারি দাঁড়িয়ে দেখ-বেন আপনার চারপাশে—দূরে এবং কাছে—প্রতিটি কোণ থেকে নজর রেখেছে আপনার ওপর।

দড়ি বেয়ে দাঁড়ানো মূর্তির মাথায় ওঠা তাহলে বিলক্ষণ মুস্কিল—অন্য

সরঞ্জাম নইলে ওঠা যায় না। এবার তাহলে বলুন, মূর্তিদের মাথায় দু-শ ঘন ফুট পাথরের ঐ টুপি'গুলো ওঠানো হল কি করে? দু-শ ঘনফুট পাথরের ওজন কিন্তু দুটো প্রমাণ সাইজের হাতির সমান। কে তুলল দু-টো হাতির ওজনকে তিনতলা থেকে চারতলা সমান মূর্তির মাথায়? কি ভাবে তুলল? ধারে কাছে উঁচু জায়গা নেই—দ্বীপে গাছ নেই বললেই চলে—ধাতু তখন কি জিনিস এ দ্বীপের কেউ জানত না—কপিকলও ছিল না। কপাল এমন ভেলভেলে যে পা রাখা যায় না। দুটো হাতির ওজনকে তাহলে টেনে তোলা হল কিভাবে? মাথার ওপর খুব জোর দুজন লোক দাঁড়াতে পারে। দুজনের পক্ষে কি সম্ভব? পায়ের কাছে অবশ্য লিলিপুটের মত অনেকেই ভিড় করে থাকতে পারে কিন্তু বহুজনের হাতের শক্তি দিয়েও ঐ ওজন কি ঠেলে তোলা যায় দড়ি বা চূড়োর ওপর দিয়ে?

আপনার সঙ্গে ইঞ্জিনীয়ার থাকলে বিমূঢ় হয়ে যাবেন তিনি যেমন গেছিলেন থরসাহেবের ইঞ্জিনীয়ার। মনে হবে, অদৃশ্য চন্দ্রমানবরা তখন পাতাল বিবর থেকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে আপনাকে—'আঁচ করো হে, আঁচ করো। অনেক বিদ্যে তো তোমাদের রয়েছে। বলো দিকি কি করে এত বড় ইঞ্জিনীয়ারিং মহাকর্মটি করলাম আমরা? কি করে আগ্নেয়গিরির ঢাল বয়ে নিয়ে গেলাম এত বিরাট বিরাট মূর্তি—দ্বীপের দূরতম প্রান্তেও নিয়ে গেলাম খেয়ালখুশী মত?

হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে আঁচ করা তো যায় না। থরসাহেবের সাঙ্গ পাঙ্গরা তাই ঠিক করলেন, খুঁজে দেখা যাক প্রাচীন কলাবিদ্যা আর পূর্ত-বিদ্যার কোনো চিহ্ন আশেপাশে পড়ে আছে কিনা।

প্রথমে খনির অসমাপ্ত মূর্তিগুলোকে পরীক্ষা করলেন উঁনি। খনির মধ্যেই পড়ে আছে এই সব মূর্তি। আদিম খনকদের পালিশকরা পাথরের গাঁইতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সর্বত্র—হঠাৎ সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে বিশ্বকর্মার বরপুত্রেরা। বিভিন্ন পর্যায়ে আধা খাঁচড়া অবস্থায় মূর্তি পড়ে গেছে জমির ওপর। এই থেকেই আঁচ করা গেল মূর্তি গড়ার কায়দাটা। প্রথমেই পাথর কেটে মুখ বানানো হয়েছে। তারপর মূর্তির সামনের দিক। এখানে পাশের দিক, দুটো হাত, অবিশ্বাস্য লম্বা বাঁকানো নখসহ সরু সরু আঙুল। সবশেষে পেছন দিকটা। নৌকার মত ঠেলে ওঠা পিঠটা কেবল একটু চিলতে সরু পাথরের দৌলতে আটকে আছে পাহাড়ের গায়ে।

নিখুঁতভাবে পালিশ করা হয়েছে প্রতিটি মূর্তি খোদাই সম্পূর্ণ হওয়ার পর—

সেখানেও খুঁত রাখা হয় নি কোথাও। শুধু একটা প্রত্যঙ্গ ফুটিয়ে তোলা হয় নি মূর্তি গড়ার এই কারখানায়—চক্ষু। বিশ্বকর্মার বরপুত্ররা মূর্তি সৃষ্টি করেছে—কিন্তু অন্ধ রেখেছে—দৃষ্টি দেয় নি। আরও একটা ব্যাপার প্রতি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে। পৃষ্ঠদেশ অসম্পূর্ণ থেকেছে প্রথম পর্যায়। এক চিলতে পাথর সংলগ্ন অবস্থায় মূর্তি রয়ে গেছে পাহাড়ের গায়ে। কখনো শুয়ে, কখনো উপুড় হয়ে, কখনো চিৎ হয়ে, কখনো হেলে। মূর্তির অবস্থান নিয়ে উদাসীন থেকেছে ভাস্কররা। মেজে ঘষে চকচকে করাব পর পিঠের এক চিলতে পাথর কেটে টুকরো টাকরা পাথরের গোঁজ ঠেসে আটকে রেখেছে মূর্তিকে—যাতে ঢাল বেয়ে পিছলে নেমে না যায়।

পেছনের পাথর কেটে ফেলার পর শুরু হয়েছে মূর্তি নামানোর পালা। জ্বালামুখের তলদেশে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বহু টন ওজনের প্রস্তুত মূর্তিদের। কখনো খাড়াই পাহাডের গা বেয়ে লম্বালম্বিভাবে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে নিচের চাতালে—মূর্তিগড়ার কাজ চলছে যেখানে। বেশ কয়েক-ক্ষেত্রে মূর্তি নামাতে গিয়ে ভেঙে গেছে। কিন্তু এরকম অঘটন ঘটেছে খুব কম। তুলনায় অভাবনীয় সংখ্যক মূর্তি আস্ত থেকেছে। মূর্তি গডা হয়েছে পা বাদে। কোনো মূর্তিরই পা নেই। ধড় শেষ হয়েছে পেট পর্যন্ত। পদহীন লম্বাটে আবক্ষ মূর্তিগুলো পরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে উঁচু বেদীর ওপর।

পাহাড়ের তলায় রাশিকৃত টুকরো টাকরা প্রস্তর খণ্ড রাবিশের মত স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে এক-এক জায়গায়। কোথাও গর্তের মধ্যে জমিয়ে রাখা হয়েছে। বিরাট মূর্তিগুলো এনে এই রাবিশ ভর্তি গর্তের মধ্যে দাঁড় করানো হয়েছে। তারপর যন্ত্র নিয়ে ভাস্কররা বসেছে পৃষ্ঠদেশ সম্পূর্ণ করতে। কোমরে খোদাই করেছে কেবল একটা বেল্ট—কোনো বস্ত্র নেই। সব মূর্তিই নগ্ন এবং সব মূর্তিই পুরুষ—কেবল একটি ছাড়া। সারা ঈস্টার আয়ল্যাণ্ড ছ-শ মূর্তিও মধ্যে নারীমূর্তি কেবল একটি! এ আবার কি রহস্য?

রহস্যের শেষ এই খানেই নয়। পৃষ্ঠদেশ এবং কোমর বন্ধনী ফুটিয়ে তোলার পর ত্বই থেকে দশ টন ওজনের মূর্তিগুলোকে পাহাড টপকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পাহাড় খাদের বাইরে—সেখান থেকে আয়ল্যাণ্ডের সর্বত্র—এমন কি দশ মাইল তফাতেও। কিভাবে গিয়েছে পাথর-দানবরা পাহাড় টপকে বহুদূরের এই পথ?

ফাদার সিবাসটিয়ান আউটডোর মিউজিয়াম ডিরেক্টরের কাজ করে যাচ্ছিলেন। মূর্তি খুঁজে খুঁজে নাম্বার লিখে দিচ্ছিলেন রঙ দিয়ে। মোট ছ-শ

মূর্তি পেলেন তিনি। প্রতিটা মূর্তিই ধূসর হলদে পাথর দিয়ে তৈরী—তাতে কালচে দানা। এ পাথর পাওয়া যায় কেবল রানো রারাকু আগ্নেয়গিরির পাথর-খাদেই—আর কোথাও নয়। শুধু পাথরের রঙ দেখেই বলা যায় মূর্তি নির্মিত হয়েছে কোথায়—তা সে যত মাইল দূরেই থাকুক না কেন, চাঁই-চাঁই পাথরের মধ্যে গড়াগড়ি দিক না কেন।

সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপারটা কি জানেন? আকারহীন পাথরের ঢেলা রূপে দানবিক এই প্রস্তর মূর্তিদের বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নি—সে ভাবে নিয়ে গেলে মূর্তি চোট খাওয়ার সম্ভাবনা থাকত না। কিন্তু প্রতিটা মূর্তি নিখুঁতভাবে খোদাই করে পালিশ করার পর—মাথা লম্বা কান থেকে বাঁকা নখের ডগা পর্যন্ত ফুটিয়ে তোলার পর—নিয়ে যাওয়া হয়েছে দূরের অঞ্চলে—কিন্তু ভেঙে যায় নি—টুকরো টুকরো হয় নি। অদ্ভুত নয় কি? এ-পন্থাই বা নেওয়া হল কেন, তাও কেউ জানে না।

ছাদহীন মন্দিরে মন্দিরে মূর্তিগুলো নিয়ে যাওয়ার পর গর্তের মধ্যে ফেলে দাঁড় করিয়ে দিলেই ল্যাটা চুকে যেত। কিন্তু সেখানেও রহস্য। দু-গজ পর্যন্ত উঁচু পাথরের বেদীর ওপর তোলা হয়েছে প্রতিটি মূর্তিকে। ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের ভাষায় এই ধরনের মন্দির মঞ্চকে বলে 'আহু'। আহু-র ওপর প্রস্তর মূর্তি খাড়া হওয়ার পর তখন চোখ ফোটানো হয়েছে তাদের—অন্ধকে করা হয়েছে চক্ষুষ্মান। কেন? কেউ জানে না।

আরও আছে। চোখ ফোটানোর পর মাথায় টুপি পরানো হয়েছে। এক একটা টুপির ওজন দুই থেকে দশ টন পর্যন্ত। যদিও এগুলো টুপি নয়। দানবিক মুকুটের মত পাথরের এই বস্তুগুলোকে আয়ল্যাণ্ডের আদিবাসীদের ভাষায় বলা হয় 'পুকাও'—মানে ঝুঁটি। এ আয়ল্যাণ্ড যখন প্রথম আবিষ্কার করেন ইউরোপীয়রা, আদিবাসীদের মাথায় দেখেছিলেন ঝুঁটি। কিন্তু সুপ্রাচীন ভাস্কররা আস্ত পাথর কেটে মূর্তি রচনার সময়ে ঝুঁটি-টাও তো বানিয়ে নিতে পারত—এতদূর এনে আলাদা করে অত ভারী ঝুঁটি মাথায় বসানোর দরকার হল কেন? ঝুঁটির রঙও তো আলাদা—লাল রঙের পাথর। যে-পাথর পাওয়া যায় রানো রারাকু থেকে সাত মাইল দূরে আর একটা মরা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের জঠরে। বিশেষ এই লাল পাথর দিয়ে কেন আলাদা করে তৈরী হল দানবদের চুল? এক জায়গা থেকে হলদে-ধূসর পাথরের মূর্তি, তার সাত মাইল দূর থেকে লাল পাথরের মুকুট টেনে না আনলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? পঞ্চাশটারও বেশী মন্দির মঞ্চে দেখা গেছে এই একই দৃশ্য। কোথাও তারা যুগলে দাঁড়িয়ে—কোথায় দাঁড়িয়ে

লাইন দিয়ে পনেরো জন। বেদীগুলো জমি থেকে বারো ফুট উঁচু।

ইস্টার আয়ল্যাণ্ড মন্দির মঞ্চে এখন অবশ্য লাল চুলো দানব মূর্তিরা কেউ আর দাঁড়িয়ে নেই। ক্যাপ্টেন কুক এবং সম্ভবতঃ রোগীভিনও এসে এদের অনেককেই নিজেদের নির্দিষ্ট জায়গায় দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখেন নি। প্রথম অভিযাত্রীরা অবশ্য লিখে গেছেন, মাথায় লাল 'পুকাও' নিয়ে বেশ কিছু মূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল মন্দির মঞ্চে। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সর্বশেষ দানবটি আছড়ে পড়ে মন্দির থেকে, রক্তমাখা স্টীমরোলারের মত মাথার লাল ঝুঁটি গড়িয়ে যায় মন্দির চত্বর দিয়ে। আজ দেখা যায় কেবল আগ্নেয়গিরির পাদদেশে গভীর গর্তের মধ্যে রাবিশের ভেতরে ঢোকানো অন্ধ দানবরাই উদ্ধত ভঙ্গিমায় শির উন্নত করে আছে দাঁড়িয়ে—এদের টেনে নামানোর সাধ্য হয় নি বৈরী নেটিভদের। কুঠার মেরে গর্দান নিতেও পারে নি। প্রাচীন জল্লা-দদের কুঠারের চিহ্ন ঘাড়ে দেখা যায় আজও—একহাত পরিমাণ পাথর কোনমতে কাটতে পেরেছে, তারপর হাল ছেড়ে দিয়েছে। আপনি নিজেও গাঁইতি মেরে দেখতে পারেন—স্ফুলিঙ্গ ছিটকে যাবে—হাতে ফোস্কা পড়ে যাবে, কঠিন দৈত্যদের গায়ে আঁচড় ফেলতে পারবেন না।

১৮৪০ সালে শেষ স্ট্যাচুটাকে মন্দির মঞ্চ থেকে নামিয়ে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কাছেই একটা মন্দিরে নরখাদকদের ভোজ উপলক্ষে। মূর্তিটা বসানো ছিল প্রায় মানুষ সমান উঁচু একটা বেদীর ওপর। মূর্তির নিজস্ব দৈর্ঘ্য ছিল বত্রিশ ফুট এবং মাথার ঝুঁটিটায় পাথর ছিল ২০০ ঘনফুট। রানো রারাকু-র পাথর খাদ থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পঞ্চাশ টন ওজনের এই দানবমূর্তিকে। ধরুন, একটা দশ টন ওজনের রেল কামরা উল্টে দেওয়া হল—কেন না চাকা কি জিনিস তা পলিনেশিয়ার লোকজন জানত না। তারপর ধরুন, আর একটা রেলকামরাকে প্রথমটার পাশে রেখে বেঁধে ফেলা হল দড়ি দিয়ে। তার পর ধরুন, বারোটা পূর্ণবয়স্ক ঘোড়া আর পাঁচটা বড় সাইজের হাতি রাখা হল রেল কামরায়। সব মিলিয়ে হল পঞ্চাশ টন। এবার সবশুদ্ধ টেনে নিয়ে যেতে হবে। একটু আধটু পথ নয়—আড়াই মাইল বন্ধুর পথ। চোট লাগালে কিন্তু চলবে না। কলকব্জা ছাড়া এ-কাজ কি সম্ভব? এ-যুগে সম্ভব নয়। কিন্তু সে যুগে এই অসম্ভব-কেই সম্ভব করে ছিলেন ইস্টার আয়ল্যাণ্ডবাসীরা। একটা জিনিস কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে: এ কাজ যারা করেছে, তারা ক্যানো নৌকোয় পারঙ্গম কাঠখোদাইয়ে দক্ষ পলিনেশিয়ান নয়। কেন না, আয়ল্যাণ্ডের উলঙ্গ পাথর নিয়ে মূর্তি গড়েছে তারা—গাছপালা পায় নি বলেই তো। তাহলে কি

আশ্চর্য এই ভাস্কররা এসেছিল সমুদ্রপথে এমন এক দেশ থেকে যে দেশে বহুপুরুষ ধরে নিরেট পাথর কেটে প্রকাণ্ড মূর্তি গড়ে তারা অভ্যস্ত? নিশ্চয় তাই।

যাই হোক পঞ্চাশ টন ওজনের বোঝাটাকে ধরুন যে কোনো ভাবেই হোক আপনি নিয়ে এলেন মন্দির মধ্যে আড়াই মাইল উচ্চাবচ প্রস্তর পথের ওপর দিয়ে। চারতলা উঁচু দানব মূর্তিকে এবার তুলতে হবে প্রাচীরের ওপর—মাথায় বসাতে হবে লাল পাথরের ঝুঁটি— যে ঝুঁটিটারই ওজন ধরুন দশ টন এবং সাত মাইল দূরের ঝুঁটি কারখানা থেকে নিয়ে এসেছেন মন্দির মধ্যে। সাত মাইল কিন্তু আকাশ পথের হিসেব—সোজা পথে। বন্ধুর পথে তা আরো বেশী। ঝুঁটিটারও ওজন কুড়িটা পূর্ণবয়স্ক ঘোড়ার সমান। মানুষ সমান উঁচু বেদীর ওপর ৩২ ফুট উঁচু পাথরের মূর্তির মাথায় তুলে দিতে হবে বিরাট এই ঝুঁটি। কপিকল ছাড়া এ-কাজ আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রাচীন মানুষগুলো রহস্যজনক পন্থায় সাঙ্গ করেছিল এই অবিশ্বাস্য কর্মকাণ্ড। ১৮৪০ সালে নরখাদকরা এই মূর্তিকেই আছড়ে ফেলেছিল জমিতে বেদীর পাথর আলগা করে দিয়ে, তারপর ৩০ জন প্রতিবেশীকে চিবিয়ে খেয়েছিল গুহার মধ্যে।

রানো রারাকুর জ্বালামুখের চূড়ায় দাঁড়িয়ে এই অসম্ভবের কথাই ভেবেছিলেন থরসাহেব। ঘাস ছাওয়া পুরো ইস্টার আয়ল্যাণ্ড দেখা যায় সেখান থেকে। পেছনে জ্বালামুখ ঢালু হয়ে নেমে গেছে আগ্নেয়গিরির ভেতরে—আকাশ-নীল জ্বালামুখ-হ্রদে আয়নার মত প্রতিফলিত হচ্ছে চলমান মেঘের দল। নলখাগড়ার বন আশ্চর্য সবুজ—এমন উজ্জ্বল সবুজ নলখাগড়া কখনো দেখেন নি তিনি। হয়তো শুষ্ক ঋতুতে আয়ল্যাণ্ড ঘাস হলদেটে হয়ে আসছে বলেই তুলনামূলক ভাবে বেশী সবুজ মনে হচ্ছে নলখাগড়ার বনকে। ওঁর সামনেই খাড়াইভাবে ভলক্যানো নেমে গেছে একদম পাদদেশে সমতল পাথর খাদের দিকে। পিঁপড়ের মত দেখা যাচ্ছে অভিযাত্রীদের—খনন কাজ নিয়ে ব্যস্ত তারা। দেখা যাচ্ছে হাস্যকর রকমের ছোট্ট ঘোড়াদের—ঘাস খাচ্ছে দানব মূর্তিদের আশে পাশে। ইস্টার আয়ল্যাণ্ডের হাজার রহস্যের সবচেয়ে জটিল রহস্যের জন্ম হয়েছে ঐ পাথর-খাদেই সুদূর অতীতে—স্ট্যাচু-দের প্রসূতি সদন হ'ল ঐ পাথর-খাদ। ঐ খানেই তারা সদ্য জন্ম নিয়ে অন্ধ চোখে নিশ্চল মস্তকে দাঁড়িয়ে সারি সারি আয়ল্যাণ্ডের দূরতম প্রান্তে বাহিত হওয়ার প্রতীক্ষায়।

মাতৃজঠরের শীর্ষে দাঁড়িয়ে সামনে এবং পেছনে এই অন্ধ দানবদের নিশ্চল

সমাবেশ দেখে সেদিন বোবা বিস্ময়ে মূক হয়ে গিয়েছিলেন থরসাহেব।

উঁচু থেকে দেখেছিলেন মূর্তি বয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ-ও। জ্বালামুখের ভেতরে তৈরী দুটো মূর্তিকে নিয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ ফেলে চলে গেছে বাহকরা। সহসা স্তব্ধ হয়েছে সমস্ত কাজ। একটা মূর্তি জ্বালামুখের কিনারা পর্যন্ত উঠে এসেছিল—আর একটু এগোলেই আসত বাইরে। আর একটা মূর্তি ঢালে ক্ষয়ে যাওয়া খাদের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসে নামছিল নিচের দিকে। আচম্বিতে সব কাজ থেমে যাওয়ায় তারা গড়াগড়ি খাচ্ছে। যেখানে ছিল সেইখানেই—চিৎপটাং হয়ে নয় কিন্তু—উপুড় হয়ে। যতদূর চোখ যায়, প্রাণহীন ঘেসো পথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে এমনি আরো দানবমূর্তি। কখনো একা, কখনো দোকা, কখনো দলবেঁধে। কারোরই মাথায় চুল নেই, কোটরে চক্ষু নেই। প্রত্যেককেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কারখানা থেকে মঞ্চে—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্রত্যেককেই নির্মাণ করা হয়েছে পাথর-খাদের কারখানায়—যেখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সেখানে নয়। নিয়ে যাওয়ার সময়ে সুইচ টিপে যেন সমস্ত কাজকর্ম থামিয়ে দেওয়ায় মুখ থুবড়ে বেচারীরা পড়ে আছে ঘেসো মাঠে। কিছু মূর্তি বহুদূরের পাহাড় পেরিয়ে গেছে। সাত মাইল দূরের পশ্চিম দিগন্তের ছোট আগ্নেয়গিরি—'পুনা পাউ'-এর দিকেও গিয়েছে কিছু প্রস্তর দানব। ঝুঁটি কারখানা ঐ দিকেই। থর সাহেব নেমেছিলেন ছোট কিন্তু সুন্দর সেই লাল পাথরের কারখানায়—আগ্নেয়গিরির পেটে। দেখেছিলেন বিস্তর লাল ঝুঁটি গড়াগড়ি যাচ্ছে চারিদিকে। কিছু সম্পূর্ণ—কিছু অসম্পূর্ণ। তৈরী ঝুঁটিগুলোকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কারখানার বাইরে। মাঝ পথেই তাদের ফেলে যাওয়া হয়েছে—কখনো পাহাড়ের গায়ে, কখনো কারখানার মধ্যে, কখনো মাঠের মধ্যে। সবচেয়ে বড় ঝুঁটিটাকে মেপে দেখেছিলেন উনি। ৬৫০ ঘন ফুট পাথর আছে তাতে। ওজন প্রায় তিরিশ টন, অথবা ষাটটা পূর্ণবয়স্ক ঘোড়ার সমান।

ওঁর পাশেই দাঁড়িয়েছিল মেষপালক লিওনার্দো। লোকটা অন্যান্য ঈস্টার দ্বীপবাসীদের চেয়ে মোটামুটি বুদ্ধিমান এবং লেখাপড়াও কিছু জানে। সভ্যতার ছোঁয়া পেয়েছে। একেবারে হাঁদাবোকা নয়।

থরসাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন—'লিওনার্দো, তুমি তো বাপু বিলক্ষণ প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। বলতে পারো, মূর্তিগুলো সারা দ্বীপে পৌঁছোলো কিভাবে।'

'নিজেরাই গেছে,' অম্লানবদনে বলেছিল লিওনার্দো।

হকচকিয়ে গেলেন থরসাহেব। বলে কি লোকটা! কিন্তু পরিহাসের চিহ্নমাত্র নেই তার মুখে। অন্তরের বিশ্বাসকে মুখে প্রকাশ করেছে। বলেছেও বেশ শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে।

থরসাহেব তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন—'পা তো নেই, গেল কি করে?'

'এইভাবে', বলে পা মুড়ে, হাঁটু শক্ত করে মাটি ঘসটে ঘসটে পদযুগল নিয়ে গেছিল লিওনার্দো। পরক্ষণেই জিজ্ঞেস করেছিল পাল্টা প্রশ্ন—'আপনিই বলুন না কিভাবে?'

চুপ মেরে গেছিলেন থরসাহেব। বলার কিছু নেই। এই একই ধাঁধায় পড়েছেন এর আগেও অনেক ইউরোপীয়—লিওনার্দোদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি। তাই ওরা বাপঠাকুর্দার ব্যাখ্যাই মেনে নিয়েছে। প্রস্তর মূর্তিরা চলমান হয়েছে নিজেরাই—গেছে যে-যার মন্দির-মঞ্চে। অতি সহজ সমাধান। কাজেই খামোকা জটিল সমস্যায় মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করার প্রয়োজনটা কি?

তাঁবুতে ফিরে এলেন থরসাহেব। গেলেন রান্না তাঁবুতে। মারিয়ানা আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি জানো পেল্লায় 'মোয়াই' মূর্তিগুলোকে দ্বীপের নানান জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে কি করে?'

দৃঢ়প্রত্যয়ে বললে মারিয়ানা—'নিজেরাই গেছে, সিনর।' বলেই শোনাল এক বিচিত্র দ্বীপকাহিনী। এক ডাইনীবুড়ি ছিল রানো রারাকু পাহাড়ে। বুড়ির যাদুমন্ত্রের জোরে বিরাট মূর্তিগুলো হেঁটে চলে গেল মন্দির মঞ্চে। কিন্তু একদিন দ্বীপবাসীরা একটা বিরাট গলদা চিংড়ি খেয়েছিল তাকে ভাগ না দিয়ে। চিংড়ির খোসা আবিষ্কার করে রেগে টং হল বুড়ি। এমন পাল্টা মন্ত্র ঝাড়ল যে হাঁটতে হাঁটতেই দানবমূর্তিগুলো নাক মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে, পাহাড়ে। আর নড়ে নি—পড়েই আছে।

চল্লিশ বছর আগে মিসেস রাউটলেজকেও শুনতে হয়েছিল এই কাহিনী—শুনতে হবে থরকেও শেষদিন পর্যন্ত—যদি না ইতিমধ্যে মূর্তি-রহস্যের সম্ভাব্য কোনো ব্যাখ্যা উপস্থিত হচ্ছে।

দ্বীপবাসীদের প্রায় প্রত্যেকেই কাঠখোদাই মূর্তি গড়তে পারে। কিন্তু সবচেয়ে ভালো পারে লেয়ন। তাই ওর মূর্তির চাহিদাও বেশী।

আমেরিকান সিগারেট, নরওয়ের বঁড়শি আর চকচকে উজ্জ্বল রঙের ইংলিশ বস্ত্রের বিনিময়ে মূর্তি সংগ্রহের ব্যবসা বেশ ফলাও হয়ে উঠল। বিনিময়ে পাওয়া সিগারেট দ্বীপবাসীরা নিজেরাই ভোগ করে না—সবাইকে দেয়। প্রথম দিন জাহাজ থেকে আনা প্যাকেটে সিগারেট বাড়ী বাড়ী গিয়ে বিলি

করেছিল এরা দরাজ হাতে। অথচ এরাই আবার পাকা চোর হয়ে ওঠে পর দ্রব্য অপহরণের সময়। রহস্য বটে।

কাঠের সুন্দর মূর্তির ফাঁকে ফাঁকে কাঁচা হাতে খোদাই পাথরের মূর্তিও আসত এক-আধটা, নাক চোখ কোনমতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—বিরাট মূর্তিদের ব্যর্থ অনুকরণ প্রয়াস দেখে হেসে খুন হন শিল্পীরা। 'আসল মাল' বলে চালাতে এসেও মুখ চুন করে ফিরে যেত দ্বীপবাসীরা।

একদিন [illegible] মধ্যে থেকে একটা বার করে দেখাল একটি মেয়ে। থরসাহেবকে জড়িয়ে মূর্তি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল সে। মূর্তি দেখেই কিন্তু থর বুঝলেন সেটা চুরি করবার। মাটিতে কে বা কারা লুকিয়ে রেখেছে কেউ ওঁদের চুরি যাবার জন্যে।

আর একবার গভীর অন্ধকার রাতে। চুপি চুপি থরসাহেবকে নিয়ে যাওয়া হল বালি ঢাকা এক মূর্তির সন্ধানে। অন্ধকারেও বালির চাপড়া সরানো মূর্তি দেখে থর বুঝলেন এখানেও জোচ্চুরি। মূর্তিটা আনকোরা নতুন।

আর একদল চোর ধরা পড়ল অদ্ভুতভাবে। মাটির মূর্তি চালাচ্ছিল পাথরের মূর্তি বলে। কিন্তু হঠাৎ জলের মধ্যে একটা মূর্তি গলে যাওয়ায় চোঁ-চাঁ দৌড় দিল সে।

এর মধ্যেও কিছু সন্ধান পাওয়া গেল খাঁটি জিনিসের। একদিন এক নব দম্পতী এসে থরসাহেবকে নিয়ে গেল ভেড়ার খোঁয়াড়ের কাছে মাটিতে আধপোঁতা চারটে কিম্ভূতকিমাকার পাথর দেখাতে। সেখানে পৌঁছে যে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড শুরু হয়ে গেল এক বুড়ি আর তার মেয়ের সঙ্গে। এ জমি নাকি তাদের ছিল এককালে। হোতু-মাতুয়া তাদেরই পূর্বপুরুষ। পাথর চারটেও তাদের। এই যে স্বামী-স্ত্রী এসেছে, ওরা আসলে পয়লা নম্বর চোর।

চেঁচামেচি দেখে দুই বেচারা। কাছে এসে বসে পড়লেন থরসাহেব। বুড়ির চিৎকার একটু থামলে জিজ্ঞেস করলেন ঠাণ্ডা গলায়—'পাথরগুলো দেখাবে? দেখে চলে যাবো—নেব না।'

বুড়ি ঝাঁঝিয়ে উঠল—'বসেই তো আছো পাথরের ওপর।'

অবাক হয়ে লাফিয়ে উঠলেন থরসাহেব। তিনি তাঁর দুই সঙ্গীকে নিয়ে বসে আছেন তিনটে গোলাকৃতি পাথরের ওপর—চতুর্থটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ি।

একটা পাথর ঠেলে গড়িয়ে দিয়ে সোজা করলেন থরসাহেব। দেখলেন, গোলাকার বিকট চক্ষু শয়তান সদৃশ এক অপদেবতার মুখ।

পাথর গড়িয়ে এনে ফের উপুড় করে রেখে চলে এলেন তিনি সঙ্গীদের

নিয়ে। হাঁ হয়ে গেল বুড়ি, তার মেয়ে আর নব দম্পতী।

এরই মধ্যে একটা জবর রহস্য নিয়ে ধাঁধায় পড়লেন ধরসাহেব।

একজন দ্বীপবাসী একটা মাটির জারের ভাঙা টুকরো নিয়ে এল তাঁর কাছে। রহস্যময় কণ্ঠে বললে—কোথায় এ জিনিস আছে, তা সে জানে।

কৌতূহলী হলেন ধরসাহেব। কেন না, জারের ভাঙা টুকরোটা আমেরিকান মাটির জারের মত নয়—ইউরোপীয় সাহেবদের চাকাতেও তৈরী নয়। ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের কোথাও আজ পর্যন্ত মাটির জার পাওয়া যায় নি—তবে জিনিসটা এল কোথকে? ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডে তেমন মাটিও নেই যে জার চাপা পড়ে থাকবে।

লোকটা নিয়ে গেল তাঁকে একটা মন্দিরের মধ্যে—সারি সারি কতকগুলো মূর্তি উপুড় হয়ে পড়ে আছে মঞ্চের সামনে। মঞ্চের ওপরে আঙুল দেখিয়ে লোকটা বললে—'এখানে পেয়েছি।'

জায়গাটা রহস্যময় এই কারণে যে পাশের পাঁচিলটার সঙ্গে অ্যাণ্ডিজের বিখ্যাত ইঙ্কা পাঁচিলের বেশ মিল আছে।

বেদীর পাথর আলগা করে ফেললেন ধরসাহেব। ভেতরে পেলেন পাশাপাশি শোয়ানো দুটো নরকংকাল। বিচিত্র কবরখানার তলায় পেলেন একটা সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে দুটো পাতাল কক্ষে। রাশি রাশি মানুষের খুলি ছড়িয়ে আছে সেখানে—আর কিছু নেই।

পরের দিন পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের নিয়ে গিয়ে মাটি খুঁড়ে দেখা হল। মাটির জারের কয়েকটা টুকরো পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তা এত ছোট যে জোড়াতালাও লাগানো যায় না।

হতাশ হলেন ধরসাহেব। এমন সময়ে গাঁ থেকে ছুটে এল এক বুড়ি, হাতে একটা ছোট্ট জারের ভাঙা টুকরো। এক বুড়োর কাছ থেকে জোগাড় করে এনেছে বুড়ি।

ছোট্ট এই টুকরোটার সঙ্গে আগে পাওয়া বড় টুকরোটা মিলে গেল। কোণ থেকে ভেঙে নেওয়া হয়েছে।

বড় টুকরোটা প্রথমে যে এনেছিল, তার নাম অ্যানড্রেজ। সে তো রেগে কাঁই। ধরসাহেব তাকে অবিশ্বাস করেছেন—এতবড় কথা। গট গট করে ফাদার সিবাসটিয়ানের সামনে এনে রাখল তিনটে সম্পূর্ণ মাটির জার।

বললে তারস্বরে—'আমার বাবা একটা গুহা থেকে কয়েক বছর আগে পেয়েছিল এই জার। জল রাখবে বলে বাড়ীতে এনে রেখেছিল। সিনর কোনটাইকি আমাকে মিথ্যেবাদী বলেছেন—তাঁকে কিছু দেখাবো না।' বলে

জার তিনটে নিয়ে গিয়ে আয়লাণ্ডের কোথায় যে লুকিয়ে ফেলল আর পাত্তা পাওয়া গেল না—আনড্রিজের বাড়ীতেও খুঁজে পাওয়া গেল না।

জারে কিন্তু জল রাখা হয় নি—আবার একটা ডাহা মিথ্যে বলে গেল আনড্রিজ ফাদারের সামনে। কিন্তু গেল কোথায় জারগুলো? সমস্যা, সমস্যা, কেবলই সমস্যা।

সমস্যা হাজির হল আরও একটা। এবার ঘর্মাক্ত হল মস্তিষ্ক। বুড়ো পুলিশ কাসিমিরো লোভ দেখিয়েছিল খরসাহেবকে নিয়ে যাবে পাখী মানুষের আয়ল্যাণ্ডে। তার বাবা নিখোঁজ হয়েছিল তাকে আরও কয়েকটা ছেলের সঙ্গে। সেইখানে আছে বোঙ্গো বোঙ্গো। ওরা যে ওখানে সন্ধান পান কেবল তার বাবা। খরসাহেব ঠিক করলেন কাসিমিরোকে নিয়ে ছুটে গিয়ে আসবেন পাখী মানুষের আয়ল্যাণ্ডে দ্বীপে গিয়ে রোঙ্গো রোঙ্গো ফলকের সন্ধান করবেন। এ কৌতূহল তখন বাড়িয়ে দিয়েছে আয়ল্যাণ্ডবাসীদেরও সাংকেতিক ছবি কথা থাকা কাঠের ফলক 'রোঙ্গো রোঙ্গো' নিয়ে বিস্তর কানাঘুষো হয় তো নিজেদের মধ্যে। ওদের বিশ্বাস আজও অনেক গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখা রয়েছে রোঙ্গো রোঙ্গো কাষ্ঠফলক। কৌতূহল বড় সংক্রামক রোগ—খরসাহেবও রেহাই পেলেন না।

দ্বীপবাসীরা বলত— 'একটা রোঙ্গো-রোঙ্গো কাষ্ঠফলকের জন্যে একলক্ষ পিসোস্ দাম পেয়েছি। গুহায় লুকোনো রোঙ্গো-রোঙ্গো বার করতে পারলে পাব দশ লক্ষ।' কথাটা যে মিথ্যে নয়, মনে মনে তা জানতেন খরসাহেব। এটাও জানতেন, রোঙ্গো-রোঙ্গো গুহা মুখের সন্ধান পেলেও ভেতরে ঢোকবার সাহস কারোর হবে না। রোঙ্গো-রোঙ্গো কাষ্ঠফলকে হাত দেওয়া মানেই মৃত্যু। বলেছে, তারাই যারা ফাদার সিবাসটিয়ান দ্বীপে এসে এসে খৃষ্টধর্ম প্রচারের সময়ে ফলকগুলো লুকিয়ে ফেলেছে গুহার আঁধারে। এ জিনিস যার কাছে আছে, সে যেন তা গোপনে রাখে এবং পবিত্র বস্তুর মত আগলে রাখে—কিন্তু স্পর্শ করতে পারবে না। দ্বীপবাসীরা পূর্ব পুরুষদের এই নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে অক্ষরে অক্ষরে প্রাণের ভয়ে—সরল বিশ্বাসে।

মাত্র কুড়িটা রোঙ্গো-রোঙ্গো কাষ্ঠফলক ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর নানান যাদুঘরে—আজও সেই সাংকেতিক লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। দক্ষ শিল্পী নিপুণভাবে কতকগুলো প্রতীক চিহ্ন দিয়ে এমন এক ভাষা লিখে গেছে কাষ্ঠফলকে যা অন্য কোনো মানবজাতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় নি। সর্পিল রেখায় সুন্দরভাবে আঁকা সারি সারি প্রতীকচিহ্ন—এ রেখার মধ্যে

অন্যান্য সব রেখা কিন্তু উল্টোনো। দ্বীপের মানুষ এই ধরনের যে সব ফলক বাড়ীতে রেখে দিয়েছিল, সেগুলোই তুলে দেয় সংগ্রাহকদের হাতে—তাদের কাছ থেকে গেছে পৃথিবীর নানান মিউজিয়ামে, তাও সংখ্যায় মোটে কুড়িটা। শেষ যে ফলকটি দ্বীপ থেকে বেরিয়ে গেছে সেটি সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা গেল ফাদার সিবাসটিয়ানের মুখে। নিষিদ্ধ এক গুহায় ছিল এই ফলক। একজন দ্বীপবাসী দেখিয়ে নিয়ে যায় একজন ইংরেজকে। গুহায় ঢুকতে দেয় নি। বাইরে দাঁড় করিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে পাথর সাজিয়ে গণ্ডী টেনে দিয়েছিল। নিজে গেছিল গুহার মধ্যে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে হাতে দিয়েছিল রোঙ্গো-রোঙ্গো কাষ্ঠখণ্ড। ইংরেজ সংগ্রাহক তৎক্ষণাৎ দাম দিয়ে ফলক নিয়ে সরে পড়েছিল দ্বীপ থেকে। দ্বীপের লোকটা কিন্তু কিছুদিন পরেই পাগল হয়ে যায়, মারা যায় তারপরেই। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার শাস্তি পায় হাতে হাতে, দৃঢ়তর হয় দ্বীপবাসীদের বিশ্বাস।

কারণ যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত থরসাহেবের প্রস্তাব শুনে পেছিয়ে গেল কাসিমিরো। তার নাকি শরীর খারাপ—পাকোমিও যাক সঙ্গে। বাবার সঙ্গে সে-ও গেছিল পাখি-মানুষের দ্বীপে—জায়গাটা সে চেনে।

দ্বীপে আঙ্গাতা নামে একজন মেয়ে গণৎকার ছিল সেকালে। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। রাউটলেজ অভিযানে এই মেয়েটাই প্রচার করেছিল বাজে গুজব আর কুসংস্কার চল্লিশ বছর আগে। পাকোমিও এই আঙ্গাতার ছেলে। ফাদার সিবাসটিয়ানকে দিয়ে তাকে রাজী করালেন। থরসাহেব পরম ভক্তিতে বিনম্র মুখে মোটর লঞ্চে উঠে বসল পাকোমিও। লক্ষ্য পোঁছোলো পাখী-মানুষের পাথুরে দ্বীপ মোতুনুই-তে। ঈস্টার দ্বীপের সবচেয়ে খাড়া পাহাড় মাথার ওপর ঝুলে রইল পেছন দিকে। পাহাড়ের ধারালো মাথায় সুপ্রাচীন ধর্মানুষ্ঠানের কেন্দ্র ওরোঙ্গো-র পবিত্র প্রস্তরময় ধ্বংসাবশেষ। পুরোদমে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে সেখানে। মানুষগুলোকে দেখা যাচ্ছে সাদা ফুটকির মত। সেখান থেকে কিন্তু মোটর লঞ্চটাকে মনে হচ্ছে যেন নীল সমুদ্রে ভাসমান একটা ধানের শিষ।

গত শতাব্দীতেও দ্বীপের সবচেয়ে পালোয়ানেরা খাড়াই পাহাড়ের মাথায় হপ্তার পর হপ্তা বসে থাকত আর পাহারা দিত—দেখত বছরের প্রথম দিকে তুষাররঙের সামুদ্রিক পাখীরা দলে দলে নামছে নিচের পাথুরে দ্বীপ মোতুনুই-তে। প্রথম যে ডিমটা পাড়া হত, সেটিকে সবার আগে নিয়ে আসার জন্যে শুরু হয়ে যেত বার্ষিক সাঁতার প্রতিযোগিতা। প্রথমে যে ডিম কুড়িয়ে নিত, দেবত্বলাভ করত সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি। মহাসমারোহে তাকে নিয়ে

আশা হত 'রানো রারাকু পাথর-খাদের অজস্র মূর্তির মাঝে পবিত্র একটা কুঁড়েঘরে। এক বছর থাকত সে সেখানে মাথা কামিয়ে এবং ন্যাড়া মাথায় লাল রঙ মেখে। পাখী-মানুষ উপাধি লাভ করত সেই বছরের জন্যে। একটা বছর সাধারণ লোক ছায়া মাড়াতে পারত না—খাবার দাবার পৌঁছে দিয়ে যেত বিশেষ ভৃত্যরা। পাহাড়ের মাথায় প্রস্তরময় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে দেওয়ালে উৎকীর্ণ এমনি পাখী-মানুষদের মূর্তি পাওয়া গেছে সর্বত্র। একটা দেওয়ালও বাকী নেই। সব জায়গায় খোদাই করা হয়েছে পাখীদের মত-চঞ্চুওলা গরুকের মত বঁকানো পাখী-মানুষদের মূর্তি।

দ্বীপে নেমেই অবশ্য পাখীদের দেখতে পান নি থরসাহেব। দ্বীপের অন্য দিকের উপকূলে সরে গেছে পক্ষীবাহিনী। মোটর লঞ্চে যেতেই দূর থেকে দেখেছেন ভলক্যানোর ও বে ধোঁয়া-মেঘের মত পাখীর ঝাঁককে উড়ে যেতে। বেশ কয়েকটা গুহামুখেরই প্রবেশ পথ ঘনঝোপে ঢাকা। সন্ধান পেয়েছেন রাশিকৃত মানুষের হাড় আর খুলির—বহু বছর পড়ে থাকার ফলে সবুজ হয়ে গেছে শ্যাওলায়। একটা গুহার ছাদে দেখেছেন ছাগুলে দাড়িওলা লাল রঙে রাঙানো ঠেলে-বেরিয়ে-আসা একটা পৈশাচিক বঁকানো মুখ। মিসেস রাউটলেজ এ ধরনের দুটি গুহায় ঢুকেছিলেন। অনীবভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেছে পাকোমিও। এ গুহা দেখাতে সে আসে নি পাখী-মানুষের দ্বীপে। খাড়াই পাহাড় বেয়ে কিছুদূর গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেছে হঠাৎ।

বলেছে ফিস্‌ফিস্ করে—'এইখানে...এইখানে মুরগী সেঁকেছিলাম আমরা।' বলে, আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে মাটির দিকে।

'মুরগী?'

'হ্যাঁ। গুহায় ঢোকবার আগে কাসিমিরোর বাবাকে মাটির ওপর একটা মুরগী সেঁকতে হয়েছিল, যাতে গুহায় ঢুকলে কপাল খুলে যায়—বিপদ আপদ না ঘটে।'

ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না থরসাহেবের কাছে। বুঝিয়ে দিলে পাকোমিও। মুরগী সেঁকার গন্ধ যাতে শুধু বড়োদের নাকে যায়—ছোটদের নাকে না যায়, সেইভাবে ছোটদের দাঁড় করানো হয়েছিল চুল্লির একদিকে—বুড়োদের আর একদিকে। গুহায় কি আছে, তাও দেখতে দেওয়া হয় নি তাদের। শুধু জেনেছে, জিনিসগুলো অপরিসীম মূল্যবান। কাসিমিরোর বাবা গিয়ে দেখে এসেছে গুহার সম্পদ।

গুপ্ত গুহা কিন্তু খুঁজে পেলেন না থরসাহেব। তন্নতন্ন করে খুঁজে ব্যর্থ হলেন। পাকোমিও তখন বললে, এমনও হতে পারে, কাসিমিরোর বাবা

তাদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে এদিক দিয়ে গেছেন অন্যদিকে? গুহা নিশ্চয় আছে উল্টোদিকে। সেদিকেও গেলেন থরসাহেব। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দম ফুরিয়ে গেল বিষম রোদে—উৎসাহ নিভে এল। সমুদ্রের জল পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ঢুকে হয়েছিল এক জায়গায় সরোবরের আকারে। তল্লাসি ছেড়ে সদলবলে তাঁরা ঝাঁপ দিলেন শরীর ঠাণ্ডা করার জন্যে। শুধু শরীর নয়, মনও জুড়িয়ে গেল জলতলের আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য দেখে। সামুদ্রিক শজারু কিলবিল করছে সেখানে, পাথরের খাঁজ থেকে দলে দলে বেরিয়ে এল রঙবেরঙের অনেক আকারের মাছ যেগুলোই আয়ল্যাণ্ডে নতুন আবির্ভাব দেখতে। রোদ্দুরে ঝলসে গেল তাদের উজ্জ্বল গা থেকে। পরিষ্কার টলটলে জলে নিজেদের পাখা-মানুষ কল্পনা করে বসলেন থরসাহেব। যেন নন্দন কানন—এত সুন্দর। এমন ফ্যানটাসটিক সরোবর নিরালা এই আয়ল্যাণ্ডে দেখতে পাবেন ভাবতেও পারেন নি। সরোবরের এই হাজার রঙের শোভা কিন্তু কোনদিনই দৃশ্যমান হবে না চক্ষুহীন সামুদ্রিক শজারু আর বর্ণান্ধ মাছেদের কাছে।

চোখের ব্যবহার করতে হল ইস্টার আয়ল্যাণ্ডেও। মাটির তলা থেকে, ঘাসের চাপড়ার নিচ থেকে কোদাল শাবলের ঘায়ে উঠে এল এমন সব বিচিত্র বস্তু যা ইস্টার আয়ল্যাণ্ডবাসীরা দেখে নি জন্ম ইস্তক। ফলে কোনটাইকি সম্বন্ধে কুসংস্কার মাখানো অদ্ভুত ধারণা দাঁড়িয়ে গেল ওদের মনে। সিনর কোনটাইকি নিশ্চয় মানা অর্থাৎ অলৌকিক শক্তির অধিকারী। নইলে তিনি জানবেন কি করে ঘাসের তলায় মাটির মধ্যে এত জিনিস চাপা পড়ে আছে? এমনও তো হতে পারে তিনি ইস্টার আয়ল্যাণ্ডেরই 'কানাকা' অর্থাৎ স্থানীয় বাসিন্দা। গায়ের রঙ ফর্সা আর চুলের রং হাল্কা? আরে ইস্টার আয়ল্যাণ্ডেও তো এককালে হাল্কা চুলো ফর্সা মানুষ ছিল। পলিনেশিয়ান ভাষা তো জানেন কিছু কিছু। তাহিতি নরওয়ে আর পৃথিবীর নানান দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন বলে ইস্টার আয়ল্যাণ্ডের মাতৃভাষাটা ভুলে বসে আছেন।

ঘটনার শুরু ভিনাপু অঞ্চলে ইস্টার আয়ল্যাণ্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত সুবিশাল মন্দির-মঞ্চের ধ্বংসস্তূপ খনন করার সময় থেকে। প্রশান্তের হাজার দশক আয়ল্যাণ্ডে যা দেখা যায় না এখানে তাই দেখে তাক লেগে গেছে টুরিস্ট আর পণ্ডিতদের। দেখেছেন প্রাচীন নির্মাণ কৌশলের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে ইঙ্কা সাম্রাজ্যের পাঁচীর নির্মাণের। ভিনাপু যেন একটা আয়না—যে আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে ইঙ্কা অথবা তাদের পূর্বপুরুষদের সবচেয়ে কঠিন কারুকার্যের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। সাদৃশ্যটা আরও চমকপ্রদ এই

কারণে যে ইঙ্কাদের নিজেদের উপকূলের নিকটতম প্রশান্ত-আয়ল্যাণ্ড এই ঈস্টার আয়ল্যাণ্ড।

তবে কি পেরুর গুরুদেব রাজমিস্ত্রীরাই ভেল্কী দেখিয়ে গেছে নিরালা এই আয়ল্যাণ্ডে? এই আয়ল্যাণ্ডে কি সে দেশেরই পণ্ডিত শিরোমণিরা প্রথম পা দিয়ে ছেনি হাতুড়ি নিয়ে পাথরের চাঁই কেটে নির্মাণ করেছেন উন্নত-শীর্ষ প্রাচীরের পর প্রাচীর?

সাক্ষ্যপ্রমাণ অবশ্য তাই বলে। কিন্তু অন্য সম্ভাবনাও যে একটা থেকে যাচ্ছে—সে সম্ভাবনাকে আমোল দিয়েছে বিজ্ঞান। প্রযুক্তিগত সাদৃশ্য অথবা ভৌগলিক নৈকট্য হয়তো নেহাৎই দুর্ঘটনা—কাকতালীয় ছাড়া কিছুই নয়। ক্রমবিবর্ত-এর সোপান বেয়ে উঠে এসে ঈস্টার দ্বীপবাসীরাই হয়তো ভাস্করের এহেন সনিপুণ জটিলতা ও উৎকর্ষ অর্জন করতে পেরেছে বহির্জগতের সাহায্য ছাড়াই। তাই যদি হয়, ভিনাপুর রূপসী প্রাচীর নির্মাণেই স্তব্ধ হয়েছে স্থানীয় ক্রমবিবর্তনের ধারা। তাত্ত্বিক গবেষণায় কিন্তু এই সিদ্ধান্ত আজও স্বীকৃত—ধ্বংসস্তূপ ঘেঁটে কেউ অবশ্য প্রমাণ খুঁজতে আসে নি।

ভিনাপুতে বিশজনের একটা দল কাজ করেছিল চার মাস। কিন্তু প্রথম কয়েক সপ্তাহেই থরসাহেব পেয়ে গেলেন যা চাইছিলেন। প্রাচীন রাজমিস্ত্রীদের হাতে গাঁথা বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই সমন্বিত মাঝের প্রাচীরটি নির্মিত হয়েছে ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের সবচেয়ে পুরানো গৃহনির্মাণের আমলে—আগেকার সমস্ত অনুমিতির যা ঠিক উল্টো। মন্দির-মঞ্চ 'আহু' নির্মিত হয়েছে দু-বার এবং পরের বার যারা করছে, তারা ভাস্কর হিসেবে নিরেস এবং জটিল। ইঙ্কা-ধরনের কলা-কৌশলে মোটেই আর পারদর্শী ছিল না। আয়ল্যাণ্ডের অন্যান্য 'আহু' অঞ্চলে খননকার্য চালিয়ে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন থর সাহেব।

ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের কুয়াশাচ্ছন্ন ইতিহাসে যে তিনটে একেবারে আলাদা মহাযুগ এসেছিল, সে প্রমাণ পাওয়া গেল সেই প্রথম। প্রথম, সাউথ আমেরিকার রাজমিস্ত্রীদের যে প্রয়োগ কৌশল আর কলাতত্ত্ব দেখা যায়, ঠিক সেই ধরনের বিদ্যের নিদর্শন রেখে গেছে কিছু ব্যক্তি যাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রীতিমত উন্নত মানের। কার্বন ডেটিং প্রক্রিয়ায় থরসাহেব জেনেছেন, দ্বীপের এই প্রথম আবিষ্কারকদের আবির্ভাব ঘটেছিল বর্তমান পলিনেশিয়ান জনগণের পূর্বপুরুষদের আবির্ভাবের হাজার বছরেরও বেশী আগে। প্রাচীনতম এই যুগে যে রূপসী নির্মাণাদি ঘটে গেছে, দ্বীপের পরবর্তী ইতিহাসে তার সমতুল্য নজীর আর নেই। অতিকায় আগ্নেয়শিলার চাঁই কাটা হয়েছে মাখন কাটার

মত অবলাদার এবং একচার সঙ্গে আর একচাকে এমন কোশলে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে কোনো রকম ফাঁক বা ফুটো তো থাকেই নি—উপরন্তু সুদীর্ঘকাল সুউচ্চ কেল্লার মত দ্বীপকে সুরক্ষিত রেখেছে রহস্যময় সেই পুরাকীর্তি। তারপরেই কিন্তু শুরু হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুগ। সুপ্রাচীন ধ্রুপদী পুরাকীর্তির অধিকাংশ ভেঙেচুরে পালটে নেওয়া হয়—প্রাচীরের ভেতর দিকে রাস্তা বাঁধাই করা হয় এবং রানো রারাকু থেকে দানবিক মূর্তি এনে নতুন করে তৈরী এই সব ইমারতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় সমুদ্রের দিকে পিঠ ফিরিয়ে—যাদের বেশীর ভাগের তলায় ছিল কবরখানার পাতালকক্ষ।

দ্বিতীয় মহাযুগ যখন তুঙ্গে পৌঁছেছে, আচমকা থেমে গেছে সমস্ত তৎপরতা—নিথর, নিশ্চল, নিশ্চুপ হয়ে গেছে সব কিছু। নরখাদকদের তাণ্ডবলীলা আর যুদ্ধবিগ্রহের উন্মাদনায় অন্য চেহারা নিয়েছে ঈস্টার দ্বীপ—কয়েক পুরুষ পরে ১৭২২ সালে এসেছেন অ্যাডমিরাল রোগীভিন প্রমুখ ইউরোপীয়রা। পলিনেশিয়ানদের অকৃত্রিম এই ঢেউ দ্বীপে পৌঁছোতেই সাংস্কৃতিক জীবনের অবসান ঘটেছে এবং শুরু হয়েছে ঈস্টার দ্বীপের ইতিহাসের শেষ পর্ব। এখন আর কেউ ছেনি হাতুড়ি দিয়ে পাথর কাটতে বসে না— বরং টেনে নামিয়ে শুইয়ে দিয়েছে বিশাল প্রস্তর মূর্তিদের তিলমাত্র শ্রদ্ধাভক্তি না দেখিয়ে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্তূপ রচনা করা হয়েছে ছুঁড়ে নামানো গোল পাথর আর চাঁই পাথর দিয়ে, মন্দির মঞ্চের প্রাচীরের পাশে নতুন কবরখানার সাময়িক পাতালকক্ষ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে বিশাল ভূপাতিত মূর্তিগুলোকে। কাজ সারা হয়েছে কোনো-মতো করে কোনমতে উন্নততর কলাকৌশলের অভাবে—কল-কৌশলায় অভাবে দেখা গিয়েছে প্রকটভাবে। পুরাতত্ত্ববিদরা যতই খুঁড়েছে আর টেনেছে, ততই ফাঁক দেখা গিয়েছে নিবিড় রহস্যে। ঈস্টার দ্বীপের নিতল রহস্যের উৎসদেশের সন্ধান এই বুঝি প্রথম পাওয়া গেল। জট খুলে গেছে একটির পর একটি রহস্য গ্রন্থির—সরল হয়ে এসেছে হেঁয়ালি। এখন জানা গেছে, সাউথ আমেরিকার বিশেষ ধরনের প্রাচীর নির্মাণ কৌশল আবির্ভূত হয়েছিল ঈস্টার দ্বীপে পরিপূর্ণ উন্নত অবস্থায়। দ্বীপে প্রথম যারা পদার্পণ করে, এ-বিদ্যা প্রয়োগ করেছিল তারাই।

'আহু' মন্দির মঞ্চের প্রাচীরের পেছন দিকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল এতদিন। পুরাতত্ত্ববিদরা লুকোনো পশ্চাৎদেশের আবরণ অতি সন্তর্পণে সরিয়ে ফেললেন—যাতে সব কটা মহাযুগের স্তরবিন্যাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রত্যেকের চোখের সামনে। ভিনাপু-তে দলে দলে ছুটে এল নেটিভরা সেই দৃশ্য দেখতে। ঠিক এই সময়ে জমি যেখানে তোলপাড় করে ফেলা হচ্ছে,

তার পেছনে একটা অস্বাভাবিক লাল পাথর পাওয়া গেল, দেখে মনে হল, পাথরটার দুটো হাত আছে। হাতে আঙুলও আছে। চারকোনা থামের মত একটা লম্বা লাল পাথর। একটা দিকই কেবল ঠেলে উঠেছিল ঘাসের চাপড়ার ওপরে। দ্বীপের ছ-শ মূর্তির মত দেখতে নয়। যে পাথর দিয়ে মূর্তিগুলো নির্মাণ হয়েছে—সে পাথরও নয় —রানো বারাকু'তে এ-পাথর পাওয়া যায় না। আঙুলের মত দাগগুলোও ঈস্টার দ্বীপের কোনো মূর্তিতে দেখা যায় না। দ্বীপবাসীরা মুচকি হাসল। বললে—'হানি-হানি'। অর্থাৎ মামুলি লাল পাথর—এতো ভাববার কি আছে?

খটকা লাগল কিন্তু থরসাহেবের। ইঙ্কাদের আগে তাদের দেশে নির্মিত মনুষ্যাকৃতি চৌকোনা লাল পাথর তিনি দেখেছেন। অবিকল সেইরকম দেখতে এই পাথর। সেখানেই টকটকে লাল পাথর কেটে মানুষের চৌকোনা বপু সৃষ্টি করা হোত—এখানেও তাই।

লম্বা দাগগুলো আঙুলই বটে। কিন্তু মুণ্ডটা গেল কোথায়? মানবদেহের বৈশিষ্ট্য অন্যান্য প্রত্যঙ্গগুলোই বা নিপাত্তা কেন?

পুরাতত্ত্ববিদকে বললেন থরসাহেব—'খুঁড়ে দেখা যাক হে। সাউথ আমেরিকার চারকোনা লাল থামের মত লাল স্ট্যাচু আমি দেখেছি লেক টিটিকাকার পাড়ে পাড়ে।'

ইরোরিয়াকে নিয়ে দ্বীপময় চেঁা-চেঁা করে ঘুরছিলেন ফাদার সিবাসটিয়ান। মূর্তির গায়ে রঙ দিয়ে ক্রমিক সংখ্যা বসাচ্ছিলেন। লাল পাথরের থাম দেখে আমল দিলেন না তিনি। আঙুলের মত খাঁজগুলো দেখালো ইরোরিয়া। বিশ্বাস হল না ফাদারের। তামাম ঈস্টার দ্বীপে থামের মত মূর্তি তিনি একটাও দেখেন নি। সুতরাং একে মূর্তি বলে মেনে নিতে তিনি রাজী নন।

থরসাহেব ছাড়বার পাত্র নন। কৌতূহল বড় সাংঘাতিক জিনিস। টিটকিরি দিল অনেকেই। আঙুল না কচু, পাথরের গায়ে চোট লেগে অমনি দাগ পড়েছে। জিদ ধরে তবুও কর্ণিক দিয়ে সন্তর্পণে মাটি চেঁচে যাওয়া হল। অচিরেই পাওয়া গেল একটা হাত।

হ্যাঁ, হাত। পাথরটার একপাশে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত পুরো একটা হাত—বগল থেকে কব্জি পর্যন্ত। অন্য দিকেও দেখা গেল আরও একটা হাত —পুরো হাত। শুধু হাত নয়, খাটো পা-ও আছে চৌকোনা মূর্তির। গোটা ঈস্টার দ্বীপে দেখা যায় নি ঠিক এই ধরনের কোনো মূর্তি। মাথাটাই কেবল

পাওয়া গেল না। চোট মেরে কবন্ধ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে মূর্তিকে—মুণ্ড উড়ে গেছে। আর, বুকের যে জায়গায় হৃদপিণ্ড থাকার কথা, সে জায়গায় একটা গভীর ফুটো করা হয়েছে।

হতবাক হলেন ফাদার সিবাসটিয়ান। মুণ্ডহীন, লাল, চৌকোনা সৈনিক মূর্তির পায়ে চটপট বসিয়ে দিলেন একটা সংখ্যা।

বললেন—'অভাবনীয় আবিষ্কার। এ মূর্তি ঈস্টার দ্বীপের নয়—সাউথ আমেরিকার।'

বিশজনে কপিকল এবং দড়িদড়া দিয়ে গর্তের মধ্যে খাড়া করল আজব মূর্তি। স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল দ্বীপবাসীরা। এ মূর্তি তাদের দ্বীপের নয়—কিন্তু বাইরের মানুষগুলো জানল কিভাবে মূর্তি আছে মাটির তলায়?

ঘটনার সেই হল শুরু। পাখী-মানবদের পরিত্যক্ত মন্দির-ধ্বংসাবশেষ ওরোন্‌গো-তেও মাটির তলা থেকে উদ্ধার করা হল বিচিত্র হাসিমুখ ক্ষুদ্র একটা প্রস্তর মূর্তি। দলবল নিয়ে ফাদার ছুটলেন মূর্তিতে নাম্বার দিতে। এ মূর্তি পাওয়া গেল কানো কাও পাহাড়ের চূড়ায়। আর একটা বিদ-খুটে মূর্তির আবিষ্কার ঘটল রানো রারাকু পাহাড়ের পাথর খাদে। জিনা-পুরের লাল পাথরের মূর্তির মত এ-মূর্তিও ঈস্টার দ্বীপের নয়। হোঁৎকা চেহারার দানব মূর্তিটার ড্যাবডেবে চোখ দুটোই কেবল জেগে ছিল মাটির ওপর ঘাসের মধ্যে—হাজার হাজার দ্বীপবাসী এত বছর গেছে তার ওপর দিয়ে—কিন্তু সমাধিস্থ দৈত্য বলে তাকে চিনতেও পারে নি।

পরিত্যক্ত পাথর খাদের সূক্ষ্ম রাবিশ আর ক্ষয়ে যাওয়া যন্তরের একটা স্তর ঢেকে রেখেছিল বিচিত্র মূর্তিটাকে। সন্তর্পণে তাকে দৃষ্টির সামনে আনার পর দেখা গেল, পা-হীন আড়ষ্ট কোনো প্রতিবেশীর মতই নয় তাকে দেখতে। হাঁটু মুড়ে নামাজ পড়ার ভঙ্গিমায় বসে আছে মূর্তি। গোড়ালির ওপর রেখেছে পেছন দিকটা। হাত ঊরুর ওপর—ঈস্টার দ্বীপের দানব মূর্তিদের মত পেটে লাগানো নয়। চিবুকে অদ্ভুত ছাগুলে দাড়ি। বিচিত্র চোখে কণীনিকা অতি সুস্পষ্ট। ঘাড় কাৎ করে চেয়ে আছে আকাশ পানে। মুখভাব আরও বিস্ময়কর—দ্বীপের কোনো মূর্তির মুখে এই ভাব দেখা যায় না।

জীপ, যন্ত্রপাতি, নাবিক এবং বিমূঢ় নেটিভ—এইসব কিছুর সাহায্যে পুরো সাতটা দিন লাগল বিচিত্র মূর্তিকে আসন পিঁড়ি অবস্থায় সিধে করে বসাতে। মূর্তি কিন্তু তন্ময় হয়ে নিরীক্ষণ করে গেল সুদূর গ্রহ-নক্ষত্রকে—হারিয়ে যাওয়া গ্রহজগৎকে। বিস্মিতও হল বোধহয় চেঁকে

ধরা অদ্ভুত প্রাণীগুলোকে দেখে—এরা কারা? কোথায় তার অনুগত ভৃত্যরা? ধারে কাছে দূরে নাকলম্বা ঐ বিদঘুটে মূর্তিগুলোই বা কারা গড়ছে? কাদের ঐ মূর্তি? ওদের ভাঙাচোরা পাথরের রাবিশ দিয়ে কেন এতকাল কবর দিয়ে রাখা হয়েছিল তাকে?

কপালের ঘাম মুছে ছেঁকে ধরা জীবগুলো ভালভাবে তাকাল বিচিত্র মূর্তির পানে। ভাবখানা, মাটির তলা থেকে টেনে তুললাম, এবার কথা কও! কিন্তু কথা কইল না প্রস্তর মূর্তি—অদ্ভুত কোনো কাণ্ডও ঘটল না—অভিযাত্রীদের আমোলও দিল না। নির্নিমেষে চেয়ে রইল আকাশ পানে—কিন্তু কিসের সন্ধানে?

পাকোমিও বুড়ো এই সময়ে প্রস্তাব করল—'আর কেন? দ্বীপের অন্য রূপ যখন দেখা যাচ্ছে, তখন ঈস্টার দ্বীপ বা রাপানুই নাম পালটে নতুন নাম রাখা হোক।'

স্রেফ মজা করার জন্যে থরসাহেব বলেছিলেন—'পৃথিবীর নাভিমূল নাম-টাই তাহলে ফিরে আসুক—তে পিতো ও তে হেনুয়া।'

চমকে উঠল সবাই, এ যে চেনা নাম!

মেয়র বললে দুর্বোধ্য হেসে—'ঈস্টার দ্বীপের আগেকার নাম। আপনিও জানেন দেখছি।'

'আমি কেন, সবাই জানে।'

মূর্তির পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল এক বৃদ্ধ দ্বীপবাসী। এখন বললে আস্তে আস্তে—'সবাই জানে না, কিন্তু আপনি জানেন। কেন না, আপনি 'কানাকা'।' থরসাহেবের এত জ্ঞানের উৎস আবিষ্কারের চাপা উল্লাস দেখা গেল চোখে মুখে।

ঈস্টার দ্বীপে এ ধরনের মূর্তি দ্বীপবাসীরা না দেখে থাকলেও থর সাহেব দেখে এসেছেন টিয়া হুয়ানাকো-তে। লেক টিটিকাকা-র পাড়ে ইঙ্কাদেরও আগে যারা সভ্যতা বিস্তার করেছিল, তাদের প্রাচীনতম ধর্মীয় কেন্দ্র এই টিয়াহুয়ানাকো। এই ধরনের আসন পিঁড়ি দানব মূর্তির ছড়াছড়ি সেখানে—ঠিক একই কায়দায় পাথর কেটে খোদাই করা এক হাজার বছরেরও বেশী সংখ্যায় তারা বসে আছে সেখানে বিচিত্র চৌকোনা লাল পাথরের থামের মত মূর্তি পরিবৃত অবস্থায়। ইঙ্কাদের সেরা পাথর কেটে খোদাই করা হয়েছে রহস্যময় এই মূর্তিদের। সারা আমেরিকায় এই ধরনের একখণ্ড পাথরের প্রকাণ্ড মূর্তির মত মূর্তি আর নেই। পুরা-তত্ত্ববিদরা দেখেছেন, সবচেয়ে বড় কাটা পাথরটার ওজন একশ টন।

সেখানেও বিপুলকায় এই পাথরদের বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রান্তরের ওপর দিয়ে। তারপর একটার ওপর একটাকে এমন অক্লেশে তোলা হয়েছে যেন একশ টন ওজনের পাথর নয় সেগুলো—কার্ডবোর্ডের শূন্য বাক্স। বিশাল বিশাল ছাদহীন থামের আশে পাশে এনে বসিয়েছে মূর্তির পর মূর্তি। প্রতিটি মূর্তিই কিম্ভূতকিমাকার—মানুষের মত যদিও দেখতে। সবচেয়ে বড় মূর্তিটার উচ্চতা পঁচিশ ফুট—ছোট মূর্তিও আছে অনেক—কিন্তু অতিমানবিক আয়তনের প্রত্যেকেই। পর্বতপ্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত এই এই টিয়াহুয়ানাকো আজ কাটা পাথরের চাঁই আর অদ্ভুত মূর্তি সমাবেশ নিয়ে আজও যেমন রহস্যময় এবং পরিত্যক্ত—ঠিক এমনিই নাকি ছিল ইঙ্কারা প্রথম যখন এসেছিল সেখানে রাজত্ব করতে—তখনও। মালিক ছিল না বিচিত্র এই পাষাণ পুরীর, গুরুদেব ভাস্করনা নাকি প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি জমিয়েছিল—আদিম প্রজাতি উরু আর—আইমারা-দের হাতে ছেড়ে গিয়েছিল জনহীন পাষাণপুরী। থেকে গিয়েছে কেবল টিয়াহুয়ানাকোর নিরুদ্দেশ স্রষ্টাদের রোমাঞ্চকর কিংবদন্তী।

কিংবদন্তী থাকুক, বাস্তব নিয়ে বসা যাক। ঈস্টার দ্বীপের মূর্তিদের মত মূর্তি পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না—ধারে কাছের কোনো দ্বীপেও নয়, এ মূর্তি এ দ্বীপের একেবারে নিজস্ব। প্রতিটা মূর্তিই বিস্ময়করভাবে একই টাইপের—বৈসাদৃশ্য নেই কোনো অংশেই। ইতিহাসের প্রথম প্রভাতের বহু আগে অজ্ঞাত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল মেক্সিকো থেকে পেরু আর বলিভিয়া পর্যন্ত। মানুষের আকারে তৈরি সুবৃহৎ প্রস্তর মূর্তি তারা রেখে গেছে এই সব দেশে এবং নিকটতম দ্বীপগুলোয়—পেরু থেকে সমুদ্রস্রোত এসে পৌঁছোচ্ছে যেখানে—পলিনেশিয়ার একদম পূব প্রান্তে। কিন্তু কোনো মূর্তিটাই ঈস্টার দ্বীপের মূর্তির স্টাইলে নির্মিত নয়। পশ্চিম দিকের, মানে, এশিয়ার দিকের, প্রতিবেশী দ্বীপগুলোতে মূর্তির কোনো বালাই নেই। ঈস্টার দ্বীপের বিশেষ এই মূর্তি গড়ার কায়দা তাহলে আমদানী হল কিভাবে? বিশেষ করে যে মূর্তি নির্মাণ কৌশল পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় নি। গবেষকরা এই কারণেই বলেছিলেন, ঈস্টার দ্বীপের বাসিন্দারাই এই কৌশল রপ্ত করেছিল নিজে থেকে। যারা আরো কল্পনাবিলাসী, তাঁরা বলেছিলেন —ঈস্টার দ্বীপ আসলে একটা ডুবে যাওয়া মহাদেশের জেগে থাকা অংশ। অবিকল ঐ ধরনের মূর্তি পাওয়া যাবে সাগর গর্ভে। সোভিয়েত গ্রন্থ 'রিডলস্ অফ থ্রি ওশান্স'-য়ে আছে সেই রোমাঞ্চকর গবেষণা কাহিনী।

এখন তো দেখা গেছে অন্য ধরনের মূর্তিও উঠে আসছে মাটির তলা থেকে

অথবা দেওয়ালের গাঁথনি আর ভিতের মধ্যে থেকে। ভিনাপু-তে যে ধরনের লাল পাথরের মুণ্ডহীন চৌকোনা মূর্তি পেয়েছিলেন থরসাহেব, অবিকল সেই-রকম একটা দু-পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তি গ্রামের মধ্যে আবিষ্কার করলেন ফাদার। সেই সঙ্গে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, পুরোনো একটা আহু মন্দির-মঞ্চের ভিতের পাথর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কালো মিশমিশে ব্যাসাল্ট পাথরের একটা যুগল মূর্তি—পিঠটুকু কেবল বেরিয়ে আছে দেওয়ালের বাইরে। থরসাহেব নিজেও বহু মন্দির-মঞ্চের পাশে প্রাচীরের গাঁথনি আর ভিতের মধ্যে অন্যান্য টাইপের স্বাস্থ অথবা ভাঙা মূর্তি খুঁজে পেলেন। দ্বিতীয় মহাযুগ শুরু হওয়ার সময়ে এই সব মূর্তি ভেঙে বেদী আর পাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল—তার ওপর বসানো হয়েছিল রানো রারাকু থেকে আনা বৃহদাকার মূর্তিগুলো।

লক্ষ্যের অনেক কাছে চলে এলেন থরসাহেব। হেঁয়ালীর সমাধান প্রায় করে আনলেন। আবিষ্কার করলেন প্রথম মহাযুগে সাউথ আমেরিকান টাইপের প্রাচীর যারা বানিয়েছে, তারা মূর্তিও বানিয়েছে বিস্তর—কিন্তু কোনো মূর্তিটাই পরবর্তী যুগের রানো রারাকুতে নির্মিত বিখ্যাত মূর্তিদের মত নয়—যে মূর্তিরা এত বিখ্যাত করে তুলেছে ঈস্টার দ্বীপকে। প্রথম মহাযুগের ভিনদেশী মূর্তিগুলো দ্বিতীয় মহাযুগের মূর্তিদের চেয়ে আয়তনে ছোট—আকার প্রায় স্বাভাবিক মানুষের মত; গোল মাথা, ছোট মুণ্ড, বড় চোখ, কখনো লাল পাথর, কখনো কালো ব্যাসাল্ট পাথর, কখনো রানো রারাকুর হলদেটে-ধূসর পাথরে নির্মিত হয়েছে এই সব মূর্তি। প্রথম মহাযুগের মূর্তিদের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুগের মূর্তিদের মিল কোথাও নেই বললেই চলে—শুধু এক জায়গায় ছাড়া। প্রথম মহাযুগের কিছু কিছু মূর্তিকে পেটে হাত চেপে ধরে থাকতে দেখা গেছে—যাতে একহাতের আঙুল অন্য-হাতের আঙুলের দিকে ফেরানো থাকে। প্রাক্-ইঙ্কা স্ট্যাচু-নির্মাণ কৌশলে এই বৈশিষ্ট্যটা দেখা গেছে। পলিনেশিয়ার প্রতিবেশী দ্বীপেও দেখা গেছে এই ধরনের প্রস্তর মূর্তি।

বোবা মূর্তিদের দিয়ে কথা বলানো গেল তাহলে। বহির্জগৎ থেকে প্রথম মূর্তিনির্মাণ এবং প্রাচীর গঠনের কলাকৌশলের আমদানি ঘটে ঈস্টার দ্বীপে। প্রথম ধ্যানধারণা প্রথম মহাযুগের সেই শিল্পীদেরই। এরাই গড়েছে বেঁটে-পা মূর্তি, লাল পাথরের থাম-মূর্তি এবং সুপ্রাচীন ক্লপদী প্রাচীর। তারপর এসেছে দ্বিতীয় মহাযুগ। নিজস্ব মূর্তি নির্মাণ কৌশল উদ্ভাবন করেছে সে যুগের শিল্পীরা। ক্রমশঃ বাড়তে থাকে অভিজ্ঞতা আর দক্ষতা—বাড়তে থাকে

মূর্তিদের সাইজ। আর মন্দির-মঞ্চে দাঁড়ানো মূর্তিগুলো বিরাট তো বটেই, তার চেয়েও বিরাট যাদের আনতে আনতে ফেলে রাখা হয়েছে বন্ধুর পথে, আরও বিরাট মূর্তিগুলো খাড়া রয়েছে আগ্নেয়গিরির পাদদেশে সম্পূর্ণ অবস্থায় বাহিত হওয়ার প্রতীক্ষায়। সবচেয়ে বড় মূর্তিটা অসমাপ্ত অবস্থায় রয়ে গেছে পাহাড়ের গায়ে, পিঠে পাথরের চিলতে আ-কাটা অবস্থায় —এর দৈর্ঘ্য সাত তলা।

বিস্ময়কর এই ক্রম বিবর্তন সহসা স্তব্ধ হল কেন, এ প্রশ্নের উত্তর আজও অজ্ঞাত। আজও কেউ জানে না, কারিগরি ক্ষমতা পৌঁছেছিল দক্ষতার কোন পর্যায়ে। কেন না নির্মাণ শৈলী তুঙ্গে পৌঁছানোর আগেই আচমকা স্তব্ধ হল পাথর-দানবদের কুচকাওয়াজ—মুখ থুবড়ে পড়ল যে-যেখানে ছিল সেইখানেই। কেন ঘটল এই অঘটন? দ্বীপবাসীদের মতে নাকি ডাইনি বুড়িকে গলদা চিংড়ির ভাগ দেওয়া হয় নি—তাই।

গলদা চিংড়ির না হলেও লড়াই শুরু হল আরও কড়া মাংসের লোভে —মহামাংসের লড়াই লাগল ঠিক তখনি যখন স্তব্ধ হল পাথর-দানবদের কুচকা-ওয়াজ—আরম্ভ হল তৃতীয় মহাপর্ব—নরখাদকরা দখল নিল ঈস্টার দ্বীপের।

তৃতীয় মহাযুগ এখনো চলছে—তবে পশ্চিমী সভ্যতার হাওয়ায় আর খৃষ্টধর্মের প্রচারে ঈস্টার দ্বীপবাসীরা আর নরমাংস লোভী নয়। যদিও নরখাদকের বংশধরেরা এখনো বিরাজ করে এই দ্বীপে—পশ্চিম থেকে আগত পলিনেশিয়ান পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলে মিশে গেছে। এ দ্বীপে এখন বইছে শান্তি, তিতিক্ষা আর সহিষ্ণুতার হাওয়া।

৫। লম্বকর্ণদের গুপ্তরহস্য

ঈস্টার দ্বীপে এর আগেও জাহাজ এসেছে এবং গেছে—থাকে নি। কিন্তু মাসের পর মাস নোঙর ফেলে রইল কেবল থরসাহেবের জাহাজ। হলুদ ঘাস আর সবুজ পাহাড়ে রঙীন দ্বীপের অনতিদূরে নীল সমুদ্র আর নীল আকাশের মধ্যে সাদা জাহাজটা যেন দ্বীপেরই একটা অংশ হয়ে গেল। পালতোলা কাঠের কিছু কিছু জাহাজ অবশ্য উপকূল বরাবর জলের তলায় আছে, ডুবে গেছিল সুদূর অতীতে—দ্বীপের শোভাবর্ধন করার জন্যে তাথৈ-তাথৈ ঢেউয়ের মাথায় আর তারা নৃত্য করে না। বাণিজ্য বায়ুর ঝাপটায় আর তাদের পাল ফুলে ফুলে ওঠে না।

মাঝে মাঝে হাওয়ার বেগ বাড়ত। বড় বড় ঢেউ জাহাজটাকে তুলে আছাড় মারার চেষ্টা করত ডুবো পাহাড়ের ওপর। স্কীপার তখন সাইরেন বাজিয়ে সংকেত করত দ্বীপের স্কুয়াডকে। বেশ কয়েক দিনের খাবারদাবার জাহাজ থেকে এনে তাঁবুতে জমিয়ে রাখত স্কুয়াড। জাহাজ নোঙর তুলে চলে যেত রানো রারাকু আগ্নেয়গিরির পাশে—দ্বীপের উল্টোদিকে—যেখানে প্রথম রাতে এসে নোঙর ফেলেছিল জাহাজ। সমুদ্র শান্ত হলে আবার ফিরে আসত হোতু মাতুয়ার বাসভূমির অনতিদূরে।

সারাদিন খেটেখুটে এসে গানবাজনা অথবা লেখাপড়ায় ডুবে যেত অভিযাত্রীরা। ঘোড়ায় চেপে কেউ কেউ চলে যেত হাঙ্গারোয়া গ্রামে হুলা নাচের আসরে। মেসের ছোকরা চাকরটা একদিন তো হাতের হাড় খুলে ফেলল ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে। ডাক্তার হাড় বসিয়ে দিলেন ঠিক করে। তা সত্ত্বেও উৎসাহে ভাঁটা পড়ল না—নাচের এমনি আকর্ষণ।

গ্রামের সবার সঙ্গেই দিব্বি পরিচয় জমে গেছিল থরসাহেবদের। প্রতি রোববার ফাদার সিবাসটিয়ানের গির্জেতে যাওয়াতেই তা সম্ভব হয়েছিল। প্রার্থনা সভা মানেই সাপ্তাহিক জমায়েৎ, পরিষ্কার জামাকাপড় পরে সবাই সেদিন আসবেই—মেলামেশার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে অন্তরঙ্গতা।

দুজন কিন্তু কোনদিনই এল না প্রার্থনা সভায়—অথবা গভর্ণরের বাড়ীতে ডিনার খেতে। গ্রামের ডাক্তার আর স্কুল মাস্টার!

একদিন অবশ্য স্কুলমাস্টারের আবির্ভাব ঘটল সবার সামনে। সেই প্রথম এবং সেই শেষ। স্কুলের তরফে বেশ কয়েকবার অনুরোধ করেছিলেন গভর্ণর ছেলেমেয়েদের জাহাজে করে ঈস্টার দ্বীপের চারপাশে এক চক্কর ঘুরিয়ে আনবার জন্যে। আনাকেনা-য় পিকনিক লাঞ্চ খেয়ে বিকেল নাগাদ জাহাজে করে একপাক ঘুরে আসবে দ্বীপটাকে অভিযাত্রীদের জাহাজে চেপে—ফিরে আসবে সন্ধ্যা নামলেই। ছেলেমেয়েরা বর্তে যাবে এমন একটা সুযোগ পেলে।

থরসাহেবের খুব একটা মনে ধরে নি প্রস্তাবটা। কিন্তু ফাদার সিবা-সটিয়ান যখন বললেন যে বাচ্চাদের কেউই সমুদ্রবক্ষ থেকে গোটা দ্বীপের চেহারা দেখে নি—তখন রাজী হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। বাচ্চাদের নিয়ে টহল দেওয়ার মত উপযুক্তও বটে অভিযাত্রী জাহাজের মূল ডেকটা। রেলিং বেশ উঁচু এবং ভেতর দিকে বাঁকানো। দস্যি খোকাখুকুদের পক্ষে রেলিং বেয়ে ওঠা সম্ভব নয় কোনমতেই। অবশ্য মাছের মত সাঁতরাতে পারে ঈস্টার দ্বীপের খোকাখুকুরা। স্কুল ঢোকবার আগেই তারা রপ্ত করে নেয় সন্তরণ

দিচ্ছে।

জাহাজ নিয়ে আসা হল হাঙ্গারোয়া গ্রামের অনতিদূরে। ভোরের দিকে নোঙর তোলা হল জাহাজের। ১১৫ টা ছেলেমেয়ে রইল ডেকে। দ্বীপে মানুষ যত আছে, তার আটভাগের এক ভাগ এরা। আকাশ পরিষ্কার, বাতাস মৃদুমন্দ। বাচ্চাদের তদারকি করার জন্যে সঙ্গে এল স্কুল মাস্টার, গ্রামের ডাক্তার এবং তার সহকারী, গভর্ণরের সহকারী, তিনজন সন্ন্যাসিনী, সাতজন বয়স্ক নেটিভ। সেকি উত্তেজনা আর হৈ চৈ। কোরাস গান জুড়ে দিল বাচ্চারা। কিন্তু কডাং কডাং শব্দে নোঙর তোলা হতেই এবং সাইরেন বাজিয়ে গ্রামকে বিদায় জানাতেই, বেশীর ভাগ বাচ্চাই কেমন যেন হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল উল্লাস। নিশ্চুপে বিষণ্ণ ভাবে চেয়ে রইল গ্রামের দিকে। যেন একদিনের জন্যে দ্বীপ পরিক্রমায় নয়—পৃথিবীর শেষপ্রান্তে অভিমুখে রওনা হচ্ছে। আহারে। এই দ্বীপেই তো ওদের জগৎ, ওদের বিশ্ব।

খোলা সমুদ্রে যেতেই জাহাজ দুলুনি আরম্ভ হল, ১১৫ জনের প্রত্যেকেই আক্রান্ত হল সমুদ্র পীড়ায়—চিটান শুয়ে পড়ল ডেকের সর্বত্র। টলতে টলতে একজন নেটিভ এসে অনুরোধ করে গেল চটপট জাহাজ নিয়ে যেন গ্রামে যাওয়া হয়—সখ মিটে গেছে। বলে নিজেই দৌড়ালো হ্যাচে শোবার জন্যে। কিন্তু গিয়ে দেখল হ্যাচ আগেই দখল করেছে বাচ্চারা।

খাড়া রইল কেবল একজন। স্কুলমাস্টার। চোখ তার কুচকুচে কালো। চুল দাঁড়কাকের মত মিশমিশে। বিশাল বপু। ডেকময় ছুটোছুটি করে সাহস যুগিয়ে গেল ছেলেমেয়েদের। সমুদ্রযাত্রায় সে নাকি অভ্যস্ত। বহুবার পাড়ি জমিয়েছে সমুদ্রে—বমি-টমি কখনো করে নি—সমুদ্রপীড়া তাকে কাবু করতে পারে নি। গ্রামের ডাক্তারের মত পলিটিক্স করতেও চাইল না। চিলির বাসিন্দা বলা যায় ছেলেমেয়েদের—চিলির সরকার যখন ঈস্টার দ্বীপের শাসনভার হাতে নিয়েছে, তখন এদের সবাইকে নিয়ে যাবে সে মূল ভূখণ্ডে—যুদ্ধজাহাজে করে। কথাবার্তায় প্রাণশক্তি যেন ঠিকরে ঠিকরে বেরুচ্ছে। বাচ্চাদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার সময়ে কিন্তু অন্য মানুষ। গভীর স্নেহমমতায় দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়ে আসছে। দ্বীপের উপকূল সম্বন্ধে ডাইরীতে টুকিটাকি লিখে নেওয়ার সময়েও স্বপ্নালু ভাসা ভাসা চোখে তাকিয়ে আছে। ঈস্টার দ্বীপকে সে ভালবাসে—এ-দ্বীপের ওপর তার আকর্ষণ যে কতখানি, তা ঐ চাহনির মধ্যেই ফুটে উঠছে।

অন্তরীপ ঘুরে আসতেই শান্ত হয়ে এল সমুদ্র। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে টপাটপ দাঁড়িয়ে উঠে একযোগে ছুটল জাহাজের সামনের দিকে

—নিষেধ সত্ত্বেও। সমুদ্র পীড়া ভুলে গেল যেন। স্কুলমাস্টার প্রত্যেককে ঘাড় ধরে টেনে এনে ফের শুইয়ে দিলে ডেকের মাঝামাঝি জায়গায় হাচের মধ্যে। আনাকেনা উপসাগরে পৌঁছোনোর আগে পর্যন্ত উল্লাসের চিহ্নমাত্র আর দেখা গেল না। তারপরেই শুরু হল সমবেত পলিনেশীয় সঙ্গীত। আকাশ বাতাস ভরে উঠল সুরেলা সঙ্গীতে। প্রাণ ফিরে পেল যেন বাচ্চারা।

আনাকেনায় নোঙর ফেলল জাহাজ। ছেলেমেয়েদের নামিয়ে আনা হল তীরে। এই সেই সমুদ্র সৈকত –বহুবছর আগে দ্বীপের প্রথম আবিষ্কারক হোটু মাতুয়া যেখানে অবতরণ করেছিলেন, বাসস্থান রচনা করেছিলেন। বাচ্চাদের ঘুরিয়ে দেখানো হল হোটু মাতুয়ার গুহা, অভিযাত্রীদের তাঁবু। মন্দিরের চত্বরে প্রাচীরের পাশে ঘাসের ওপর আরম্ভ হল পিকনিক। গ্রাম থেকে কিছু নেটিভ ঘোড়ায় চেপে এসেছিল সাহায্য করার জন্যে। ছটা ভেড়া সেঁকা হল মাটির ওপর গনগনে দুটো পাথরের মধ্যে পলিনেশীয় কায়দায়।

দিন ফুরিয়ে আসছে। আগুনের পাশে রোদ্দুরে শুকনো হাড়গোড় ছাড়া আর কিছু পড়ে নেই। বাচ্চারা সব জলে। হুটোপাটি করছে। সাঁতার কাটছে, হোটু মাতুয়ার প্রাচীন গান গাইছে গলা ছেড়ে। বড়রাও গলা মিলিয়েছে। এমন কি সন্ন্যাসিনী তিনজনও গাইছে সুরেলা সেই সঙ্গীত।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাততালি দিলে স্কুলমাস্টার। সময় হয়েছে—এবার বাড়ী ফেরার পালা। সমুদ্র শান্ত। প্রশান্ত ঢেউ উঠছে আর নামছে। দুলছে ঘাটে বাঁধা ভেলা। মোটর লঞ্চ করে ইঞ্জিনীয়াররা জাহাজে গেল জিনিসপত্র আনতে। একদল ছেলে গেল সঙ্গে। দস্যি কিছু ছেলে সাঁতরে গেল পাশে পাশে। এতক্ষণ এরাই লঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে ঝাঁপ খেয়েছে জলে। স্কুলমাস্টার আবার চেঁচামেচি করে ফিরিয়ে আনল তাদের। একটা দল ঘুরে এল জাহাজে, গেল আরও একটা দল। বাকী সবাইকে দ্বীপে নিয়ে বসে রইল বড়রা—পরের বার লঞ্চে তোলার জন্যে।

অ্যাকসিডেন্টটা ঘটল ঠিক তখনি। ছেলেমেয়েদের নিয়ে লঞ্চ তখন ফিরছে তীরের দিকে। হঠাৎ প্রত্যেকেই হুড়োহুড়ি করে দৌড়ে এল সামনের দিকে ঢেউ দেখবে বলে। বিকট চেঁচিয়ে উঠল ছুতোর মিস্ত্রী। কিন্তু চকিতের মধ্যে ঘটে গেল দুর্ঘটনাটা।

দু-টন ওজন বইতে পারে মোটর লঞ্চ। তখন কিন্তু ওজন নিয়েছে মাত্র একটনের মত। দাপাদাপি ঠেলাঠেলিতে সামনের দিক ঝুঁকে পড়ল জলের দিকে। ঠিক সেই সময়ে একটা বড় ঢেউ পেছন দিক থেকে এসে আছড়ে

করে উল্টে দিল মোটর-লঞ্চ। শুধু দেখা গেল পেছন দিকটা উঠে রয়েছে জলের ওপর—অনেকগুলো মাথা ভাসছে আশেপাশে।

তৎক্ষণাৎ জাহাজ থেকে বোট নামানো হল। দ্বীপ থেকেও ডুবুরী এবং বড়রা সাঁতরে গেল সেখানে। গেল স্কুল মাস্টারও বিশাল দেহ নিয়ে। থরসাহেব নিজেও সাঁতরে গেলেন। টেনে টেনে তুললেন যারা হাবুডুবু খাচ্ছে। অনেকেই অবশ্য সাঁতরে ভেলায় এসে উঠল। আট-চল্লিশ জনকে তোলা হল জাহাজে। কয়েকটি ছেলে দুটো নিস্পন্দ দেহকে চুলের মুঠি ধরে ভাসিয়ে রাখল জলের ওপর। দুজনের একজনের চুল লাল—গায়ের রঙ ধবধবে সাদা। মেয়রের তেরো বছরের মেয়ে সে।

থরসাহেব নিজে দেখলেন, টলটলে পরিষ্কার জলের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যেন একটা খেলনা পুতুল। পঁচিশ ফুট নিচে একটা দেহ পড়ে আছে। নিজে চেষ্টা করে অত নিচে নামতে পারলেন না। ডুব সাঁতারু পাঠালেন। তুলে আনা হল দেহটা।

ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। ১১৫ জনের সবাইকে আনা হল তীরে। সবকটা তাঁবু ভরে গেল। প্যারাফিন ল্যাম্প জ্বালিয়ে শুরু হল ছুটোছুটি। বালুকাবেলার ওপর কয়েকজনকে শুইয়ে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের চালিয়ে গেল জাহাজের ডাক্তার। স্কুল মাস্টারকে নিয়ে ব্যস্ত রইল গ্রামের ডাক্তার নিজে। অবস্থা তার শোচনীয়। নিঃশ্বাস পড়ছে না। পাগলের মত বাচ্চাদের জল থেকে টেনে তুলছে। ভেলায় তার বপু টেনে তুলতে গিয়ে ভেলা উল্টে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এখন যেতে বসেছে প্রাণটা।

রাত হল। যারা সুস্থ হল, তারা ঘুমিয়ে পড়ল তাঁবুতে। খাবার ওষুধ-পত্র, কম্বল, বিছানা সরবরাহ করা হল তাঁবু থেকে।

কনকনে ঠাণ্ডা পড়তে সুস্থ ছেলেমেয়েদের ঘোড়ায় চাপিয়ে কম্বল দিয়ে মুড়ে বাপ-মায়েরা রওনা হল গ্রাম অভিমুখে। দুটি ছেলের আমাশা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল—তারা রইল তাঁবুতে।

সমুদ্রে ভাসতে লাগল অগুন্তি জুতো আর জামা কাপড়।

আট জন একটা স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে এল সৈকত থেকে। পাশে শুষ্ক গম্ভীর মুখে হাঁটছে গ্রামের ডাক্তার। স্কুল মাস্টার মারা গেছে। শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে শুধু একটা কথা বলে—সিধে হয়ে ভেসে থাক ছেলেরা—কৌ কৌ, পোকি।

মারা গেল আরও দুটি ছেলেমেয়ে। তাদের একজন মেয়রের তেরো

বছরের মেয়ে—চুল যার টকটকে লাল, মুখ ধবধবে সাদা।

কিন্তু কান্নাকাটি করল না মেয়র। শান্ত ভাবে মেনে নিল দুর্দৈব। শুধু বললে—'ভালোই আছে মেয়েটা, কুমারী মাতা-র পায়ে ঠাঁই পেয়েছে।'

ছেলেমেয়ে ফিরে পেল যারা, তারা কিন্তু কেঁদে ফেলল। যারা পেল না—তারা থরসাহেবকে দোষারোপ করল না।

গির্জেতে এরপর গ্রামের ডাক্তারকে দেখেছিলেন থরসাহেব। বন্ধুর কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে। আগের দিন ছেলেমেয়ে দুটিকে কবর দেওয়া হয়েছে গান গেয়ে। সেদিন নিয়ে যাওয়া হল স্কুল মাস্টারের কফিন। কবর খানায় বন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে শুধু একটি কথাই বলেছিল গ্রামের ডাক্তার—'সিধে হয়ে ভেসে থাক, সিধে হয়ে ভেসে থাক।'

দৃশ্যটা কোনোদিন ভুলবেন না থরসাহেব। ভুলবেন না দুর্ঘটনার সন্ধ্যাটি। তখন সূর্য ডুবেছে। চাঁদ দেখা দিয়েছে দিগন্তে। কালো আকাশে হঠাৎ দেখা গিয়েছিল আশ্চর্য ধূসর এক রামধনু।

নেটিভরা কিন্তু চটপট ভুলে গেল সবকিছু—অবিশ্বাস্য বিস্মৃতি শক্তি তাদের। ঝেড়ে ফেলল দুর্ঘটনার স্মৃতি—স্বাভাবিক হয়ে উঠল দুদিনেই। কেউ মারা গেলে বিরাট ভোজসভা হয় ঈস্টার দ্বীপে। আত্মীয়স্বজনেরা গরু ভেড়া মেরে ব্যস্ত হল লোক খাওয়াতে। তাঁবুতেও দিয়ে গেল রাশি রাশি মাংস। সেই সঙ্গে দিয়ে গেল দুর্ঘটনার রাতে বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কম্বল আর জামাকাপড়—কেচেকুচে ইস্ত্রী করা অবস্থায়। একটা জিনিসও খোয়া যায়নি অবারিত দ্বার তাঁবু থেকে—অথচ পয়লা নম্বরের চোর এরা সবাই। সেই অবস্থায় তাঁবুর কোনো জিনিসের দিকে কারো নজর ছিল না। কেউ তা নিয়ে ভাবেও নি। দ্বীপবাসীরা কিন্তু প্রতিটি জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে গেল দিন কয়েক পরে।

শুধু একটি জিনিস আর ফিরে এল না। একটা হাতঘড়ি। একজন অভিযাত্রী হাতের ঘড়ি খুলে টুপির মধ্যে ফেলে ঝাঁপ দিয়েছিল জলে বাচ্চা-দের উদ্ধার করার জন্যে। এই ঘড়িটাই কেবল চুরী গিয়েছিল সেদিন।

ফাদার কিন্তু সামান্য এই চুরীর ঘটনা ভুলতে পারেন নি। গির্জের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বিমর্ষভাবে তাঁকে বলেছিলেন থরসাহেব—'কী ভয়ংকর! কী ভয়ংকর! বাচ্চাগুলোর কপালে এমন ভয়ংকর ঘটনা ঘটবে কে জানত।'

চোখের পাতা না ফেলে ফাদার বলেছিলেন—'তার চাইতেও বেশী ভয়ং-কর ঘটনা ঘটেছে চোরাই ঘড়িটা নিয়ে। ভয়ংকর, খুবই ভয়ংকর!'

বিমূঢ় চোখে চেয়েছেন থরসাহেব—'কি বলছেন?'

'মরতে তো একদিন আমাদের হবেই—চুরী করতে যাবো কেন?'

চোখ ফেরাতে পারেন নি থরসাহেব। ঈস্টার দ্বীপের এই মহান পুরুষটির কথা তিনি কোনোদিন বিস্মৃত হবেন না।

থরসাহেব কিন্তু মুষড়ে গেলেন। শোচনীয় এই ঘটনার পর কাজকর্ম বন্ধ করে দিলেন। দ্বীপের লোক ধরে বসল আবার কাজ শুরু করার জন্যে। কাজ চললেই তাদের হাতে দু-পয়সা আসে, বিনামূল্যে খাবারদাবার আসে, অন্যান্য জিনিসপত্রও আসে।

থরসাহেবের কিন্তু মন নেই। একদিন গেছিলেন ফাদারের বাড়ীতে। রাশি রাশি বইয়ের মধ্যে বসে ফাউন্টেন পেন নিয়ে কি লিখছিলেন সৌম্য তাপস। বহু ভাষার বই দেখে অবাক হয়ে গেছিলেন থরসাহেব।

ফাদার বলেছিলেন—'এবার কাজ শুরু করুন এমন একটা জায়গায় যার মধ্যে মিশে রয়েছে ঈস্টার দ্বীপের একটা কিংবদন্তী। নেটিভদের মুখে মুখে শুনবেন সেই কাহিনী।'

'কি বলুন তো?'

'লম্বকর্ণদের গুপ্ত রহস্য।'

এ রহস্য কাহিনী থরসাহেবও শুনেছেন বহুবার। ঈস্টার দ্বীপে যারা এসেছে, প্রত্যেকেই শুনেছে। ফাদার সিবাসটিয়ান নিজেও সেই কাহিনী তাঁর বইতে লিখেছেন। এখন আবার বললেন থরসাহেবকে।

সেই সঙ্গে বললেন—'বৈজ্ঞানিকরা অবশ্য কিংবদন্তী মানতে রাজী নন। তাঁরা বলছেন, আহুকো র পরিখা আইকো বানায় নি। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। দ্বীপের লোকদের আমি চিনি। ওরা অলীক গল্প বলছে না। খুঁড়লেই বুঝবেন।'

গল্পটা সত্যিই রোমাঞ্চকর। লম্বকর্ণদের স্বর্ণযুগ চলছে তখন ঈস্টার দ্বীপে। বড় বড় মূর্তি তৈরী হচ্ছে। হ্রস্বকর্ণরা খেটে মরছে তাদের হুকুম মত। এ-দ্বীপে এক দুটি জাতিই পাশাপাশি থেকেছে দীর্ঘকাল। বুদ্ধি আর মেধায় উন্নত লম্বকর্ণরা প্রভুত্ব করছে হ্রস্বকর্ণদের ওপর।

জন্ম থেকেই কানের লতিতে ভারী জিনিস ঝুলিয়ে কান লম্বা করে দেওয়া হত যাদের, তাদের নাম ছিল হানুয়া ঈপি। কান যাদের ছোট, তাদের নাম হানুয়া মোমোকো।

লম্বকর্ণরা বাড়তি পাথর বিদেয় করতে চেয়েছিল দ্বীপ থেকে। পয়েক মালভূমি থেকে বাড়তি পাথর হ্রস্বকর্ণদের দিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল ঐদিকের উপকূলের জলে। পয়েক মালভূমি তাই এমন প্রান্তরময়—চাষবাস

করা হত সেখানে।

কিন্তু এত মেহনৎ সইল না হ্রস্বকর্ণদের। একদিন তারা বিদ্রোহী হল। লম্বকর্ণদের কোণঠাসা করে ফেলল পয়েক অন্তরীপের দিকে।

পয়েক অন্তরীপের পাহাড়ের গা সোজা ছ'ফুট নেমে গেছে সমুদ্রের মধ্যে। যেন একটা দুর্ভেদ্য দুর্গের খাড়াই প্রাচীর। তিনদিক ঘেরা।

বাকী ছিল একটা দিক— পয়েক মালভূমি। লম্বর্ণদের দলপতি আইকো একটা দু-মাইল লম্বা পরিখা খুঁড়ে ফেলল এই মালভূমিতে। শুকনো গাছ। পাতা এবং কাঠকুটো দিয়ে ভরে রাখল এই পরিখা। যেন একটা বিরাট চিতা—আগুন দিলেই জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে।

সুরক্ষিত হল পয়েক অন্তরীপ। নিশ্চিন্ত হল লম্বকর্ণরা।

কিন্তু ওদের মধ্যে একজনের বউ ছিল হ্রস্বকর্ণদের মেয়ে। বিশ্বাসঘাতক সে। অনেকরকম সংকেত দেখিয়ে লম্বকর্ণদের খবর পাচার করত জ্ঞাতি ভাইদের কাছে। একটা সংকেত ছিল এই: বসে বসে বসে ঝুড়ি বুনছে দেখলেই বুঝবে পথ পরিষ্কার—হানা দিতে পারো নির্বিঘ্নে।

সত্যিই একদিন দেখা গেল বসে বসে ঝুড়ি বুনছে বউটা। চুপিসারে সারবন্দী হ্রস্বকর্ণরা ঢুকে পড়ল মালভূমিতে—উপকূলের দিক দিয়ে ঘিরে ধরল পুরো অঞ্চলটাকে। তারপর আর একটা দল পরিখার অপর পাড়ে দাঁড়িয়ে রণহুংকার ছাড়তেই দলে দলে লম্বকর্ণরা ছুটে এল পরিখার দিকে।

অমনি পেছন থেকে রে-রে করে তেড়ে এল পালে পালে হ্রস্বকর্ণ। অতর্কিতে মার খেয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল লম্বকর্ণরা। মারের চোটে ঠিকরে গেল কাঠবোঝাই পরিখার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরিয়ে দিল হ্রস্বকর্ণরা।

নিজেদের খোঁড়া চিতাতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল সমস্ত লম্বকর্ণ।

একজন বাদে। 'ওরোরো, ওরোরো, ওরোরো' বলে চীৎকার করে সে দৌড়ে পালাতে গিয়েছিল। হ্রস্বকর্ণরা তার চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে এল নিজেদের এলাকায়, তাদেরই একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিল তার। তাদেরই ছেলেমেয়েরা এখনো আছে ঈস্টার দ্বীপে। খাটি লম্বকর্ণদের বংশধর এরাই। এদের একজন মেয়র, তাই মেয়রের মেয়ের মাথার চুল লাল, গায়ের রঙ সাদা। মেয়র নিজেও অন্যান্য দ্বীপবাসীদের মত নয়। চুল পাতলা, বেঁটে পাতলা, হাতের কাজেও এত দক্ষ।

হ্রস্বকর্ণরা এরপর থেকেই মূর্তি ভাঙচোর শুরু করে দিলে অনেকটা কালা পাহাড়ি কায়দায়। পুরো দ্বীপের দখল নিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল তারা। দখল করেছিল এক-একটা এলাকা। সেই এলাকার

সমস্ত মূর্তি এলাকা দলপতির। নিজেদের মধ্যে মারপিট লাগলেই একদল আরেক দলের এলাকায় গিয়ে মূর্তি উল্টে ফেলে উত্ত্যক্ত করতো শত্রু পক্ষকে।

পরিখা খননের এই ইতিহাস কিন্তু গবেষকরা মেনে নেয় নি। মিসেস রাউটলেজেরও সন্দেহ ছিল। পরিখাটাকে প্রাকৃতিক পরিখা বলে বর্ণনা করেছিলেন—মানুষের হাতে তৈরী নয়, মেট্রো আরও এক ধাপ এগিয়ে ছিলেন। পরিখাটা প্রাকৃতিক তো বটেই, লম্বকর্ণ আর হ্রস্বকর্ণদেরও কোনো অস্তিত্ব ছিল না কোনোকালে। দ্বীপবাসীরাই উর্বর কল্পনা শক্তি দিয়ে গল্প বানিয়েছে—লম্বকর্ণ এবং হ্রস্বকর্ণদের সৃষ্টি করেছে।

একজন ভূতত্ত্ববিদও পরিখা পরীক্ষা করার বলেছে, অগ্ন্যুৎপাতের ফলে লাভার স্রোত বয়ে যাওয়ার সময়ে সৃষ্টি হয়েছে এই পরিখার। লাভা স্রোত এসেছিল পয়েকের দিক থেকে, জমাট লাভাস্তূপ পাওয়া গেছে সেখানে, আর একটা পরিখা।

শুনে মাথা চুলকেছিল দ্বীপবাসীরা। তবে কি তাদের কিংবদন্তী মিথ্যে?

ফাদার কিন্তু একবর্ণও বিশ্বাস করেন নি গবেষকদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। দৃঢ় বিশ্বাসে তাই শুধু বললেন—'এ পরিখা আইকো বানিয়েছিল। লম্বকর্ণদের বাঁচানোর জন্যে বানিয়েছিল। খুঁড়লেই বুঝবেন।'

রাজী হলেন থরসাহেব। আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন ফাদার সিবা-সটিয়ান। এ যেন তাঁর ব্যক্তিগত জয়। পূর্ণ হতে চলেছে অনেকদিনের অভিলাষ। পাগল! সত্যিই পাগল। থরসাহেবের এতই ঈস্টার দ্বীপের রহস্য পাগল এই ফাদার সিবাসটিয়ান।

পুরাতত্ত্ববিদকে সঙ্গে নিয়ে জীপ হাঁকিয়ে পয়েক মালভূমির দিকে এক-দিন সকাল থাকতেই রওনা হলেন থরসাহেব। জীপে এল পাঁচজন নেটিভ খনক। মালভূমিতে পাথরের বালাই নেই। যেদিকে খুশী জীপ চালানো যায়। উনি কিন্তু সোজা গেলেন পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের তলা থেকেই মসৃণ সবুজ ঘাসজমি উঠে গেছে ঢাল বেয়ে। এইখানে জমি যেন একটু দেবে গেছে। দেবে যাওয়া জমি লম্বালম্বি চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে —খাড়াই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে অন্তরীপ পর্যন্ত। যেন এককালে খাল কাটা হয়েছিল—এখন বুঁজে গেছে।

মাঝে মাঝে একদিকের উঁচু পাড়ের ওপর এক-একটা মাটির ঢিবি—যেন মৃত্তিকা-বুরুজ। ব্রেক কষে জীপ থেকে লাফিয়ে নামলেন থরসাহেব।

এই সেই আইকো-পরিখ অথবা কো তে আতা ও আইকো। আরও একটা নাম আছে অবিশ্যি—কো তে উমু ও তে হানুয়া ঈপী। মানে, লম্বকর্ণদের মাটির উনুন।

প্রথমে পরীক্ষামূলক ভাবে জায়গায় জায়গায় খুঁড়ে দেখা দরকার। পাঁচজন দ্বীপবাসীকে কিছুদূর অন্তর দেবে যাওয়া জায়গা বরাবর দাঁড় করিয়ে দিলেন থরসাহেব। খুঁড়তে হুকুম দিয়ে পুরাতত্ত্ববিদকে নিয়ে বেরোলেন আশেপাশে টহল দিয়ে আসতে। ক্ষতির সম্ভাবনা তো নেই—খুঁড়ুকনা নিজেরা।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন প্রথম খ-কের কাছে। কিন্তু তাকে দেখতে পেলেন না। বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে শাবল কোদাল সমেত। অথচ, আইকো-পরিখা খোঁড়বার হুকুম পেয়েই মহা উৎসাহে শাবল তুলেছিল এরা মাথার ওপর—এত উৎসাহ আর কখনো দেখা যায় নি।

গেল কোথায় লোকটা? এগিয়ে গেলেন থরসাহেব। হঠাৎ মাটির মধ্যে থেকে ঝুপঝুপ একরাশ মাটি ঠিকরে এল ওপরে।

দৌড়ে গেলেন। দেখলেন ছ'ফুট গভীর গর্তের মধ্যে ঘর্মাক্ত কলেবরে দাঁড়িয়ে ঝপাঝপ কোদাল মারছে লোকটা। থরসাহেবকে দেখেই দাঁত বার করে সে কি হাসি তার!

এ হাসি আবিষ্কারের হাসি! উল্লাসের হাসি! কেন না, গর্ত ঘিরে একটা লাল আর কালো স্তর দেখা যাচ্ছে। রক্তমাখা ক্ষতচিহ্নের মত ধরিত্রী ক্ষত যেন চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে কৃষ্ণ দ্বীপবাসীকে।

ছাই আর কাঠকয়লার স্তর। প্রচণ্ড উত্তাপে অথবা দীর্ঘদিন ধরে জ্বলার ফলে রক্তিম হয়ে উঠেছে ছাই! ঝোপ আর কাঠ পুড়ে কাঠকয়লা হয়ে গিয়েছে!

আর একটা গর্তের ধারে দৌড়োলেন থরসাহেব। সেখানেও সেই একই দৃশ্য। নিজের কবরখনক জোসেফ মাটি খুঁড়ছে সেখানে। তাকেও ঘিরে লাল আর কালো স্তর জেগে রয়েছে গর্তের মধ্যে। একগাল হেসে কাঠকয়লার টুকরো তুলে দেখাল জোসেফ।

এর পরের তিনটে গর্তের মধ্যেও একই দৃশ্য দেখলেন থরসাহেব। সুদূর অতীতে পরিখাই ছিল বটে। কাঠ দিয়ে বোঝাই করা ছিল। আগুনের প্রচণ্ড তাপে ছাই লালবর্ণ ধারণ করেছে।

খবর পেয়ে দৌড়ে এলেন ফাদার। হাওয়ায় সাদা আলখাল্লা লটপটিয়ে বিপুল উল্লাসে ছুটলেন এক গর্ত থেকে আরেক গর্তের কিনারায়। কিংবদন্তী

যে অলীক নয়, তাঁর অনেকদিনের অনুমান যে মিথ্যে নয়—সে প্রমাণ তাঁর চোখের সামনে।

জীপ নিয়ে বিস্ময়োল্লাসে ক্যাম্পে ফিরে এলেন সবাই। এরপর শুরু হবে ব্যাপক খননের কাজ।

পরের দিনই আরম্ভ হল পরিখার এপাড় থেকে ওপাড় পর্যন্ত আড়াআড়ি-ভাবে খোঁড়ার কাজ। স্তরে স্তরে মাটি কেটে খনকরা পৌঁছে গেল একদম তলদেশে। পাওয়া গেল আইকো পরিখার ক্রস-সেকশন।

আদিতে এ পরিখা প্রকৃতি দেবীই বানিয়েছিলেন। লাভাস্রোত বয়ে গেছিল এখান দিয়ে। জমাট লাভার চিহ্ন রয়েছে তলায়।

কিন্তু তারপরেই পরিশ্রমী মনুষ্যরা নেমেছে পরিখায়। কঠিন পাথর কেটে বানিয়েছে দু-মাইল লম্বা, বারো ফুট গভীর এবং প্রায় চল্লিশ ফুট চওড়া একটা পরিখা। তলদেশ কাটা হয়েছে আয়তাকারে। নিখুঁত পরিখা চলে গেছে সটান উত্তর থেকে দক্ষিণে—পরিখার দুই প্রান্তে খাড়াই-পাহাড়—তারপর সমুদ্র।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে নেটিভদের পানে চেয়ে রইলেন থরসাহেব। এবার হাসবার পালা তাদের। পুরুষানুক্রমে এই পরিখার অস্তিত্ব তারা শুনে এসেছে। কেমন, এখন বিশ্বাস হলো তো?

ছাই আর কাঠকয়লার মধ্যে পাওয়া গেল বিস্তর গুলতি আর বাঁকানো পাথর—পাথরের হাতিয়ার।

পরিখা থেকে বালি আর রাবিশ তুলে একদিকে উঁচু র‍্যামপার্ট বানিয়েছিল লম্বকর্ণরা দুর্গ-প্রাকারের মত। রাবিশের মধ্যে পাওয়া গেল বেত দিয়ে বোনা ঝুড়ি। অর্থাৎ এই ঝুড়ি করেই রাবিশ আর বালি তোলা হয়েছে র‍্যামপার্টে।

কিন্তু বয়স কত এই পরিখার? প্রয়োগ করা হল কার্বন 14 পদ্ধতি। প্রাচীন আগুনের কাঠকয়লার রেডিও-অ্যাকটিভিটির পরিমাপ করে সহজেই তার বয়স নির্ধারণ করা যায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কমে আসে বিকিরণ। কি হারে কমে বৈজ্ঞানিকরা তা জানেন. একেই বলে কার্বন 14 ডেটিং পদ্ধতি।

এই পদ্ধতি দিয়ে জানা গেল, সুদীর্ঘ এই উনুনে লেলিহান আগুন জলেছিল আনুমানিক ৩০০ বছর আগে—সামান্য কম অথবা সামান্য বেশী হতে পারে।

কিন্তু তার চাইতেও বিস্ময়কর তথ্য হল, পরিখাটা খনন করা হয়েছিল এবং কাঠ দিয়ে ভর্তি করা হয়েছিল তারও অনেক আগে। অনেক নিচে আগুন

জলার চিহ্ন আরো দেখা গেল। যীশুখৃষ্টের জন্মের চারশ বছর আগে প্রথম পাথর কেটে বানানো হয় এই পরিখা। সুদীর্ঘকাল ব্যবহার করা হয় নি। বালি আর রাবিশে বেশ খানিকটা ভরে এসেছিল। তারপর একদিন জহর-ব্রত সাঙ্গ হল দ্বীপে—কাঠের চিতা সাজিয়ে। চিতোর গড়ের জহরব্রত হয়েছিল অবশ্য স্বেচ্ছায়—শুধু মেয়েদের ইজ্জৎ বাঁচানোর জন্যে। ঈস্টার দ্বীপের এই চিতায় সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল দ্বীপের সমস্ত লম্বকর্ণরা। নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল নিজেদেরই শেষ কীর্তির গহ্বরে। গোটা পলিনেশিয়ায় এর চাইতে প্রাচীন কোনো বস্তুর বয়স নির্ধারণ আজও সম্ভব হয় নি।

লম্বকর্ণদের ইতিহাসে নতুন আলোকপাত সম্ভব হল এইভাবে। বিউগলয়ের মত লম্বা কানওলা বিচিত্র দানবিক মূর্তিগুলোর আরও অনেক মানে পাওয়া গেল।

অতিকায় মূর্তিগুলোর মাঝে একদিন ঘুরঘুর করছিলেন থরসাহেব। হঠাৎ ইচ্ছে হল এদের মাঝে একটা রাত কাটিয়ে যাওয়ার। অনেক ভাবনাই ঘুরছে মাথায়, ভাবনাগুলো আরও ভাল করে ভাবা যায় তারায় ছাওয়া আকাশের নিচে। স্থান মাহাত্ম্য হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হলে সেই স্থানে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করা একান্তই দরকার। অনেক অদ্ভুত জায়গায় এইভাবে ঘুমিয়েছেন থরসাহেব, ঘুমিয়েছেন স্টোনহেঞ্জের পাথুরে বেদীর ওপর, নরওয়ের সবচেয়ে উঁচু পর্বতের চূড়ায় তুষার ঝটিকার মধ্যে, নিউ মেক্সিকোর পরিত্যক্ত গুহা গ্রামের কন্দরে, লেক টিটিকাকার সূর্যদ্বীপে প্রথম ইঙ্কাদের জন্মস্থানের ভগ্নস্তূপে। এখন তাঁর ইচ্ছে হল রানো রারাকুর সুপ্রাচীন পাথর খাদের মধ্যেও ঘুমোনো যাক এইভাবে। লম্বকর্ণদের প্রেতাত্মারা এসে তাদের গুপ্তরহস্য কানে কানে বলে যাবে—এই আশা নিয়ে ঘুমোতে চান না। জায়গার পরিবেশ অস্থিমজ্জায় মিশিয়ে নিতে চান সেখানকার মাটিতে শুয়ে, ঘুমিয়ে, স্বপ্ন দেখে। বিশাল পাথর মূর্তিগুলোর ওপর উঠে পড়লেন থরসাহেব। এমন একটা জায়গায় এলেন যেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে মূর্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারপাশে। এইখানে পাহাড়ের গা থেকে একটি মূর্তিকে খোদাই করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যে শয্যায় তার জন্ম, সেখানটা খাঁ-খাঁ করছে—মাথার উপর পাহাড়ের চাঁদোয়া খাটানো যেন। থিয়েটার বক্সের মত নিরিবিলি জায়গা। বৃষ্টি পড়লেও ভিজে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, চুপ-চাপ বসে পুরো দ্বীপটাকে দেখা যায় চোখের সামনে, তখন অবশ্য আবহাওয়া চমৎকার। সূর্য সবে ডুবছে রানো রারাকু আগ্নেয়গিরির পেছন দিক দিয়ে। লাল, বেগনী এবং লাইলাক রঙের মেঘরাশিতে ছেয়ে আছে পশ্চিম দিগন্ত—

অজস্র রঙের খেলা সেখানকার খাড়াই আগ্নেয় প্রাচীরের শীর্ষে। রুপোলী সূর্য রশ্মি সমুদ্র তরঙ্গেও পড়েছে—বিরাম বিহীন ভাবে তরঙ্গ রাশি আছড়ে পড়ছে উপকূলে। দূর থেকে তরঙ্গ ভঙ্গের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। রুপোলী জলকণায় ছেয়ে আছে আগ্নেয়গিরির পাদদেশ। স্বর্গীয় এ-দৃশ্য এভাবে দূর থেকে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি থরসাহেবের। প্রকৃতির থিয়েটার বক্সে বসে প্রকৃতির লীলা দু-চোখ ভরে দেখে মুগ্ধ হলেন—আশেপাশের অগণিত প্রস্তর মূর্তিগুলো সাক্ষী রইল কেবল ক্ষুদ্র এক মনুষ্যমূর্তির বিমুগ্ধ আবেশের।

শোবার জায়গাটা সাফ করে নিলেন থরসাহেব। শক্ত ঘাসের শেকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিলেন, বালি আর ভেড়ার পুরীষ সরিয়ে ফেললেন। পাথর মূর্তির আঁতুড়ে ঘরে এত বছর পরে নিদ্রা যাবে রক্তমাংসের এক ডানপিটে মানুষ। সূর্য তখন অনেকটা হেলে পড়েছে। আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে। নিচের সমতল ভূমিতে অনেকক্ষণ ধরে গলা ছেড়ে পলিনেশীয় প্রেম-সঙ্গীত গাইছিল দুটি তরুণী। ঘোড়ায় চেপে এসেছে তারা। ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরছে আর গান গাইছে। কিন্তু অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই অদ্ভুত ছায়ামায়ায় ঢেকে গেল সুপ্রাচীন এই মূর্তিগড়ার কারখানা। সহসা গান থামিয়ে যেন ভয়েময়ে মেষপালকের কুঁড়েঘরের দিকে দৌড় দিলে মেয়ে দুটি। মেষপালক অবশ্য ঘরে নেই। অনেকক্ষণ থেকেই শুকনো ঘাসে আগুন দিয়ে বেড়াচ্ছে। এখন শুকনো ঋতু। ঘাস জ্বলে হলদে হয়ে গেছে। এই ঘাস পুড়িয়ে সবুজ ঘাসের পথ প্রশস্ত করে দিতে হবে—তবে তো ভেড়ারা খেয়ে বাঁচবে। নানান দিকে তাই ঘাস জ্বলছে। মেঘের মত ধোঁয়া ভাসছে নিভে যাওয়া আগুনের ওপর। কোথাও কোথাও এঁকে বেঁকে নিরীহ ঘাস পুড়িয়ে আগুন এগিয়ে চলেছে—যেন লকলকে জিভ মেলে আগুন ছিটিয়ে চলেছে পুরাকালের সরীসৃপ-দানব ড্রাগনেরা। অন্ধকার চেপে বসতেই ধোঁয়া আর দেখা গেল না—শুধু জেগে রইল নৃত্যপর অগ্নিশিখা। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। আশেপাশে দাঁড়িয়ে, শুয়ে, হেলান দিয়ে রইল কেবল দানবিক পাথর মূর্তিরা।

এ যেন প্রকৃতির থিয়েটার মঞ্চ। পাথর স্ট্যাচুগুলো সুমহান এক নাটকে অভিনয় করতে নেমে সহসা যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে—কার নির্দেশে তা শুধু তারাই জানে। নিচের আগুন নতুন নতুন জায়গায় জ্বলছে টুকরো টুকরো ভাবে। যেন লম্বকর্ণরা বহুবছর পরে মশাল নিয়ে তেড়ে আসছে লম্বকর্ণদের নীরব নাটক ভণ্ডুল করতে।

হঠাৎ একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় শিউরে উঠলেন থরসাহেব। স্লিপিং

ব্যাগটা ভালো করে জড়িয়ে নিলেন গায়ে।

সবে ঘুমটা আসছে, এমন সময়ে শুনলেন শুকনো ঘাসের মধ্যে দিয়ে সন্তর্পণে কি যেন এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। নির্জন পরিত্যক্ত এই পাথর খাদে তাঁর দিকে এত হুঁশিয়ার হয়ে কে এগোয়? দ্বীপবাসীদের কেউ নয়তো? পট্ পট্ শব্দ শোনা গেল ঠিক মাথার কাছে। ঘুরে গিয়ে টর্চ জ্বাললেন। দেখলেন একটা বুড়ো আঙুলের মত মোটাসোটা বিরাট আরশোলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। আলো গিয়ে পড়েছে ওপাশের দুটো শোয়ানো স্ট্যাচুর লম্বা নাকে। একটা পাথর তুলে নিলেন আরশোলা বধের জন্যে। অমনি দেখলেন ঠিক পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে আর একটা আরশোলা। তার পাশে আর একটা আরো· · আরো। টর্চ ঘুরিয়ে দেখলেন, শুধু মাথার কাছে নয়—পাশে, পায়ের কাছে, মাথার ওপরে পাথরে, এমন কি স্লিপিং ব্যাগের ওপরেও উঠে পড়ে তাঁর দিকে লম্বা শুঁয়ো নাড়ছে দুটো বদখৎ আরশোলা। ঈস্টার দ্বীপে এতদিন কাটালেন, কিন্তু এরকম হৃষ্টপুষ্ট বদাকার আরশোলা কখনো দেখেন নি। পঙ্গপালের মত তারা ছেঁকে ধরেছে তাঁকে।

ঠিক এই সময়ে টর্চ গেল নিভে। ঝাঁকানি দিয়ে কোনোমতে ম্যাড়-মেড়ে আলো বার করলেন। হঠাৎ দারুণ চমকে উঠলেন ম্লান আলোয় পাথরের বুকে একটা বিকট মুখ দেখে। ভাঁটার মত ড্যাবডেবে দুটো চোখ নিষ্পলক।

পরক্ষণেই বুঝলেন কল্পনাশক্তির বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। মূর্তিটা পাথরে খোদাই করা ছিল। দন্তহীন মাড়ি বার করে হাসছে যেন তাঁর দিকেই চেয়ে। টর্চের ম্লান আলোয় এতক্ষণে চোখে পড়েছে।

বাইরে তখন ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আলো কমে আসতেই বেপরোয়া আরশোলারা তাঁর মুখেও শুঁড় বুলোতে আরম্ভ করেছে।

ক্ষেপে গেলেন থরসাহেব। পাথরের একটা শাবল তুলে নিয়ে বেধড়ক মারলেন বেশ কিছু ছ-পেয়ে আততায়ী। কিন্তু কত মারবেন? পালে পালে আসছে তারা জবর দখলকারীর সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে, শুধু তাই নয়, মৃত জাতভাইদের উদরে পুরতেও ব্যস্ত হয়েছে তারা। ভীড় ক্রমশঃ বাড়ছে।

এতো মহাজ্বালা! মাথার উপর স্লিপিংব্যাগ টেনে এনে ঘুমোতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু শক্ত পাথর গায়ে ফোটায় ঘুম এল না। এত শক্ত পাথর খোদাই করা কি কম কথা। জাহাজের স্কীপার ছেনি হাতুড়ি দিয়ে আধঘন্টার পরিশ্রমে মাত্র মুঠোখানেক পাথর খসাতে পেরেছিল। হিসেব করে দেখেছেন

থরসাহেব, শুধু একটা চাতাল থেকেই সাত লক্ষ ঘন ফুট পাথর কেটেছে পুরাকালের ভাস্কররা, কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। পুরাতত্ত্ববিদরা অবশ্য বলেছে হিসেবটা অসম্পূর্ণ—পাথর কাটা হয়েছে তারও বেশী। পাথরের শাবলটা তুলে নিয়ে গায়ের জোর দিয়ে পাথরে মারলেন থরসাহেব। এক চিলতে পাথরও খসাতে পারলেন না—ধুলোর একটু স্তর কেবল ঝরে পড়ল। কত শক্তি থাকলে লক্ষ ঘনফুটেরও বেশী পাথর কেটে মূর্তি গড়া যায়? চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কী? সেকালের মত একটা স্ট্যাচু গড়া যাক—দেখা যাক কত ধানে কত চাল।

নিচের প্রান্তরে আগ্নেয় হ্রস্বকর্ণ নরখাদকদের মশাল নিভে এসেছে। কিন্তু থরসাহেবের চারপাশে তখন মহা উল্লাসে লম্বকর্ণদের শাবলে নিহত জাতভাইদের খাচ্ছে ছ পেয়ে স্বজাতি মাংস ভোজীরা। রেগেমেগে সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন থরসাহেব।

ঘুম ভাঙল ভোরবেলা। নিচের কলুষ প্রান্তর দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। আশেপাশে নিহত আরশোলাদের কেবল পাখনা আর ঠ্যাং দেখে বুঝলেন গতরাতে স্বপ্ন দেখেন নি—আরশোলাদের আক্রমণ মিথ্যে নয়।

ঘোড়ায় চেপে ফিরে এলেন গ্রামে। ফাদার সিবাসটিয়ান মুচকি হাসলেন তাঁকে দেখে। প্রস্তর স্ট্যাচুদের মাঝে লিলিপুটের মত শোওয়ার বাসনা তাঁর কানেও গিয়েছে।

কিন্তু যখন শুনলেন, থরসাহেব লম্বকর্ণ স্টাইলে একটা স্ট্যাচু বানিয়ে দেখতে চান, লাফিয়ে উঠলেন পাদরীসাহেব। রানো রারাকুর নিচাল কোনো অঞ্চলে পাথর কাটলে তাঁর আপত্তি নেই—দূর থেকে দেখে পাহাড়ের দৃশ্য পালটেছে এমন ধারণা যেন কারও না হয়।

থরসাহেবের মাথায় কিন্তু আরো উদ্ভট প্ল্যান ঘুরছে। পাথর-খাদে রাত কাটিয়ে এসে মাথা বিগড়েছে নাকি? স্ট্যাচু তিনি তাঁর লোকজন দিয়ে গড়বেন না—দ্বীপবাসীদের গড়তে হবে—যেমনভাবে গড়েছিল তাদের পূর্বপুরুষরা এককালে। ফাদার তো দ্বীপের লোকেদের ঠিকুজী কোষ্ঠীর খবর রাখেন। বলতে পারেন লম্বকর্ণদের সরাসরি বংশধর কেউ আছে কিনা ঈস্টার দ্বীপে?

নিশ্চয় জানেন ফাদার। এ সম্পর্কে একটা কেতাবও ছেপেছেন। ঈস্টার দ্বীপের প্রতিটি মানুষের বংশগতি তাঁর নখদর্পণে।

তাই বললেন—হ্রস্বকর্ণরা যাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তার সরাসরি বংশধর একটা ফ্যামিলির বড়ছেলেকে আপনিও চেনেন।'

'কে বলুন তো?'

'মেয়র পেড্রো আতান। চুলের মুঠি ধরে যাকে টেনে এনে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল হ্রস্বকর্ণ কনের সঙ্গে, তার নাম ওরোরোইনা, গত শতাব্দীতে খৃষ্টধর্ম দ্বীপে প্রচারিত হলে, তার বংশ পদবী হয় আদম। ইস্টার দ্বীপের উচ্চারণে আদম হয়ে দাঁড়িয়েছে আতান। এই ফ্যামিলিরই বড় ছেলে পেড্রো আতান।'

'বলেন কী।'

'হ্যাঁ। সঙের মত মনে হলেও মেয়র নির্বোধ নয়।'

'কিন্তু তাকে তো দ্বীপের নেটিভ বলে মনে হয় না। ঠোঁট পাতলা, সরু ধারালো নাক, হাল্কা রঙের চামড়া...'

'কিন্তু গায়ের রক্ত খাঁটি নেটিভ। এরকম রক্তের মানুষ ৮০/৯০ জন আছে দ্বীপে। মেয়র কিন্তু বাপের দিক দিয়ে খাঁটি লম্বকর্ণ।'

তৎক্ষণাৎ ঘোড়া হাঁকিয়ে মেয়রের বাড়ী গেলেন থরসাহেব। সাদা রঙ করা কাঠের কেবিন—গাছ আর ঝোপের মধ্যে অর্ধেক ঢাকা।

ছোট্ট একটা দাবার ছকের সামনে বসেছিল মেয়র। খুঁটিগুলো স্ট্যাচু, পাখিমানুষ এবং দ্বীপের অন্যান্য কৌতূহলোদ্দীপক বস্তুর অনুকরণে নির্মিত।

'সিনর, আপনার জন্যেই বানালাম।'

'মেয়র ডন পেড্রো, আপনি খাঁটি আর্টিস্ট।'

'তা তো বটেই। দ্বীপের সবসেরা আর্টিস্ট।'

'আপনি লম্বকর্ণও বটে—সত্যি?'

'সত্যি,' ভীষণ গম্ভীর হয়ে সায় দিল মেয়র। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সৈনিকের কায়দায় দু-পা জুড়ে দাঁড়িয়ে বুক ঠুকে বললে—'আলবৎ আমি লম্বকর্ণ। খাঁটি লম্বকর্ণ।' গর্বে যেন বুক দশ হাত হল বলতে বলতে।

'তাহলে বলুন তো স্ট্যাচুগুলো কাদের তৈরী?'

'লম্বকর্ণদের।'

'দ্বীপের অনেকেই কিন্তু বলে হ্রস্বকর্ণরা বানিয়েছে।'

'কাঁচা মিথ্যে বলে। লম্বকর্ণদের কৃতিত্ব সইতে পারে না বলেই বলে। এ দ্বীপের যা কিছু সৃষ্টি দেখছেন—সব লম্বকর্ণদের জন্যে। তারাই সব গড়েছে। স্ট্যাচুগুলোর কান লম্বা তো ঐ জন্যেই। দলপতিদের মূর্তি বানিয়ে রেখেছে পাথর কেটে।'

উত্তেজনায় ঠোঁট কাঁপতে লাগল মেয়রের। উত্তাল হল বুক।

থরসাহেব বললেন—'যে যাই বলুক, আমার বিশ্বাস কিন্তু লম্বকর্ণরাই

বানিয়েছে এত মূর্তি। ঠিক এই রকম একটা মূর্তি বানাতে চাই আমি। আমার ইচ্ছে, শবরদের হাতেই তৈরী হোক সেই মূর্তি। আপনি কি বলেন ?'

শুনে থ হয়ে গেল মেয়র। কিছুক্ষণ আর কথা নেই মুখে। তারপর বুক টান টান করে বললে—'হয়ে যাবে, সিনর, কত বড মূর্তি চান বলুন।'

বেশী বড নয়, মাঝারি সাইজের। পনেরো থেকে বিশ ফুটের মধ্যে।'

'ছ-জন লাগবে। আমরা চার ভাই আছি। মায়ের দিক থেকে লম্বকর্ণ কিছু আছে যারা—তাদের মধ্যে থেকে দুটিয়ে নেব বাকী দুজন।'

'চমৎকার।'

সোজা গভর্নরের কাছে গেলেন থরসাহেব। মেয়রের ডিউটি থেকে সাময়িক অব্যাহতি পেল মেয়র। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে রানো রারাকুতে মূর্তি গড়ার অনুমতি দিলেন গভর্ণর।

কাজ যেদিন শুরু হবে, তার আগের দিন খাবারদাবার প্রস্তুত রাখতে বলেছিলেন থরসাহেব। মূর্তি গড়ার হুকুম দিয়েছেন তিনি। কাজেই রীতি-মাফিক কারিগরদের খানা সরবরাহ করার দায়িত্ব তাঁর। কিন্তু সারাদিন গেল—কেউ এল না খাবার নিতে। রাত হল। একে-একে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল সবাই। তাঁবুতে দুজন সঙ্গী নিয়ে জেগে রইলেন কেবল থর-সাহেব—ডুবে রইলেন লেখার মধ্যে।

আচমকা শুনলেন অদ্ভুত এক। গানের সুর। ক্ষীণ, গুঞ্জনধ্বনির মত গান গাইছে কারা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল গানের শব্দ। তাঁবুর চৌহদ্দির মধ্যেই গলা মিলিয়ে কারা যেন গান গাইছে। সেই সঙ্গে শুরু হল থপ্-থপ্-থপ্-থপ্ শব্দ। তালে তাল মিলিয়ে মাটিতে পা ঠোকার শব্দ। হতভম্ব হল দুই সঙ্গী। রোমাঞ্চিত হলেন থরসাহেব। পলিনেশিয়ায় অনেকদিন থেকে অনেক অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন, কিন্তু এমন ধারা গান তো কখনো শোনেন নি। তাঁবুর জীপার চেনে খুলে বেরিয়ে এলেন বাইরের অন্ধকারে। পায়-জামা পরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল ফটোগ্রাফারও। আশপাশের তাঁবুগুলো থেকেও একে-একে জ্বলে উঠল আলো।

মেস-তাঁবুর মশারার মধ্যে দিয়ে আবছা আলো গিয়ে পড়েছিল ক্যাম্পের মাঝের চত্বরে। গুঁড়িসুড়ি করে কয়েকটি বিচিত্র মূর্তি বসে আছে সেখানে। অদ্ভুত বাঁকানো রণ গদা দিয়ে মাটি পিটছে তালে তালে, মাথার ওপর নাচাচ্ছে পাথরের শাবল। প্রত্যেকের মাথায় পাতার মুকুট। দুটি ছোট্ট মূর্তির মুখ ঢাকা কাগজের মুখোশে—পাখীমানুষের মুখোশ। ড্যাবডেবে চোখ আর

ঠেলে বেরিয়ে আসা চক্ষু, দেখলে গা শিরশির করে ওঠে। এই দুজন মাথা হেলিয়ে তাল ঠুকছে—অন্য সবাই গান গাইছে তালে তাল মিলিয়ে, পা ঠুকছে মাটিতে। গানের সুরে যেন সম্মোহনের জাদু। মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হয়ে আসে, লুপ্ত দুনিয়ার স্তোত্রপাঠ বলা চলে। সম্মিলিত পুরুষ কণ্ঠের মধ্যে একটা চড়া তীক্ষ্ণ স্বর শিহরণ জাগাচ্ছে লোমকূপে অপার্থিব কোরাস সঙ্গীতের চূড়ান্ত সম্মোহনী শক্তি প্রকট হচ্ছে তীক্ষ্ণ তীব্র একক কণ্ঠস্বরে। আলোয় চোখ সয়ে যাওয়ার পর ধরসাহেব দেখলেন, এ স্বর বেরোচ্ছে একজন বুড়ির গলা থেকে। থুত্থুড়ে বুড়ি। শুকনো বাঁশের মত খটখটে।

লঘুভাব চিহ্ন নেই কারো মধ্যে—সিরিয়াস প্রত্যেকেই। গান আর থামে না—চলছে তো চলছেই। তাঁবুর মধ্যে থেকে আলো নিয়ে বেরিয়ে এল ধরসাহেবের একজন অনুচর, সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হল গান। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে একযোগে বলল সবাই—'না…না।' আলো নিয়ে তাঁবুর মধ্যে অন্তর্হিত হল অনুচর। আবার শুরু হল সঙ্গীত। শুরু করল একজন, ধুয়ো ধরল বাকী সবাই—শেষ টান দিলে বুড়িটা। শুনতে শুনতে ধরসাহেবের মনে হল, যেন তিনি সাউথ-সী আয়ল্যাণ্ডে আর নেই—বসে আছেন নিউ মেক্সিকোর পুয়েবলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে। ঠিক এই সুরে এইভাবে চেতনা আচ্ছন্ন করা হিপনোটিক গান গায় তারা। পুরাতত্ত্ববিদরাও সায় দিলেন ধরসাহেবের কথায়।

অবশেষে স্তব্ধ হল রোমাঞ্চকর সঙ্গীত। রান্না-তাঁবুতে গিয়ে একথালা সন্দেশ এনে দিলেন ধরসাহেব। থালা হাতে নিয়ে অন্ধকারে উধাও হল বুড়ি এবং অন্যান্য সবাই। মুখে মুখোশ আঁটা মূর্তি দুটোকে এবার ভাল ভাবে দেখতে গেলেন ধরসাহেব। দুটি বাচ্চা। হাবভাব কিন্তু বড়দের মত।

শূন্য থালা হাতে উৎকণ্ঠ গম্ভীর মুখে একটু পরেই ফিরে এলেন মেয়র। মাথা ঘিরে তখনো রয়েছে ঝাউয়ের মুকুট। হেসে গানের তারিফ করলেন ধরসাহেব। মুখের একটা পেশীও কিন্তু কাঁপালো না মেয়র।

বললে—'এ-গান খুব প্রাচীন গান। পাথর কাটার গান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা আতুয়া-কে খুশী করবার জন্যে গাওয়া হত এই গান। দেবতা তুষ্ট হলে কাজ ভাল হত—বরাত খুলে যেত।

স্তুতি-গানই বটে। ধরসাহেবদের তুষ্ট করার জন্যে গাওয়া গান হয়। দৈবাৎ তাঁরা শুনেছেন—কেন না মূর্তি গড়ার নির্দেশ তাঁরাই দিয়েছেন—নইলে এ গান শোনার কথা তাঁদের নয়—দেবতার উদ্দেশে মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়া এ-গান ইতিপূর্বে গোটা পলিনেশিয়ায় কখনো শোনেন নি ধরসাহেব।

সাউথ-সায় কোনো দ্বীপের প্রাচীনত্বকে আঁকড়ে ধরে কেউ আর নেই। টুরিস্টরা গেলে বড়জোর খড়ের স্কার্ট পরে আসে মেয়েরা। নাচে হুলা অথবা শোনায় এমন সব কিংবদন্তী যা শ্বেতকায়দের লেখা বই পড়ে শেখা। কিন্তু নিজেদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির এই ধরনের আদর, এই ধরনের অন্তর থেকে দেবতা-বন্দনা, প্রাণ ঢেলে ঈশ্বর আরাধনা এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলেন একটেরে ঈস্টার দ্বীপের এই মানুষদের কাছে।

থরসাহেব একটু ঠাট্টাতামাসা করে আবহাওয়া লঘু করবার চেষ্টা করলেন। মেয়র গম্ভীর মুখে তার হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে শুধু বললে— 'দেবতাকে খুশী করার জন্যে এ-গান আমাদের পূর্বপুরুষেরাও গেয়েছে। আতুয়া খুশী হলেই মূর্তি গড়া সম্ভব হবে। বিষয়টা তাই জানবেন গুরুতর।'

দলবল নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়র। গেল হোতু মাতুয়ার গুহার দিকে। সেখানেই আজ রাতটা কাটাতে হবে ওদের।

পরের দিন সকালে রানা রারাকুর পাথর-খাদে গেলেন সবাই। মেয়র তার পাঁচ লম্বকর্ণ সাগরেদকে নিয়ে আগেই হাজির হয়েছে। ঘুরে ঘুরে পুরোনো পরিত্যক্ত পাথরের শাবল জোগাড় করছে। পাথরের চাতালে, মাটিতে এবং মাটির তলাতে শয়ে শয়ে পড়ে আছে এমনি শাবল— যেন ছুঁচোলো দানবিক দন্ত। থরসাহেব যে বারান্দায় ঘুমিয়ে গেছেন, সেখানকার পাশের চ্যাটালো দেওয়ালটা নিচ থেকে চোখে পড়ে না। প্রাচীন ভাস্কররা পাহাড় খুবলে বিরাট একটা চাঁই কেটে বার করে নিয়েছে। চ্যাটালো এই দেওয়াল কেটেই গড়তে হবে নতুন মূর্তি। আরও অনেক খোঁদলের চিহ্ন রয়েছে সেখানে—যেন ধারালো দাঁতে কামড়ের পর কামড় বসানো হয়েছে কঠিন পাথরের গায়ে। লম্বকর্ণ ছ-জন কিন্তু জানে ঠিক কোন খান থেকে কাজ শুরু করতে হবে। প্রত্যেকেই পাশে রেখেছে লাউয়ের খোলার পাত্র বোঝাই জল। চ্যাপ্টা দেওয়ালের সামনে সারি সারি সাজিয়ে রেখেছে পাথরের শাবল। গত রাতের ঝাউয়ের মুকুট মাথায় পরে নিল মেয়র। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল সব ঠিক আছে কিনা। তারপর চ্যাপ্টা দেওয়ালের খানিকটা অংশ দু-হাত দু পাশে ছড়িয়ে আর আঙুল দিয়ে মেপে নিল। কাঠের মূর্তি খোদাই করে তো, আনুপাতিক মাপ কি হবে, তা জানা আছে। পাথরের গায়ে দাগ দিলে কয়েক জায়গায় পাথরের শাবল দিয়ে। কিন্তু কাজ শুরু না করে বিনীতভাবে থরসাহেবের কাছে মাপ চেয়ে নিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গসহ উধাও হল ঠেলে বেরিয়ে আসা একটা পাথরের আড়ালে।

আর একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে নিশ্চয়। আগ্রহে প্রতীক্ষায় রইলেন থরসাহেবরা। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল ছ-টি সাঁচু। মুখ পাথরের মত কঠিন, হাতে পাথরের শাবল। সার বেঁধে দাঁড়াল চ্যাটালো দেওয়ালের সামনে। দু-হাতে শাবল বাগিয়ে ধরল এমন ভঙ্গিমায় যেন ছোরা ধরে আছে—শাবল নয়। তারপর, মেয়রের সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করল গত রাতের বন্দনা সঙ্গীত। গানের তালে তালে ঠকাং ঠকাং করে কোপ মেরে চলল কঠিন পাথরে। সঙ্গীত এবং দৃশ্য—দুটোই সমান ফ্যানট্যাসটিক। একই সঙ্গে যেন বল্লমের ঘা পড়ছে পাথরে—শাবল উঠছে আর নামছে—গান কিন্তু থামছে না—সুর কেটে যাচ্ছে না। প্রতিধ্বনি ফিরে ফিরে আসছে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে। থরসাহেবরা যেন সম্মোহিত হয়ে গেলেন। পাথর মত দাঁড়িয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে রক্ত গরম হয়ে যাচ্ছে গায়কদের। সাবন্দী ছ-জনের একদম শেষে শাবল মারছিল এক বৃদ্ধ। উত্তেজনায় সে নেচে নেচে উঠছে, নিতম্ব দুলিয়ে গান গেয়েই শাবল হাঁকড়াচ্ছে। চোটের পর চোট শাবল যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন পাহাড়ের গা। কিন্তু যত কঠিনই হোক, শাবলের ছুঁচোলো ডগার ঘায়ে হার মানতেই হবে। পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকির সংঘর্ষ নিনাদে পুরো অঞ্চলটা যেন কাঁপছে থর থর করে। বহু শতাব্দী পর এই প্রথম রানো রারাকুতে আবার শাবল পড়ছে পাহাড়ের গায়ে।

আস্তে আস্তে থেমে এল বন্দনা সঙ্গীত। শাবলের মার কিন্তু থামল না। এতটুকু শব্দ হল না। পূর্বপুরুষরা যে কারুশিল্প বর্জন করতে বাধ্য হয়েছিল, ছ-জন বংশধর অসমাপ্ত সেই মহাকর্ম সমাপ্ত করার ব্রতে ব্রতী হয়েছে। বেশ কয়েকবার চোট মারা সত্ত্বেও পাথরের চাকলা তোলা যাচ্ছে না। গুঁড়োর স্তর ঠিকরে যাচ্ছে—তার বেশী নয়। কিন্তু হতোদ্যম হচ্ছে না কেউই। পাথর হার মানবেই—যেমন মেনেছিল তাদের পূর্ব পুরুষদের বাহুবল আর মনোবলের কাছে। এই প্রেরণাই অমানবিক শক্তি জুগিয়েছে ওদের দেহে মনে। বিরামবিহীন ভাবে শাবল চালানোর ফাঁকে ফাঁকে লাউয়ের খোলা থেকে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে শাবলের ঘা যেখানে পড়ছে—সেইখানে।

এইভাবেই গেল প্রথম দিনটা। রানো রারাকুর সর্বত্র শোনা গেল শাবল হাঁকড়ানোর ঠকাং ঠকাং আওয়াজ। নিস্পন্দ প্রস্তর-মূর্তিরা উল্ল-সিত হল কিনা, ঈশ্বর জানেন। থরসাহেবের কানে কিন্তু জড়িয়ে রইল পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকির বিচিত্র ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির শব্দলহরী। শুতে

যখন গেলেন, তখনও যেন শুনতে পেলেন ঈস্টার দ্বীপের আকাশ বাতাস বহু যুগের ওপার হতে ফিরে আসা শব্দলহরীর স্মৃতিরোমন্থনে পরম-শিহরিত —যদিও শব্দ থেমে গিয়েছে অনেক আগে। বানো রারাকু আবার নিস্তব্ধ হয়েছে। শ্রান্ত, ক্লান্ত মেয়র সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে হোতু মাতুয়ার গুহা-নিবাসে রাত্রি যাপন করতে গিয়েছে। এক বুড়ি বারবেকোস রোস্ট মাংস, আর থলি বোঝাই রুটি চিনি আর মাখন দিয়ে এসেছে। পেট ভরে খেয়ে সুখস্বপ্নে মগ্ন হয়েছে লম্বকর্ণরা।

পরের দিন এবং তারও পরের দিন কাজ অব্যাহত রইল পাথর-খাদে। ঘেমে নেয়ে গেল ছ জন লম্বকর্ণ। তৃতীয় দিনে দানো মূর্তির পার্শ্ব-রেখা সুস্পষ্ট হল চ্যাটালো দেওয়ালের বুকে। মুখের কাছে ওপর থেকে নিচে লম্বালম্বি পাথর কাটা হল প্রথমে—তারপর লম্বালম্বি খাতের বাঁদিকে আড়াআড়িভাবে অল্প অল্প পাথর খসিয়ে আনা হল। মাঝে মাঝে ছিটিয়ে দেওয়া হল জল। আবার শাবলের ঘা পড়ল। আবার পাথর খসে এল, আবার জল ছিটিয়ে দেওয়া হল। শাবলের ডগা ভোঁতা হয়ে যেতেই ফেলে দিয়ে তুলে নিলে নতুন শাবল। পাথর-খাদে এত শাবল পড়ে থাকার এক টাই ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিল আগের তত্ত্বানুসন্ধানীরা—তারা ভেবেছিল শাবল বরবাদ হয়ে গেছে বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা যে ভুল, তা প্রত্যক্ষ করলেন থরসাহেব। ভোঁতা শাবল বাগিয়ে ধরে ছুঁচোলো শাবলের ডগায় দমাদম করে এমন ঘা মারছিল মেয়র, যে ভোঁতা মুখের পাথর কুচি ছিটকে ফের নতুন হয়ে যাচ্ছিল। ফেলে দেওয়া প্রতিটা শাবল। ছুরি দিয়ে পেন্সিল সরু করার মতই অতি সহজে কাজ সারছিল মেয়র।

এ থেকে বোঝা গেল, পাথর-খাদের সব শাবলকেই কাজে লাগানো হয়েছে এক সঙ্গে। কিন্তু একটার পর একটা একাধিক মূর্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে প্রতি ভাস্করকে। ভাস্করের সংখ্যা নিশ্চয় খুব বেশী ছিল না। পনেরো ফুট সাইজের একটা মাঝারি স্ট্যাচু গড়তে দরকার ছজনের। এই কারণেই এক সঙ্গে এত স্ট্যাচু নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক স্ট্যাচু খোদাই করে গেছে শ দুই কারিগর। তা ছাড়া, বেশ কিছু স্ট্যাচু শিল্প সংক্রান্ত কারণে অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে— দ্বীপ জুড়ে কাজ বন্ধ হওয়ার অনেক আগেই। পাথরের মাঝে জঘন্য ফাটল দেখা দিয়েছে, অথবা চকমকি পাথরের মত কঠিন কালো পাথর পাওয়া গিয়েছে— শাবল দিয়ে তার গায়ে আঁচড়ও ফেলা যায় নি। অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে স্ট্যাচুটি—নাকে চিবুকে আঁচিলের মত আকাটা পাথর তাই আজও দেখা যায়।

পাথর কাটার কলাকৌশল হাতেনাতে দেখল মেয়র। কিন্তু থরসাহেবের মাথা ঘুরে গেল সময়ের হিসেব কল্পনা করে। মিসেস রাউটলেজ আঁচ করেছিলেন, বড় জোর পনেরো দিন লাগা উচিত একটা স্ট্যাচু খোদাই করতে। যেহেতু আঁচ করেছিলেন, তারও কম সময়—কেন না, 'নরম পাথর' কাটতে বেশী সময় লাগা উচিত নয়। কিন্তু কেউই প্রথম স্প্যানিয়ার্ডদের মত গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে গাঁইতির ঘা মারেন নি পাথরে। স্ফুলিঙ্গ ছিটকে গিয়েছিল গাঁইতির ঘায়ে। এ পাথর বাইরে খানিকটা কঠিন, ভেতরেও তাই বৃষ্টির জল বাইরের পাথরকে নরম করতে পারে নি ভেতরেও নরম পাথরের সব দেই।

তৃতীয় দিনের থেকে কাঁটা পাল লম্বকর্ণদের কাজে। ক্ষত বিক্ষত এবং খুলে ঢোল আঙুল নিয়ে সবাই দেখার করল থরসাহেবের কাছে। চেঁচালি আর বাটালি দিয়ে কাঠের স্ট্যাচু খুদে অভ্যস্ত ওরা। কিন্তু খোদাই অর্থাৎ স্ট্যাচু শিল্পীর কাজে ওরা অভ্যস্ত নয়। তারা কাঠের স্ট্যাচু খুদে যেতে পারে দিনের পর দিন, পাথরের স্ট্যাচু নয়—সে কাজ পারত তাদের পূর্বপুরুষরা। ঘাসের ওপর বসে পড়ে ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করে দেখলেন থরসাহেব। হাত লাগাল মেয়রও। দেখালেন ছ-জন লোকের দুটো দল পালা করে দিনেরাতে কাজ করে গেলে একটা মাঝারি সাইজের স্ট্যাচু খোদাই করতে এক বছর লাগবে। এ হিসেব মেয়রের। কিন্তু ঢ্যাঙা বুড়োটা বললে, পনেরো মাস। থরসাহেবের লোকজনের হিসেব মিলে গেল মেয়রের হিসেবের সঙ্গে। এক বছরই লাগবে একটা স্ট্যাচু গড়তে। তারপর আছে স্ট্যাচু নিয়ে যাওয়ার সমস্যা।

প্রাচীন ভাস্করা ঝামা পাথর ফেলে গেছিল পাথর-খাদে। এই ঝামা-পাথর দিয়ে অসমাপ্ত স্ট্যাচুটাকে পালিশ করে আঙুল এবং মুখের অংশ বিশেষ ফুটিয়ে তুলে মজা করে গেল ছয় লম্বকর্ণ।

সন্ধ্যে হতে হোতু মাতুয়ার গুহায় গেলেন থরসাহেব। তখন চাঁদ উঠেছে আকাশে। গুহার মধ্যে নলখাগড়ার মাদুরে বসলেন। মেয়র সাঙ্গপাঙ্গ সহ বাটালি দিয়ে কাঠ চেঁচে স্ট্যাচু গড়ছিল। সঙ্গীরা হাঙরের সাদা পাঁজরার হাড় দিয়ে তৈরী চোখ বসাচ্ছিল স্ট্যাচুর চক্ষু কোটরে। আর একজন কালো আগ্নেয় পাথর অবসিডিয়ান বসিয়ে বিদঘুটে স্ট্যাচুগুলোর মাথাটাকে আরো বিদঘুটে করে তুলছিল, বুড়িটা বসে বসে বুনছে একটা টুপি, এককোণে আগুনের ওপর জল ফুটছে কেটলিতে।

থরসাহেব বললেন—'তোমরা কি কখনো হাত থামাতে পার না?'

মেয়র বললে—'আমরা লম্বকর্ণরা বিশ্রাম কাকে বলে জানি না। অনেক রাত গেছে না ঘুমিয়ে কাজ করে গেছি।' বুড়ি একটা টিন বার করল। তলাটা দাবানো। সেখানে ভেড়ার চর্বি রেখে পলতে লাগিয়ে ধরিয়ে দিল। ঠিক এই কায়দায় সেকালে ইস্পাব দ্বীপবাসীরা পাথরের প্রদীপ জ্বালত গুহার মধ্যে। খুব একটা দরকার না হলে অবশ্য জ্বালত না। পাছে শত্রু দেখে ফেলে, তাই অন্ধকারে থাকত।

মেয়র বললে—'অন্ধকারে থেকে থেকে চোখের জ্যোতি বেড়ে গিয়েছিল লোকদের। আজকাল প্যারাফিন লম্ফ জ্বালিয়ে চোখের সেই ক্ষমতা আমরা হারিয়েছি—অন্ধকারে আর দেখতে পাই না।'

কথায় কথায় অনেক প্রসঙ্গই এসে গেল আলোচনার মধ্যে। সেকালের যোদ্ধারা নাকি চিৎ হয়ে আজকালকার মানুষদের মত ঘুমোতো না। উবু হয়ে বসে বুক রাখত মেঝেতে, কপাল রাখত মুঠো করা দুই হাতের ওপরে—মুঠোয় থাকত পাথরের অস্ত্র। মুখ ফেরানো থাকত গুহামুখের দিকে। অতর্কিতে আক্রান্ত হলে ঐ অবস্থাতেই ছিটকে যেত সামনে বিরাট লাফ দিয়ে। 'স্ট্যাচু ছোঁড়াছুঁড়ির যুগ' শুরু হওয়ার আগে এইভাবে শয়নে স্বপনে আত্মরক্ষার জন্যে তৈরী থাকত লম্বকর্ণরা। যদিও তারা যুদ্ধবিলাসী নয়। আইকো পরিখায় লম্বকর্ণরা পুড়ে ছাই হবার পর হ্রস্বকর্ণরা যখন জায়গাজমি নিয়ে মারপিট লাগালো নিজেদের মধ্যে 'স্ট্যাচু ছোঁড়াছুঁড়ির যুগ' শুরু হল ঠিক তখনি। অন্যের এলাকায় ঢুকে সেখানকার স্ট্যাচু উল্টে দিত হ্রস্বকর্ণরা।

মেয়রের স্মৃতিশক্তির তারিফ না করে পারলেন না থরসাহেব। ঊর্ধ্বতন দশম পুরুষের নাম তার মখস্থ-ওরোরোইনা অবধি। সুতরাং লম্বকর্ণ বলে তাকে মেনে নিতেই হবে। ফ্যামিলির বড় ছেলে বলেই যে সে দ্বীপের মেয়র হয়েছে, তা নয়। তার ব্রেন আছে যা ফ্যামিলির আর কারো নেই, বয়স তার কম—কিন্তু তবুও বয়স্ক সেজে থাকে বয়স্কর কথা সবাই মান্য করে বলে।

হ্রস্বকর্ণদের হাতে লম্বকর্ণরা নিকেশ হওয়ার আগে এবং 'স্ট্যাচু ছোঁড়াছুঁড়ির যুগ' শুরু হওয়ার আগে আর কি ঘটেছিল, তা জানবার চেষ্টা করলেন থরসাহেব কিন্তু কিছুই জানা গেল না। ওরোরোইনা তাদের পূর্বপুরুষ—তার আগে কি ঘটেছে তার বিশদ বিবরণ জানা নেই, দ্বীপ যখন আবিষ্কৃত হয়, হোতু মাতুয়ার সঙ্গে এসেছিল লম্বকর্ণরা—এ-তত্ত্ব তারা জানে। কিন্তু এ-দাবী হ্রস্বকর্ণদেরও—স্ট্যাচু গড়ার কৃতিত্ব যেমন দাবী করে—ঠিক সেইভাবে। কিন্তু হোতু মাতুয়া পশ্চিম থেকে এসেছিল না

পূব থেকে এসেছিল, তা কেউ জানে না। একজন বললে, হোতু মাতুয়ার আবির্ভাব নাকি অস্ট্রিয়া থেকে। কিন্তু কেউ সমর্থন করল না তার কথা—সে নাকি শুনেছে একটা জাহাজের ডেকে নাবিকদের মুখে। মেয়র কিন্তু উত্তেজিত হল বিশ্বাসঘাতিনী সেই মেয়েটার কথা প্রসঙ্গ আসতেই—যে মেয়ে ঝুড়ি বোনার সংকেতে হ্রস্বকর্ণদের ডেকে এনেছিল দ্বীপের মালভূমিতে—বলতে বলতে চোখে জল এসে গেল তার।

বললে—'খুব সুন্দর মানুষও ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে। কেউ ছিল কালো, কেউ দারুণ ফর্সা। মাথার চুল পাতলা—মূর্তির মুখেও যেমন দেখা যায়। শ্বেতাঙ্গ হলেও তারা ছিল খাঁটি ঈস্টার দ্বীপবাসী। এ-রকম সাদা মানুষ আমাদেরও বংশে ছিল। এদের আমরা বলতাম 'ওহো-তিয়া' অর্থাৎ চুল যাদের হাল্কা। আমার মা আর মাসী ছিনর কোনটাইকির চেয়েও ছিল ফর্সা।'

ফোড়ন দিলে একজন—'আরও লালচে।'

মেয়র বললে—'আমার মেয়ের চুল ছিল টকটকে লাল, চামড়া ধবধবে সাদা। আমার ছেলের গায়ের রঙ দুধের মত সাদা। ও হলো ওরোরোইনার দ্বাদশ বংশধর—আমি একাদশ। আমার গায়ের রঙ অত সাদা নয়।'

কথাটা ঠিক। স্ট্যাচুগুলোর চুলও তো লাল পাথর দিয়ে বানানো।

দিন কয়েক পরের ঘটনা। ক্যাম্পের সামনে মেয়রকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন থরসাহেব। এইমাত্র খবর এসেছে, ভিনাপুতে নেটিভরা পুরোনো কায়দায় একটা বিরাট পাথরের চাঁই তুলে স্বস্থানে বসিয়েছে। কায়দাটা পুরুষানুক্রমে এরা তাহলে জানে? একই কায়দায় ত হলে একটা স্ট্যাচু খাড়া করা যাবে না কেন?

'মেয়র ডন পেড্রো, আপনি তো লম্বকর্ণ, মূর্তি খাড়া করা যায় কিভাবে জানেন?'

'জলের মত সোজা। কিচ্ছু না।'

'বলেন কী? ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের অন্যতম বিরাট রহস্যকে বলছেন 'কিচ্ছু না''

'আমি জানি কি করে 'মোয়াই' খাড়া করতে হয়।'

'আপনি পারবেন?'

'নিশ্চয়।'

'কে শিখিয়েছে আপনাকে?'

'আমার ঠাকুরদা আর তার সম্বন্ধী। পিঠ খাড়া করে বসতাম তাদের

সামনে। পই-পই করে বলতো, শেখাতো। আমি মুখস্থ করতাম। যতক্ষণ না শিখছি, ততক্ষণ থামত না। প্রত্যেকটা কথা তাই আজও মনে আছে—গান পর্যন্ত।'

'জানেন তো আগে বলেন নি কেন?'

'কেউ জানতে চায় নি বলে।'

কি সহজ জবাব।

খরসাহেবের কিন্তু বিশ্বাস হল না। এক শ ডলার পুরস্কার দিতে চাইলেন। আনাকেনায় মন্দির চত্বরের বেদীতে যেদিন একটা মূর্তি সিধে হয়ে দাঁড়াবে, এক শ ডলার সেদিন দেবেন। এক কথায় রাজী হল মেয়র। যুদ্ধ জাহাজে চিলি যাওয়ার সাধ আছে তার—তখন ডলারের দরকার হবে তো।

পায়ে গেল মেয়র। একটু পরেই এল তার ছেলে। চিঠি পাঠিয়েছে মেয়র। গভর্ণরের সঙ্গে কথা বলতে হবে খরসাহেবকে। এগারো জন যাবে হোতু মাতুয়ার গুহায় সবচেয়ে বড় মূর্তি খাড়া করার জন্যে—অনুমতি চাই।

গভর্ণর এবং ফাদার সিবাসটিয়ান দুজনেই কিন্তু অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন। বিশ্বাস নেই খরসাহেবেরও। নিশ্চয় ধাপ্পা মারছে মেয়র। লোকটা অদ্ভুত—মুখে বড়াই করতে জুড়ি নেই।

কিন্তু মেয়র সিরিয়াস। কাঁপছে পাতলা ঠোঁট। শেষকালে দিখে অনুমতি দিলেন গভর্ণর। মজা দেখবার জন্যে তৈরী হলেন ফাদার।

মেস-তাঁবু থেকে খাবার নিয়ে গেল মেয়র। মোট বারো জন রওনা হ'ল হোতু মাতুয়ার গুহার দিকে।

সূর্য ডোববার ঠিক আগে ফিরে এল মেয়র। তাঁবুর সামনে খুঁড়ল গুহার একটা গোল গভীর গর্ত। ফের অদৃশ্য হয়ে গেল হোতু মাতুয়ার গুহার দিকে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার হতেই ফের শোনা গেল অলৌকিক গান। এবার পা ঠোকার শব্দ আরো বেশী কোরাসও উচ্চ গ্রামে। শেষ লাইনটায় বুড়ির ভাঙা কাঁসির মত চড়া গলা আরো বেশী। আলো জ্বলে উঠল সব তাঁবুতে। ভুতুড়ে সবুজ আভায় ছেয়ে গেল প্রতিটা তাঁবু—যেন সবুজ কাগজের জাপানী লণ্ঠন। কিন্তু আলো নিয়ে কেউ বাইরে এল না—গান তো থেমে যাবে। এ গান অন্ধকারের গান।

পাতার মুকুট পরেছে বারো জনেই। মেয়রের ছোট ভাই বসে আছে

গর্তের মধ্যে পা ঝুলিয়ে। পায়ের তলায় পাথর দিয়ে চাপা একটা শূন্যগর্ভ পাত্র। পা দিয়ে ঢাক পেটার মত আওয়াজ করছে পাথরের ওপর। বুড়ি গলা ছেড়ে চেঁচাচ্ছে অদ্ভুত সুরে।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে থেকে নাচের ভঙ্গিমায় বেরিয়ে এল পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে। ঢিলেঢালা বসন অঙ্গে। হুলা নাচের কায়দায় নিতম্ব না দুলিয়ে শুধু পায়ের ওপর ভর দিয়ে নেচে গেল ঘাসের ওপর। ঘাসে পা প্রায় ঠেকল না বললেই চলে।

কে এই সুন্দরী? হোতু মাতুয়ার গুহা থেকে এ কাকে জাগিয়ে আনল মেয়র? দ্বীপের সমস্ত মেয়েকে চেনেন পাদ্রিসাহেব। এ মেয়েকে তো হুলা নাচের আসরে কখনো দেখা যায় নি?

মারিয়ানা আর ফ্লোরিয়া সমস্যা প্রাঞ্জল করে দিলে। মেয়েটি মেয়রের ভাইঝি। বয়স কম বলে হুলা নাচে যায় না।

পর-পর তিনবার একই গান গেয়ে গেল মেয়র আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা। এ গান পাথর কাটার গান নয়— মোয়াই খাড়া করার গান। পাদ্রিসাহেবের অনুচরেরা হুলা নাচের গান শুনতে চাইল। রাজী হল না মেয়র। তাতে দেবতা রুষ্ট হবেন। মূর্তি খাড়া করা যাবে না। পীড়াপীড়িতে পাথর কাটার গানটা গাইল আর একবার। তারপর সবাইকে নিয়ে মিলিয়ে গেল হোতু মাতুয়ার গুহার দিকে।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে ফিরে এল তাঁবুর সামনে। দানবিক মূর্তি ঘিরে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোলো সঙ্গীরা। বিমূঢ় অবস্থা। সবচেয়ে বড় এক মূর্তিটার কাঁধটাই কেবল দশ ফুট চওড়া। ওজন পঁচিশ থেকে তিরিশ টন। তার মানে বারোজনের প্রত্যেককে মোটামুটি দু'টন ওজন তুলতে হবে। হেসে ফেলল ক্যাপ্টেনীয়ান। মাথা চুলকে বললে—'অসম্ভব।'

কিন্তু এহেন অসম্ভব দায়িত্বের সামনে নির্বিকার রয়েছে মেয়র। মুখ গম্ভীর। সরঞ্জামের মধ্যে মোটে তিনটে গোল কাঠের খুঁটি—তবে ছোটো খুঁটি রাখল কাছে। কিছু কুচোপাথরের গোঁজ আর গোল পাথরও এনেছে জোগাড় করে। এই দিয়ে খাড়া করবে নাকি সবচেয়ে ভারী মূর্তিটা—যে মূর্তি নাক থুবড়ে পড়ে রয়েছে তাঁবুর সামনেই।

হ্রস্বকর্ণরা পাথরের গোঁজ ঠুকে উল্টে ফেলেছিল এই মূর্তিকে। গোঁজগুলো তুলে দেখাল মেয়র। তারপর লোকজন সাজিয়ে ফেলল মূর্তি ঘিরে।

দ্বীপে গাছ নেই ঠিকই—কিন্তু ইদানীং কিছু ইউক্যালিপটাস পোঁতা হয়েছে। তাছাড়া, রানো রারাকু-র মধ্যে লেকের চারধারে চিরকালই

গাছ জন্মেছে। কাঠের খুঁটি পেয়েছে সেখান থেকেই। প্রথম অভিযাত্রীরা এই রানো রারাকু পর্বত থেকেই নিয়ে গিয়েছিল 'তোরো মিরো' আর হিবিসকাসের কাঠ।

কিন্তু খুঁটির চাড় মেরে তিরিশ টন মূর্তি খাড়া করা কি সম্ভব? অসম্ভব। মনে মনে হেসে ফেলল লন থর্নসাইক।

দানবের মুখটা মাটির মধ্যে ঢুকে গেছিল। খুঁটি দুটো এই মুখের নিচে রেখে অপর প্রান্ত ধরে এগারো জনে চাড় মারতে লাগল সমস্ত শক্তি দিয়ে। একগাদা পাথর হাতের কাছে রেখে সটান উপুড় হয়ে শুয়ে রইল মেয়র মূর্তির মুখের কাছে। ছোট ছোট পাথর গুঁজে দিতে লাগল মুখের তলায়—এগারো জনের সম্মিলিত শক্তিতে সামান্য তুলে উঠছে মুখটা—সঙ্গে সঙ্গে একচুল ফাঁকের মধ্যেও পাথর গুঁজে দিচ্ছে মেয়র। সারাদিন গেল এইভাবে। স্ট্যাচুর তলায় পাথর বোঝাই হয়ে গেল। দিন ফুরোলে দেখা গেল মাটি থেকে তিন ফুট ওপরে উঠে এসেছে স্ট্যাচু।

দ্বিতীয় দিন মেয়র উঠে এল চূড়িশলা ছেড়ে। ছোট ভাই সে জায়গায় শুয়ে পাথর গুঁজে চলল একমনে। একটা খুঁটি সরিয়ে রাখা হল। পাঁচ জনে চাড় দিতে লাগল একটা মাত্র খুঁটিতে। আহু মন্দিরের পাঁচিলের সামনে দাঁড়িয়ে দু হাত নেড়ে হুকুম দিয়ে গেল মেয়র—'এক দুই তিন। ইতাহি, এরুয়া, হতোরু। এক দুই তিন। এক দুই তিন।'

সে দিন দানবের দুদিকে ঠেলে দেওয়া হল দুটো খুঁটিই। সামান্য হেলে পড়ল দানব—চোখে ঠাহর করা যায় না। কিন্তু মিলিমিটার মিলিমিটার করে হেলতে হেলতে দেখা গেল সেটা ইঞ্চিতে এসে দাঁড়িয়েছে—ইঞ্চি থেকে ফুটে। বিরাম বিহীন ভাবে ছোট ছোট পাথর কুচি হিসেবে ঢুকে গুঁজে দেওয়া হল স্ট্যাচুর ডানদিকে—খুঁটি পাথরের ঠেলায় ডানদিকটা একটু হেলতেই খুঁটি নিয়ে আসা হল বাঁদিকে। সেদিকে চাড় দিয়ে পাথর গুঁজে দেওয়া হল আবার ডানদিকে। ডানদিক থেকে আবার বাঁদিকে। বাঁদিক থেকে আবার ডান দিকে। এইভাবেই চলল সারাদিন। রাশিকৃত পাথরের ওপর একটু একটু করে শূন্যে উঠে যেতে লাগল পাথরদানো—উপুড় অবস্থায়।

নবম দিনে দানবদেহ মাটি থেকে বারো ফুট উঁচুতে উঠে গেল—পাথরের টাওয়ারের ওপর শুয়ে রইল মুখ থুবড়ে—কিন্তু হড়কে নেমে এসে খাড়া হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না। দৃশ্যটা বাস্তবিকই অলৌকিক। তিরিশ টন ওজনের এ রকম ভারী একটা স্ট্যাচুকে এতটা উঁচুতে তোলা কি সহজ কথা! খুঁটি দিয়ে চাড় দেওয়ায় কিন্তু বিরাম নেই। দু-মানুষ উঁচুতে আর হাত পৌঁছোচ্ছে

না বলে খুঁটির প্রান্তে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই দড়ি ধরে ঝুলে পড়ে টান মারছে এগারো জনে।

স্ট্যাচুর অবস্থান এখন কিন্তু মারাত্মক বিপজ্জনক। টুকরোটাকরা পাথরের ওপর শুয়ে আছে এতবড় একটা দৈত্য। যদিও পাথরগুলো টাইট করে আঁটা হয়েছে প্রতিটি ফাঁকের মধ্যে—কিন্তু কোথাও যদি স্থানচ্যুতি ঘটে, প্রলয়ংকর ঘটনা ঘটে যাবে চক্ষের নিমেষে। ছোট ছোট ফাঁকে নগ্ন পায়ের বুড়ো চুকিয়ে আরও ভারী পাথর কাঁধে লোক উঠছে ওপরে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সেই দৃশ্য দেখছেন থরসাহেব। পাথর কিন্তু সরছে না, নড়ছে না। প্রতিটি পাথর হিসাব করে, দেখেশুনে বসিয়েছে মেয়র। লোকজন প্রত্যেকেই হুঁশিয়ার, সবচেয়ে বেশী হুঁশিয়ার মেয়র নিজে। প্রতিটি পাথরের ওপর কত চাপ পড়ছে, সে হিসেব যেন তার মাথার মধ্যে। সুতো ধরে কাজ করিয়ে চলেছে যেন এতগুলি লোককে। মুখে দরকারী কথা ছাড়া একটি বাজে কথা নেই। মেয়রের এ-রূপ কখনো দেখেন নি থরসাহেব। বাজে কথার জন্যে, হাতের কাজের চড়া দাম হাঁকার জন্যে, আত্মম্ভরিতার জন্যে, বিরক্তিকর ব্যক্তিত্বের জন্যে ক্যাম্পের কেউ তাকে দুচক্ষে দেখতে পারত না। কিন্তু মূর্তি খাড়া করার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সেরের মত অপদার্থ লোকটাই যেন পালটে গিয়েছে রাতারাতি। ধীর, স্থির, শান্ত। বুদ্ধিমত্তা আর ব্যক্তিত্ব, হিসেব জ্ঞান আর দায়িত্ববোধ ঠিকরে পড়ছে চোখ মুখ থেকে। মেয়রকে সেদিন নতুন চোখে দেখলেন থরসাহেব।

দশম দিনে সবচেয়ে উঁচুতে উঠল দানবস্ট্যাচু। পা বাড়িয়ে আছে যেন গড়গড়িয়ে নেমে গিয়ে আলয় বেদীতে খাড়া হবার প্রতীক্ষায়। মেয়রের সাঙ্গপাঙ্গরা পালাক্রমে ভাবে ঝাঁকিয়ে দেখল নড়ানো যায় কিনা।

একাদশ দিবসে এই প্রথম স্ট্যাচু হেলাতে আরম্ভ করল লম্বকর্ণরা। পায়ের দিক নামাতে লাগল একটু একটু করে, মাথা আর বুকের তলায় পাথর গুঁজে আরও উঁচুতে তুলে দিয়ে।

সপ্তদশ দিবসে উস্কখুস্ক চুলে এক বুড়ি এসে হাজির হল হঠাৎ। মেয়র আর সে দুজনে ডিমের আকার আর আয়তনের কতকগুলো পাথর পায়ের দিকে অর্ধচন্দ্রাকারে সাজাল বিরাট একটা চাটালো পাথরের ওপর—পা নামিয়ে এই পাথরের দিকেই হেলে পড়ছে দানব একটু একটু করে। পাথর সাজানো হল বিপদ এড়ানোর জন্যে। স্ট্যাচু কিন্তু হেলে রয়েছে অতিশয় বিপজ্জনক কোণে। গড়িয়ে নামবার সময়ে বারো ফুট দূরের আহুর বেদীতে পৌঁছেও বেসামাল হয়ে অন্যত্র ঠিকরে যেতে পারে—সমুদ্র

দ্বীপের প্রাচীনতম ধাঁধার সমাধান তার হাতের মুঠোয় জেনেও এতদিন সে মুখ খোলে নি। এখন দেখিয়ে দিল হাতে নাতে। মাত্র এগারোজন সঙ্গী আর দুটো কাঠের খুঁটি দিয়ে একটি স্ট্যাচু দাঁড় করিয়েছে মাত্র আঠারো দিনে। চিলির প্রেসিডেন্ট টাকায় ডুবিয়ে দিলে আরও অনেক লোক আর সরঞ্জাম নিয়ে দ্বীপের সমস্ত স্ট্যাচুকে সে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে আরো কম সময়ের মধ্যে। কিন্তু টাকা চাই, দেদার টাকা।

মেয়রকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে এবং দু-কাঁধে দু হাত রেখে বললেন থরসাহেব—'এবার বলুন মেয়র ডন পেড্রো, আপনার পূর্বপুরুষরা স্ট্যাচুগুলোকে দ্বীপের একদিক থেকে আরেক দিকে নিয়ে গেছিল কিভাবে।'

'হেঁটে গেছিল সিনর, নিজেরা হেঁটে গেছিল।'

'রাবিশ!' মেজাজ খিঁচড়ে গেল থরসাহেবের।

মেয়র কিন্তু নির্বিকার। বললে— চটে যাচ্ছেন কেন? বাপঠাকুর্দার কাছে যা শুনেছি, তাই বললাম। বাপঠাকুর্দাও শুনেছে তাদের বাপঠাকুর্দার কাছে। চোখে কেউ দেখে নি স্ট্যাচুদের হেঁটে যেতে। আমার তো মনে হয় 'মাহবো মাংগা একরা' দিয়ে নিয়ে গেছিল।

'সেটা কী?'

ছবিটি এঁকে দেখাল মেয়র। বললে—'কাঠের তৈরী। গাছের ডাল থেকে বানানো যায়। 'হাইউ-হাইউ' গাছের ডাল কেটে আমিও বানাতে পারি। তারপর তাতে দড়ি বাঁধা হত- এত মোটা দড়ি যে জাহাজে বাঁধা যায়।'

ক্যাম্পের কাছেই বালির মধ্যে থেকে একটা স্ট্যাচু আবিষ্কার করেছিল সম্প্রতি। চোখ নেই স্ট্যাচুর। বেদী পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে। মাটির তলায় বেমালুম ঢুকেছিল অ্যাটিন। ফলে নাগাল বসাতে পারেন নি ফাদার।

থরসাহেব স্ট্যাচুটা দেখিয়ে বললেন—'মাঠের মধ্যে দিয়ে এই মোয়াই-টাকে টেনে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'আমরা এই কজনে পারব না। আপনার সমস্ত লোকজন হাত লাগা-লেও হবে না। গ্রাম থেকে আরো লোক আনতে হবে।'

স্ট্যাচুটা খুব বড় নয়। মাঝারি আকারের চাইতেও ছোট। থরসাহে-বের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। মেয়রকে দিয়ে গ্রাম থেকে দুটো গায়ে গতরে ভারি বলদ আনালেন। জবাই করালেন। সেই মাংস রাঁধলেন পাতাল উনুনে। উত্তপ্ত পাথরের ফাঁকে রইল মাংস—তার ওপর কলার পাতা চাপা

দিয়ে বালি ঢেলে দেওয়া হল। মাংস যখন রান্না হল, খবর দেওয়া হল গ্রামের লোককে। দলে দলে এল তারা। লম্বকর্ণরা বালি সরিয়ে কলার পাতা ফেলে দিতেই রান্না মাংসের গন্ধে জিভে জল এসে গেল এবার। হাত ভর্তি মাংস নিয়ে শুরু হল তোফা ব্রেকফাস্ট। সেইসঙ্গে বাজল গীটার, চলল জলা নাচ। হাসি হুল্লোরে মাতোয়ারা হল প্রত্যেকেই।

ইতিমধ্যে মূর্তি টেনে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করে ফেলেছিল মেয়র। স্ফূর্তি উচ্ছল নেটিভদের হাতে ধরিয়ে দিল দড়ি—যে দড়ি বাঁধা রয়েছে দানবের গায়ে।

হেঁইও টান মারতেই পটাং করে ছিঁড়ে গেল দড়ি, ঘাড়ে ঘাড়ে ছিটকে গেল নেটিভরা। অট্টহাসিতে ভরে গেল দ্বীপ।

ভ্যাবাচাকা খেয়েও সামলে নিল মেয়র। কাষ্ঠ হেসে ফের দড়ি বাঁধলো ঘাড়ে। ফের হাত লাগালো নেটিভরা। এক-দুই-তিন বলে হ্যাঁচকা টান মারল দড়িতে।

আচম্বিতে নড়ে উঠল দানব, সরে গেল বেশ খানিকটা। এক-দুই-তিন · এক-দুই-তিন · ল্যাভাবাস প্রান্তরের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে হড়কে চলল মূর্তি—যেন খালি কার্ডবোর্ডের বাক্স।

প্রান্তরের বাইরে যেতেই থামিয়ে দিলেন থরসাহেব। প্রমাণ করে দিলেন ১৮০ জন দ্বীপবাসী ভরপেট খেয়ে বারো টন ওজনের পাথরের মূর্তিকে মাঠের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারে। কাঠের সরঞ্জাম পেলে এবং আরো লোক সাহায্য করলে আরো বড় মূর্তি টানা যাবে অনায়াসেই।

এইভাবেই ঈস্টার দ্বীপের কয়েকটা ধাঁধার লৌকিক ব্যাখ্যা হাতেনাতে দেখিয়ে দিলেন থরসাহেব। দেখিয়ে দিলেন হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে জল আর পাথরের শাবল দিয়ে পাথর খুঁদে মূর্তি গড়া সম্ভব, দেখিয়ে দিলেন দড়ি-আর কাঠের সরঞ্জাম দিয়ে মূর্তিদের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব, দেখিয়ে দিলেন কায়দা জানা থাকলে অতিকায় দানবদের টেনে তুলে বেদীর ওপর খাড়া করা সম্ভব। বাকি রইল শুধু একটা বাস্তব রহস্য লাল ঝুঁটিকে খাড়াই মূর্তির মাথায় বসানো হয়েছিল কিভাবে? জবাব তো আগেই পাওয়া গেছে। যে প্রস্তর স্তূপের সাহায্যে শোয়ানো মূর্তিকে দাঁড় করানো হয়েছে, সেই স্তূপকে আরো উঁচু করে একই কায়দায় মাথা পর্যন্ত ঝুঁটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। অতঃপর মাথার ওপর ঝুঁটি পৌঁছোনোর পর প্রস্তর স্তূপ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। একা দাঁড়িয়ে থেকেছে প্রতিটি মূর্তি। ভাস্করদের মৃত্যু হওয়ার পর তাই নিয়ে রহস্যর পর রহস্য

সৃষ্টি হয়েছে। সীমাহীন শান্তির দ্বীপ এই ঈস্টার দ্বীপে একদা পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমান একটা মানবজাত আগমন করেছিল। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি আর অঢেল সময় হাতে পেয়ে পুরোনো কলাকৌশল খাটিয়ে তারা ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের ব্যাবেল টাওয়ার রচনা করেছিল। বহু শতাব্দী তারা একা থেকেছে—প্রতিবেশী পেয়েছে কেবল মাছ আর তিমিদের। খনন করে জানা গেছে, তৃতীয় মহাযুগ শুরু হওয়ার আগে বল্লমজাতীয় অস্ত্রশস্ত্র এ দ্বীপে নির্মিত হয় নি।

লাল ঝুঁটির পাথরখাদ থেকে সাত মাইল পথ বেয়ে এনে একটা ঝুঁটিকে ফেলে যাওয়া হয়েছিল ক্যাম্পের অনতিদূরে। মেয়র ওই ঝুঁটিটাকে কাঠের গুঁড়ির ওপর চাপিয়ে নিজের হাতে খাড়া করা মূর্তির মাথায় বসানোর আয়োজন আরম্ভ করতেই ঈস্টার দ্বীপের এমন একটা নতুন রহস্য আবির্ভূত হল যে থরসাহেবের অভিযানে বাগড়া পড়ল খুবই। সত্য সমাধান করা রহস্য-নিচয়ের চাইতেও এ রহস্য অনেক জটিল। ফলে, লাল ঝুঁটি পড়ে রইল মাটিতেই। নতুন ভাবনায় ভাবিত হলেন থরসাহেব।

৬। কুসংস্কার, শুধু কুসংস্কার

উপুড় হওয়া দৈত্যকে সিধে করার প্রচেষ্টার সপ্তম দিনে ঘটল এই ঘটনা।—

তাঁবুর ছাদ থেকে দড়িতে ঝুলছিল ল্যাম্প। লম্বা ছায়া পড়েছে পাতলা দেওয়ালে। আলো কমিয়ে দিলেন থরসাহেব পলতে অর্ধেক করে দিয়ে। গিন্নী আগেই ঢুকে পড়েছে স্লিপিং ব্যাগে। এবার শয়ন করবেন থরসাহেব। তাঁবুতে ছায়ামায়ার রহস্যময় পরিবেশ। বাইরে বালুকাবেলায় ঢেউ আছড়ে পড়ার নিরন্তর গর্জন। ঠিক এমনি সময়ে কে যেন নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল তাঁবুর গা। বলল চাপা গলায় ভাঙা স্প্যানিশ ভাষায়:

'সিনর কোনটাইকি, ভেতরে আসব?'

ফের ট্রাউজার্স পরে নিলেন থরসাহেব। হুঁশিয়ার হয়ে জীপ চেন টেনে খুললেন তাঁবুর প্রবেশ পথ। কেবল মাত্র নাক আর মুখ বার করলেন বাইরে। বাইরে তারার আলো ছাড়া কিছু নেই। বগলে বাণ্ডিল নিয়ে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে সামনে। পেছনে নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে দেহ উঁচিয়ে রয়েছে পাথরের দৈত্য প্রস্তর স্তূপের ওপর।

মিনতি মাখানো সুরে বললে লোকটা—'ভেতরে আসব ?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে ভেতরে নিয়ে এলেন খরসাহেব। কৃতার্থ ভঙ্গিমায় কাষ্ঠ হেসে ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইল রাতের আগন্তুক। খরসাহেব তাকে চেনেন। মেয়রের মূর্তি খাড়া করার দলে আছে। বয়স সবচেয়ে কম—কুড়ি বছর। নাম, এসতেভান পাকাবাতি। বিলক্ষণ সুপুরুষ। তালঢ্যাঙা বলে নিচু তাঁবুতে সিধে হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না। বিছানার একধারে বসতে বললেন খরসাহেব।

জড়সড় হয়ে কিছুক্ষণ বসে কথা বলতে গিয়ে খানিকটা শুকনো হাসি হেসে অবশেষে ব্রাউন কাগজে মোড়া বগলের পুলিন্দাটা সামনে এগিয়ে দিল এসতেভান।

বললে—'আপনার জন্য।'

মোড়ক খুললেন খরসাহেব, বেরিয়ে এল একটা মুরগী। পাথরের মূর্তি। জীবন্ত মুরগীর মত দেখতে—আকারে এবং কারুকাজে। ঈস্টার দ্বীপে এ ধরনের মূর্তি এর আগে কখনো দেখেন নি খরসাহেব।

প্রশ্ন করার আগেই মুখ খুললো এসতেভান—'গ্রামের সবাই বলে আপনি এসেছেন আমাদের ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে। এত জিনিসপত্র দিচ্ছেন সেই জন্যেই, সবাই আপনার দেওয়া সিগারেট খায়।'

'কিন্তু এ মূর্তি তুমি পেলে কোথায় ?'

'এ হল 'মোয়া'। আমার বউ আপনাকে দিতে বলেছে। আপনার দেওয়া সব সিগারেট তো ও ই খায় রোজ।'

স্লিপিং ব্যাগ থেকে হেলে পড়ে সুটকেশ থেকে এক টুকরো কাপড় বার করল খর-গৃহিণী—জামা প্যান্ট বানাবার কাটপিস. এসতেভান সবেগে হাত নেড়ে বললে 'না, না, জিনিস চাই না। বদলা বদলির জন্যে আনি নি—সিনরকে উপহার দিচ্ছি।'

খরসাহেব কাপড়টা এসতেভানের হাতে গছিয়ে দিয়ে বললেন—'আমিও উপহার দিচ্ছি তোমার বউকে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাপড় নিল এসতেভান। এত জিনিসপত্র রোজ রোজ দেওয়ার জন্য অজস্র ধন্যবাদ জানালো। তারপর সুট করে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে গ্রামের দিকে। যাওয়ার আগে বলে গেল—পাথরের মুরগী মূর্তি যেন লুকিয়ে রাখা হয়—কেউ না দেখতে পায়।

খুঁটিয়ে মূর্তিটাকে দেখলেন খরসাহেব. পাকা কারিগরের হাতে তৈরী, অনুপম শিল্প নিদর্শন, ধোঁয়ার গন্ধ বেরুচ্ছে পাথরের গা থেকে। এই প্রথম

এমন একটা খাঁটি নেটিভ কারুকীর্তি দেখলেন যা একঘেয়ে কাষ্ঠমূর্তি অথবা পাথর দৈত্যদের মূর্তির অনুকরণ নয়। বিছানার তলায় মূর্তিটা লুকিয়ে রেখে আলো নিভিয়ে দিলেন থরসাহেব।

পরের দিন তাঁবু-চত্বর নিশ্চুপ হয়ে যাওয়ার পর আবার আঁচড় পড়ল থরসাহেবের তাঁবুতে। আবার শোনা গেল ফিস ফিস কণ্ঠস্বর। এসতেভানের গলা। আবার কেন? চায় কী?

আবার একটা মূর্তি এনেছে এসতেভান। এবার মানুষের মূর্তি। গুঁড়ি মেরে বসে থাকা মূর্তির নাকটা পাখীর চঞ্চুর মত লম্বা। একহাতে একটা ডিম। চ্যাটালো পাথরের ওপর উঁচুভাবে খোদাই করা মূর্তি। ওরোনগোতে পাখী-মানুষদের মন্দির ধ্বংসস্তূপে এরকম মূর্তি কিন্তু একটিও দেখেন নি থরসাহেব।

কাপড় পেয়ে কৃতজ্ঞচিত্ত এসতেভানের বউ পাঠিয়েছে এই মূর্তি। মূর্তি খোদাই করেছে এসতেভানের শ্বশুর। কিন্তু কাউকে যেন দেখানো না হয়।

আবার একটা কাপড়ের প্যাকেট দেওয়া হল তাকে। তাঁবু খালি হলে মূর্তি শুঁকলেন থরসাহেব। কড়া গন্ধ রয়েছে ধোঁয়ার। বালি দিয়ে মাজা হয়েছে। ভিজে ভিজেও রয়েছে। বেশ একটা রহস্য দানা বাঁধছে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কি সেই রহস্য?

ধোঁয়াটে গন্ধওলা অস্বাভাবিক স্ট্যাচুগুলো নিয়ে পরের দিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একটানা আকাশ পাতাল চিন্তা করে গেলেন থরসাহেব। সন্ধ্যে হতে আর সংযত থাকতে পারলেন না। মেয়রকে ডেকে আনলেন তাঁবুর মধ্যে। তাঁবুর পর্দা নামিয়ে দিলেন মশারীর বাইরে।

বললেন—'যদি কথা দেন কাউকে কিছু বলবেন না, তাহলে একটা কথা বলব।'

মেয়র তখন কৌতূহলে ভরপুর। কথা দিল মুখে চাবি দিয়ে থাকবে।

সুটকেশ থেকে মূর্তিদুটো বার করলেন থরসাহেব—'কি মনে হয় দেখে?'

আঙুলে ছ্যাঁকা লাগল যেন এমনিভাবে ত্রস্তে আঙুল সরিয়ে নিল মেয়র। চোখঠেলে এল বাইরে—ফ্যাকাশে হল মুখ। সামনে যেন ভূত এসে দাঁড়িয়েছে, অথবা বন্দুকের নল বাগিয়ে ধরেছেন থরসাহেব।

'কোথায় পেলেন? বলুন কে দিল।'

'তা তো বলতে পারব না। দেখে কি মনে হয় তাই বলুন।'

পিছু হটে তাঁবুর দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল মেয়র।

বললে—'আমি ছাড়া দ্বীপে কেউ নেই যে গড়তে পারে এই স্ট্যাচু।'

একটু থেমে কি ভাবল। তারপর বললে দৃঢ়কণ্ঠে—'প্যাক করে জাহাজে রেখে আসুন। দ্বীপের কেউ না দেখতে পায়। আরো স্ট্যাচু কেউ দিয়ে গেলে নিয়ে নেবেন। জাহাজে লুকিয়ে রাখবেন।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি খুলে বলবেন তো?'

'ব্যাপার খুব গুরুতর। স্ট্যাচুগুলো পারিবারিক পাথর।'

থরসাহেবের মনের ধাঁধা কাটল না। শুধু বুঝলেন, আগুনে হাত দিয়েছেন। এসতেভানের শ্বশুর অদ্ভুত কারবারে লিপ্ত।

এসতেভান ছোকরা কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয়। পরের বার পা টিপে টিপে ফের আসতেই চেপে ধরলেন থরসাহেব। ব্যাপার কি খুলে বলতেই হবে। কিন্তু কথা বলার মুড-ই নেই এসতেভানের। সে এসেছে থলি বোঝাই তিন তিনটে স্ট্যাচু নিয়ে। দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল থরসাহেবের।

একটা পাথরে খোদাই করা রয়েছে তিনটে স্ট্যাচু। তিনটে বিদঘুটে মুখ—কিন্তু আর্টিস্টিক। প্রত্যেকের মুখভর্তি গোঁফ আর দাড়ি। একজনের লম্বা দাড়ি গিয়ে মিশেছে পাশের জনের মাথায়। দ্বিতীয় পাথরটা একটা গদা; ওপরে খোদাই করা মুখ আর চোখ। তৃতীয়টা একজন মানুষের—দাঁতের ফাঁকে ঝুলছে একটা ধেড়ে ইঁদুর। তিনটে পাথরেরই কারুকীর্তি দেখবার মত। ঈস্টার দ্বীপের নিজস্ব পাথর খোদাই শিল্পের সঙ্গে কোনো মিলই নেই। ভূগোলকের কোনো অঞ্চলে এমন বস্তু দেখেন নি থরসাহেব। এসতেভানের শ্বশুর মশায়ের হাতে এদের সৃষ্টি—এই বাকতাল্লার একবর্ণও বিশ্বাস করলেন না থরসাহেব। তিনটে পাথরই বিকটদর্শন, পৈশাচিক—চুপিসারে রাতের অন্ধকারে আনা হয়েছে যেন এই কারণেই।

থরসাহেবের মুখে কিছুক্ষণ কথা সরল না। তারপর বললেন—'ইঁদুর কামড়ে আছে কেন?'

ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় এসতেভান জানাল, খুব নিকটজন কেউ মারা গেলে শোকপ্রকাশ করতে হত এইভাবে। জাহাজের ইঁদুর দ্বীপে ঠাঁই পাওয়ার আগে ঈস্টার দ্বীপে ছিল শুধু 'কাইওই'—এক ধরনের ইঁদুর যা খেতে সুস্বাদু। বউ অথবা ছেলে মেয়ে কেউ মারা গেলে ইঁদুর দাঁতে কামড়ে উপকূল বরাবর একটা চক্কর মেরে আসতে হত—সামনে যে পড়বে, তাকে খুন করতে হবে। যোদ্ধাদের শোক প্রকাশ করতে হত এই ভাবেই।

না জানি কি বিরাট কাজই করত—এমন একখানা ভাব দেখালো এসতে-

জান।

'শোকবিহ্বল মূর্তি কে বানিয়েছে?'

'আমার স্ত্রী-র বাবা।'

'অন্য মূর্তিগুলো তারই তৈরী?'

'ঠিক বলতে পারব না। কিছু বানিয়েছে বউয়ের বাবা, কিছু ঠাকুর্দা। বাবাকে তৈরী করতে স্বচক্ষে দেখেছে।'

'আমার কাজ করছে কি তোমার শ্বশুরমশায়?'

'না। মারা গেছে। মূর্তিগুলো কিন্তু পবিত্র। হাল্কা ভাবে নেবেন না।'

ব্যাপার আরো ঘোরালো হয়ে উঠল। গ্রামে গঞ্জে চাউড় হয়ে গেছে, সিনর কোনটাইকি নাকি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। এসতেভানও একই ঘটনা নতুন করে শোনালো থরসাহেবকে। তার বউও কথাটা শুনেছে।

'শ্বশুরমশায় মারা যাওয়ার পর পাথরগুলো রেখেছিল কোথায়? বাড়ীতে?'

'না। ফ্যামিলিগুহার মধ্যে।'

চুপ করে রইলেন থরসাহেব। ফিসফিস করে আরো অনেক খবর দিলে এসতেভান। পুরো গুহাটা নাকি ঠাসা এই ধরনের পাথরে। কিন্তু খুঁজে বার করার সাধ্যি কারো নেই। গুহায় ঢোকবার পথ কোথায়, তা জানে কেবল তার বউ—আর কেউ না। ভেতরে ঢোকবার অধিকারও শুধু তার। আর কারো নেই। এমন কি এসতেভানেরও নেই। গুহার প্রবেশ পথও সে দেখেনি আজও। তবে জানে মোটামুটিভাবে জায়গাটা কোথায়। তাকে কাছেই দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে গেছে বউ। ফিরে এসেছে পাথর নিয়ে। বলেছে, গুহাভর্তি কেবল স্ট্যাচু আর স্ট্যাচু।

এসতেভানের গুপ্ত রহস্যের ভাগীদার হওয়ার পর থরসাহেবের পক্ষে সুবিধে হয়ে গেল এই প্রসঙ্গে আরো কথা বলার।

পরের বার এসতেভান এসে বললে, পাছে গাঁয়ের কেউ দেখে ফেলে এবং ভাবে যে পুরোনো সামগ্রী গুহা থেকে এনে পাচার করা হচ্ছে বিদেশী-দের কাছে, তাই তার বউ বালি আর জল দিয়ে প্রত্যেকটা স্ট্যাচু মেজে ঘসে তবে তার হাতে দিয়েছে। পাথরের গায়ের অদ্ভুত গন্ধটা গুহার মধ্যে থাকার জন্যে হয় নি, জলে ধোয়ার পর—উনুনের ওপর শুকোনোর জন্যে হয়েছে। থরসাহেবের ইচ্ছে কিন্তু পাথর যেন ধোয়া মোছা মাজা ঘসা না করা হয়। রাজী হল এসতেভান—বউকে বোঝাবে। থরসাহেবের বিশেষ কোনো জিনিস দরকার থাকলে বলতে পারেন, বউ জানতে চেয়েছে। কিন্তু কি জিনিস আছে, এসতেভান নিজেই জানে না। থর-

সাহেব জানবেন কি করে কোন জিনিসটা চাওয়া দরকার? উনি শুধু জানেন, ঈস্টার দ্বীপের এক অজ্ঞাত গুহা থেকে এমন সব প্রাচীন শিল্প সম্পদ বেরিয়ে আসছে মানব জাতি সমূহের বিজ্ঞান সম্মত বিবরণ দিতে যার জুড়ি নেই।

এসতেভান কথা দিয়ে গেল ফিসফিস করে, বউকে বুঝিয়ে সে বলবে যাতে থরসাহেবকে নিয়ে, যাওয়া যায় গুহার মধ্যে। পাথর বাছাই করতে তখন সুবিধা হবে। কেন না, সেখানে এত জিনিস আছে যে সব কিছু নিয়ে আসা সম্ভব নয়। মুস্কিল শুধু বউকে নিয়ে। বড় জবরদস্ত মেয়ে। পাথরের মত জেদ—যা বলে তার একটুও নড়চড় হয় না। এসতেভানকেও নিয়ে যায় নি আজও। তবে যদি রাজী হয় থরসাহেবকে নিয়ে যেতে, তাহলে ওর বাড়ী যেতে হবে রাতে। গুহাটা কাছেই—গ্রামের মাঝখানে।

এসতেভানের আসা যাওয়া যে সময়ে চলছে, ঠিক সেই সময়েই হোতু মাতুয়ার গুহায় দলবল নিয়ে রয়েছে মেয়র—দিনের বেলা মূর্তি খাড়া করার কাজে ব্যস্ত—রাত্রে হোতু মাতুয়ার গুহায় ঘুম। কাজেই রাত্রে কে হাওয়া হচ্ছে গুহার বাইরে তা জানা মেয়রের পক্ষে কঠিন কিছু নয়। হয়ত থরসাহেবের তাঁবু পর্যন্ত এসে গুপ্তচর বৃত্তি করে গেছে। তাই একদিন থরসাহেবকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে শুধু বললে, এসতেভানের বাপ ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারা দুজনেই কেবল সিরিয়াস পাথর তৈরীর কায়দা জানত। এসতেভানের বাবা অবশ্য ইহলোকে আর নেই। কিন্তু পাথরগুলো তৈরী হয়েছে ফ্যামিলি গুহায় রেখে দেওয়ার জন্যে—বিক্রী করার জন্যে নয়।

'কি করা হত পাথর দিয়ে?' জানতে চেয়েছিলেন থরসাহেব।

'ভোজ সভায় এনে দেখাতো, নাচের আসরে নিয়ে যেত।

এর বেশী একটা কথাও বার করা গেল না মেয়রের পেট থেকে।

এসতেভান এল আরো রাত্রে, এবার আনল বেশ কয়েকটা পাথর। তার পরেই আচম্বিতে থেমে গেল তার নিশীথ অভিযান। থরসাহেব ডাকিয়ে আনলেন। কিন্তু শুকনো মুখ দেখে চমকে গেলেন। গুহা পাহারা দেয় যে দুটি অপদেবতা, তারা তাকে ক্ষেপে গেছে বউয়ের ওপর এতগুলো পাথর বার করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। থরসাহেবকে গুহার মধ্যে নিয়ে যাওয়া তাই আর সম্ভব নয়। গুহার মধ্যে থেকে আর কোনো পাথর আনাও আর সম্ভব নয়। এসতেভানের কিন্তু খুব ইচ্ছে থরসাহেবের হাতে আরও পাথর দেওয়ার। কিন্তু বউটা এমন জেদী যে সুবিধে করে উঠতে পারছে না।

ওর এই একবগ্গা স্বভাবের জন্যেই নাকি শ্বশুরমশায় গুহার গুপ্ত রহস্য শুধু তাকেই বলে গেছে— ফ্যামিলির আর কাউকে নয়।

এনডেভারের নিশীথ অভিযান চলাকালীন সময়ে অনেক খুঁড়োখুঁড়ি চলছিল দ্বীপে। নতুন নতুন লুপ্ত বস্তু উদ্ধার করছিল পুরাতত্ত্ববিদরা। তত বেশী কুসংস্কারে পেয়ে বসছিল নেটিভদের। রানো রারাকুর শিখরদেশে একটা অজ্ঞাত মন্দিরের প্রাচীর আবিষ্কৃত হল। থরসাহেব সেখানে যেতেই মাটি খোঁড়া ফেলে রেখে দুজন দ্বীপবাসী সটান এগিয়ে এল তাঁর দিকে।

বলল— 'এবার কিন্তু আপনাকে মানতেই হবে— আমাদেরই ফ্যামিলির মানুষ আপনি— বহু পুরুষ আগে আপনার পিতৃপুরুষ বেরিয়ে গেছিল এ দ্বীপ থেকে।'

হেসে ফেললেন থরসাহেব বললেন, 'হাবাড়া ভূগোলকের অন্য প্রান্তে— নরওয়েতে।' খাঁটি নরওয়েবাসী বলতে যা বোঝায়, উনি তাই। কিন্তু ওরা ভোলবার নয়। থরসাহেবের মুখোশ এখন খুলে গেছে, স্বীকার করতে বাধা কোথায়? বহু যুগ আগে একজন ঈস্টার দ্বীপবাসী চম্পট দিয়েছিল দ্বীপ থেকে, আর ফিরে আসে নি। সব্বাই জানে। তাছাড়া, থরসাহেব এ দ্বীপে আগে আসেন নি বললেই হল? না এলে সটান আনাকেনায় গেলেন কি করে? হোতু মাতুয়া প্রথম যেখানে দ্বীপে নামেন, ঠিক সেই জায়গায় শিবির পাতলেন কেন?

হেসে উড়িয়ে দিলেন থরসাহেব। কিন্তু লাভ হল না। নেটিভদের বোঝানো গেল না।

সেইদিনই রানো রারাকুর রাস্তার কাছেই পেল্লায় চৌকোনা পাথরের চাঁই ওল্টানো হল নেটিভদের নিয়ে। পুরাতত্ত্ববিদের খটকা লেগেছিল পাথরটাকে দেখে। অথচ দ্বীপবাসীরা কতবার তার পাশ দিয়ে গেছে, ওপরে বসেছে— দুঃস্বপ্নেও ভাবে নি চৌকোনা পাথরের চাইয়ের তলায় বিস্ময় লুকিয়ে আছে। নিছক পাথর নয় সেটা— উল্টো করে রাখা একটা অদ্ভুত দানবের মুখ। পুরু ঠোঁট। চ্যাপ্টা নাক। চোখের নিচে গর্ত। ঈস্টার দ্বীপের যে শিল্পের খবর সবাই রাখে, তার সঙ্গে চৌকোনা মুখের শিল্প নিদর্শনের কোনো মিল নেই। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বস্তু। আবার হতবাক হল দ্বীপবাসীরা। বদ্ধ হল কুসংস্কার। সিনর কোনটাইকি জানলেন কি করে যে চৌকোনা পাথর উল্টালে দেখা যাবে বিকট দানবের মুখ? আর তো ফাঁকি দেওয়া যাবে না দ্বীপবাসীদের— ওরা বুঝে ফেলেছে অলৌকিক শক্তির উৎস সিনর কোনটাইকির হাতের মুঠোয়।

সস্ত্রীক একদিন হোভূ মাতুয়াব গুহায় গেলেন ধরসাহেব। দলবল নিয়ে শুয়ে শুয়ে মোটা মোটা পাঁউরুটিতে মাখন আর জ্যাম মাখিয়ে খাচ্ছিল মেয়র আর সাঙ্গপাঙ্গরা। ওকে দেখেই উদরে হাত বুলিয়ে জানালে, দ্বীপে এতদিন মাছ আর মিষ্টি আলু খেয়ে দিন কেটেছে। এখন ভালমন্দ জুটছে।

পলতে লাগানো টিনে আলো জ্বালানো হল। শুরু হল পুরোনো দিনের গল্প। টিইউইট-কো-আইহিউ নামে এক রাজা ছিল দ্বীপে। একদিন সে দুটো ঘুমন্ত ভূতকে দেখতে পায় ঝুঁটি তৈরীর পাথর খাদের খাড়াই লাল পাহাড়ের পাদদেশে। দুটো ভূতই লম্বকর্ণ। কানের লতি পেণ্ডুলামের মত ঝুলছিল কাঁধ পর্যন্ত। গালে লম্বা দাড়ি। নাক বাঁকানো আর লম্বা। এত রোগা যে পাঁজরা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বুকে। চুপচাপ বাড়ী এসে মূর্তি দুটোকে কাঠে খোদাই করে ফেলেছিল রাজা—পাছে কি রকম দেখতে তাদের পরে ভুলে যায়, তাই। এই মূর্তির নাম মোয়াই-কাভা-কাভা। অপার্থিব বিকট ভূতুড়ে মূর্তি। ঈস্টার দ্বীপের কাঠখোদাই মূর্তি এরই অনুকরণ—বদলায় নি একটুও। খাওয়া শেষ হতে কাঠ বার করে মোয়াই-কাভা-কাভা আর তাঙ্গাতা-মানুষ অথবা পাখীমানুষ তৈরী করতে শুরু করল কয়েক জন —বুড়োরা মত্ত রইল সেকালের গল্প নিয়ে।

শুরু হল ভূতের গল্পের আসর। গায়ের লোম খাড়া করে দেওয়ার মত গল্প। পিদিমের ছায়া কাঁপতে লাগল গুহার দেওয়ালে। নরখাদক ভূতেরা গভীর রাতে এসে নাড়িভুঁড়ি খাবার বায়না ধরত। সমুদ্রে থাকত একটা মেয়ে ভূত, লম্বা হাত বাড়িয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে একলা মানুষ পেলেই ধরে নিয়ে যেত দ্বীপবাসীদের। মেয়রের অ্যাসিস্টান্ট ল্যাজারাসের ঠাকুমাকে একটা বজ্জাত ভূত পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল জলের মধ্যে। সব ভূত কিন্তু এমন নয়—বন্ধু ভূত অনেক আছে। বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ কোনো পরিবারকে এরা সাহায্য করে—অন্যের শত্রু তারা। এই সব ভূতকেই দ্বীপবাসীদের ভাষায় বলা হয় আকু-আকু

শেষ নেই ভূতেদের, শেষ নেই গল্পের। হঠাৎ খেয়াল হল। ভূতের কীর্তি তো সেইদিনই দেখা গেছে। সিনর কোনটিকি স্বচক্ষে দেখেছেন। গান গেয়ে ভূত নামিয়ে তবে তো পাথর খাড়াইয়ের হাত দিয়েছিল সবাই। এইটাই নিয়ম। লগির ঠেলা আর পাথরের গোঁজ ঠাসতে হয় ঠিকই, কিন্তু অদৃশ্য ভূত সহায্য করে যায় আগাগোড়া। আজকেই দেখা গেছে তার কীর্তি। এ ধরনের অভিজ্ঞতা তাদের এই প্রথম। অদৃশ্য ভূত সাহায্য করেছে মূর্তি তুলে দিয়ে।

খুঁটি দিয়ে পাথরের মূর্তিতে চাড মারার সময়ে হঠাৎ কোনো রকম ঠেলা না খেয়েই মূর্তির মাথাটা উঠে গেছিল কয়েক ইঞ্চি ওপরে।

'অদ্ভুত, খুবই অদ্ভুত।' বললে একজন।

ইতিমধ্যে থরসাহেবের ছেলে রাত কাটিয়ে এল রানো রারাকুর আলা-মুখের মধ্যে। ওরোনগোতে মাটি খোঁড়ার কাজে হাত লাগিয়েছিল সে পুরাতত্ত্ববিদদের সঙ্গে। তারপর মাথায় চাপল অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। পাখী মানুষদের গ্রামের ধ্বংসস্তূপে রাত্রে ঘুমোনোর সখ হল। কয়েকটা পাথর-কুটির এখনো আস্ত আছে সেখানে। পাহাড়ের মাথায় তৈরী সেই কুটির থেকে চোখে পড়ে গোটা ঈস্টার দ্বীপ আর প্রশান্ত মহাসাগর। একপাশে হাজার ফুট নিচে সমুদ্র। আর একপাশে নেমে গেছে আগ্নেয়মুখের দেওয়াল বহু নিচে জলাভূমি পর্যন্ত।

স্লিপিংব্যাগ নিয়ে এই খানেই ঘুমোতে গেল জুনিয়র থর। বারণ করল দ্বীপবাসীরা, বিপদজনক ঝুঁকি নিচ্ছে ছেলেটা। আকু আকু অপদেবতার আড্ডা ওখানে। কিন্তু জুনিয়র থর যখন কারো কথা কানে তুলল না, খবর পাঠানো হল সিনিয়র থরসাহেবকে। তিনিও নির্বিকার রইলেন। অগত্যা তিনটি মেয়েকে সঙ্গে দেওয়া হল। ভোর হতেই ভূতের ভয়ে পালিয়ে এল মেয়ে দুটি। সারারাত নাকি তারা ঘুমোতে পারে নি। আওয়াজ শুনেছে, আলোর স্ফুলিঙ্গ দেখেছে জলাভূমিতে প্রতিফলিত আকাশের তারাও নাকি নেচেছে আকু-আকুদের নির্দেশে।

পরের রাতগুলো একাই ঘুমোলো থরসাহেবের ডানপিটে ছেলে। এক রাত, দু'রাত নয়—চার মাস রইল সেখানে। হিরো বনে গেল দ্বীপবাসীদের চোখে। আকু-আকুদের যে বশ মানাতে পারে, সে সোজা ছেলে নয়। হাজার হোক সিনর কোনটাইকির ছেলে তো।

কুসংস্কারের শেষ কিন্তু এখানেই নয়—শুরুই বলা যায়।

এসতেভান ছোকরার পেট থেকে গুহার গুপ্তরহস্য কায়দা করে বার করা নিয়ে যখন ব্যস্ত থরসাহেব, ঠিক সেই সময়ে মূর্তি উপহারের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হল ল্যাজারাস—মেয়রের ডান হাত। ঈস্টার দ্বীপে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্যতম সে। দ্বীপবাসীরা যে তিনজনকে নির্বাচিত করেছে প্রতিনিধি হিসেবে, ল্যাজারাস তাদের অন্যতম। মেয়রের মতে, এই কারণেই নাকি বিপুল বৈভবের অধিকারী সে। এসতেভানের রক্তে যেমন লম্বকর্ণ আর হ্রস্বকর্ণদের মিশেল আছে, ল্যাজারসের রক্তে তা তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে কচিৎ কদাচিৎ দৈবাৎ এসে পড়া ইউরোপীয়ান টুরিস্টদের

ছিটোফোঁটা রক্ত। শরীরখানা দেখবার মত, কিন্তু করোটির গঠন দেখে মনে হয় ঈস্টার দ্বীপেই মানব সভ্যতার প্রথম প্রভাত শুরু হয়েছিল। কপাল চাপা এবং ছোট, ঠেলে বেরিয়ে আসা ভুরু, চিবুক ছোট এবং মুখের তল দেশও সামনের দিকে বার করা, নাক আর ঠোঁট রীতিমত মোটা, সারি সারি ঝকঝকে দাঁত এবং নকক চোখ ছুঁচো জন্তুর চোখের মত। তা সত্ত্বেও প্যাত্রারাম নির্বোধ নরবানর নয়। অস্বাভাবিক সতর্ক এবং পরিহাস প্রিয়। কুসংস্কার তাকেও ছেড়ে কথা কয় নি—অন্ধকার করে রেখেছে মনের চেতনটা।

ওরোনগোর একটা ভাঁড়চোরা বাড়ীর ছাদের টালিতে অজ্ঞাত ধরনের কয়েকটা পাথর খোদাই পাওয়া গেল একদিন। একই সময়ে আবিষ্কৃত হল বাদো পাথুরে মাটির মধ্যে পোঁতা হাঁটু গেড়ে বসা মূর্তিটা। সন্ধ্যে নাগাদ লশকরেরা হাতের কাজ বন্ধ করতেই প্যাত্রারাম ডেকে নিয়ে গেল খরসাহেবকে।

বললে ষড়যন্ত্রকারীর মত চাপা গলায়—'এখন দাবো, আপনার একটা রোঙ্গো-রোঙ্গো।' বলে নির্নিমেষে লক্ষ্য করতে লাগল খরসাহেবের মুখের ভাব পরিবর্তন।

কথা শুনেই খরসাহেব বুঝলেন, আবার একটা গোপনীয় ব্যাপার জানা যাবে। মুখের ভাব নির্বিকার রেখে বললেন—'ঈস্টার দ্বীপে রোঙ্গো রোঙ্গো আর নেই'

'আছে। এখনও কিছু আছে।'

'আছে, তার কাঠ এত পচে গেছে যে হাত দিলেই গুঁড়িয়ে যাবে।'

'মোটেই না। আমার ঠাকুর্দার ভাই [illegible] রোঙ্গো রোঙ্গোয় হাত দিয়েছে।'

বিশ্বাস হলো না খরসাহেবের। অবিশ্বাসটা চোখ এড়ালো না প্যাত্রারামের। খরসাহেবকে নিয়ে গেল মন্দির-প্রাচীরের পেছন দিকে—মূর্তি খাড়া করা হচ্ছে সেখানে প্রস্তর স্তূপের ওপর। এখন অবশ্য জায়গাটা ফাঁকা। খানিক কাছে এসে প্যাত্রারাম বললে—তার দুজন ভুতো ভাই আছে—ড্যানিয়েল আর আলবার্তো পাইকা। ড্যানিয়েলের জন্ম আলবার্তোর একঘণ্টা আগে। তা সত্ত্বেও তাদের ফ্যামিলি গুহার গুপ্ত রহস্য রাখতে দেওয়া হয়েছে আলবার্তোকে। অনেক অদ্ভুত জিনিস আছে। দু বছর আগে গুহা থেকে দুটো রোঙ্গো-রোঙ্গো বাড়ী নিয়ে গেছে আলবার্তো। একটাকে খোদাই করা হয়েছে ল্যাজওলা মোটা সোটা মাছের আকারে। দুটোতেই ক্ষুদে ক্ষুদে সংখ্যা খোদাই করা আছে।

এত পুরোনো হওয়া সত্বেও ফলক দুটো অত্যন্ত কঠিন এবং প্রায় কালো বললেই চলে। ল্যাজারাস এবং আরো অনেকে দেখেছে জিনিস দুটো। কিন্তু গুহার বাইরে নিয়ে আসার পাপে সেই রাতেই একটা আকু-আকু এসে খোঁচা মেরে আর চিমটি কেটে ঘুম ভাঙায় অ্যালবার্তোর। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে হাজার হাজার ক্ষুদে ক্ষুদে মানুষ ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করছে। ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে সেই রাতেই রোঙ্গো-রোঙ্গো-দুটোকে গুহার মধ্যে রেখে আসে সে। 'হাঙ্গা-ও-তেয়ো' উপত্যকার খুব কাছেই এই গুহা। তুতো ভাইকে রাজী করাবে ল্যাজারাস। ভয় ঝেড়ে ফেলে যেন ফের যায় গুহায়, নিয়ে আসে ফলক দুটো থরসাহেবের জন্যে।

ল্যাজারাসের পেট থেকে আরো খবর বার করে নিলেন থরসাহেব। ওর ফ্যামিলির এক নয়, একাধিক গুহা আছে। হাঙ্গা-ও-তেয়ো উপত্যকার খুব কাছেই ল্যাজারাসের নিজের একটা গুহা আছে। রোঙ্গো-রোঙ্গো নেই সেখানে, কিন্তু আছে অন্যান্য জিনিস। থরসাহেবকে এই গুহায় নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই কিন্তু বেঁকে বসল ল্যাজারাস। বিপজ্জনক প্রস্তাব! ওকে নিয়ে গুহায় ঢুকলে দুজনের কাউকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। ফ্যামিলি আকু-আকুর নিবাস ঐ গুহায়। দুজন পূর্বপুরুষের দুটো কংকালও রয়েছে ওখানে। অধিকার যার নেই, এমন লোক বেআইনীভাবে গুহায় ঢোকবার চেষ্টা করলেই ভীষণ প্রতিশোধ নেবে আকু-আকু। গুহার প্রবেশ মুখ একটা পবিত্র গুপ্ত রহস্য। কাউকে জানানো যায় না। হেসে ফেললেন থরসাহেব। বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নিরেট দেওয়ালের মতই নির্বিকার রইল ল্যাজারাস।

অনেক চেষ্টার পর ল্যাজারাস কথা দিলে, গুহা থেকে জিনিসপত্র কিছু এনে দেবে থরসাহেবের জন্যে। কিন্তু কি চান থরসাহেব? ডিমশুদ্ধ পাখী-মানুষ না, ডিমছাড়া? রোঙ্গো-রোঙ্গো ছাড়া সম্ভাব্য সব বস্তুই আছে তার গুহায়। নানান ধরনের কয়েকটা জিনিস আনতে বললেন থরসাহেব—যাতে দেখেশুনে বেছে নিতে পারেন। ল্যাজারাস তাতে রাজী নয়। জিনিসের অভাব নেই গুহায়। কিন্তু একটার বেশী আনতে পারবে না সে। এই পর্যন্ত কথা এগোতেই বাগড়া পড়ল একটা অন্য খবর আসায়। বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে অদৃশ্য হল ল্যাজারাস।

পরের দিন থরসাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন কিভাবে রাজ্যের পাথর এনে জড়ো করছে লম্বকর্ণরা প্রস্তর-স্তূপের পাশে, এমন সময়ে মেয়র আর ল্যাজারাস দুজনেই এল তার কাছে।

খাটো গলায় বললে মেয়র—'সিনর, আকু-আকু সাহায্য করে যাচ্ছে আপনাকে। নইলে আমরা এই বারোজনে এ কাজ সামলাতে পারতাম না। অদৃশ্য সহায় আছে বলেই পারছি।'

গুহার কাছেই উনুনে রোজ নাকি একটা মুরগি সেঁকে নেয় মেয়র—যাতে মূর্তিটা ঝটপট খাড়া হয়ে যায়।

থরসাহেব দাবড়ানি দিয়েছিলেন তাকে কুসংস্কারে বিশ্বাসী হওয়ার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে সেকী প্রতিবাদ দুজনের। থরসাহেব জানালেন, ও-সব আকু আকু গল্প তিনি একেবারেই বিশ্বাস করেন না। শুনে এমন ভাবে তাকালো দুজনে যেন থরসাহেব একটা আকাট মূর্খ। আকু-আকু আছে বই কি, আলবৎ আছে। এক সময়ে গোটা ঈস্টার দ্বীপটা গিজ গিজ করত আকু-আকুতে, এখন অবশ্য সংখ্যায় তারা বেশী নেই, কিন্তু দ্বীপের কয়েক জায়গায় মেয়ে পুরুষ দু-রকমের আকু-আকু এখনো বহাল তবিয়তে আছে। জায়গাগুলোর নামও তারা জানে বই কি। এদের কেউ মানুষের বন্ধু, কেউ শত্রু। এদের সঙ্গে যারা কথাবার্তা বলেছে, তাদের মুখেই শোনা যায় বাঁশির মত সরু তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর এদের। আকু-আকুদের অস্তিত্ব প্রমাণ করার উপাদানের অভাব নেই, ঝুড়ি ঝুড়ি হাজির করা যাবে থরসাহেব যদি চান।

হার মানলেন থরসাহেব। সমুদ্রে মাছ নেই। কিংবা গ্রামে মুরগী নেই বললেও ওরা বিশ্বাস করত। কিন্তু দ্বীপে আকু-আকু নেই, তা কি বিশ্বাস-যোগ্য? বেশ কিছু উদ্ভট ধারণার বশবর্তী হয়ে দ্বীপবাসীরা অমূল্য সম্পদে ঠাসা অজ্ঞাত গুহাগুলোকে বহির্জগতের চোখের আড়ালে রেখে দিতে বদ্ধপরিকর।

গাড়ী হাঁকিয়ে ফাদারের কাছে গেলেন থরসাহেব। ঈস্টার আয়ল্যাণ্ড আর দ্বীপবাসীদের সম্বন্ধে ওঁর চেয়ে বেশী সংবাদ জীবিত আর কেউ রাখে না। থরসাহেব জানতেন, ফাদারকে গোপনে কিছু বললে, তা গোপন থাকবে। নিজের বইতে ফাদার দ্বীপের রহস্য সম্পর্কে যা লিখেছিলেন—থর সাহেবের তা মনে আছে এখনো:

গুপ্ত গুহাও আছে দ্বীপে। বিশেষ ফ্যামিলির সম্পত্তি হিসেবে দেখা হয় এই সব গুহা। ফ্যামিলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কেবল জানে সেই ফ্যামিলির নিজস্ব গুহার সন্ধান। খোদাই করা কাষ্ঠফলক 'রোঙ্গো-রোঙ্গো', ছোট মূর্তি এবং অন্যান্য বহু মূল্যবান বস্তু লুকিয়ে রাখা হয় এই সব গুহায়। প্রাচীনকালের মানুষরা কবরস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে এই সব গুহার ঠিকানা...

গুপ্ত গুহার ভেতরে এখনো যাতায়াত চলছে, থবসাহেবের মুখে এই খবর শুনে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে নিজের দাড়ি ধরে কিছুক্ষণ টানাটানি করলেন ফাদার সিবাসটিয়ান।

তারপর বললেন—'কক্ষনো না।'

নামধাম ফাঁস না করে থবসাহেব তখন জানালেন গুহা থেকে পাচার করা কয়েকটা মূর্তি এসেছে তাঁর কাছে। শুনতে শুনতে উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়লেন ফাদার। জানতে চাইলেন কোথায় আছে গুহাগুলো। যা জানতেন, থবসাহেব তাও বললেন। ভৌতিক গল্পের চোটে এ সব গুহার ধারে কাছে যাওয়ারও যে ক্ষমতা নেই তাঁর, তাও বললেন। উত্তেজনায় ঘরময় পায়চারি করতে করতে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন ফাদার। নিঃসীম নৈরাশ্যে দুই হাত মুঠি পাকিয়ে বললেন—কুসংস্কার এদের সর্বনাশ করেছে। এই তো সেদিন মারিয়ানা এসে বেশ গুরুত্ব দিয়ে বলে গেল আপনি নাকি মানুষ নন। মাথার কোষে কোষে যাদের কুসংস্কার ঢুকে বসে আছে, এক পুরুষে তাদের পেট থেকে সব কথা বার করা যাবে না। পূর্বপুরুষদের ওপর অসীম শ্রদ্ধা এদের। খৃস্টান হিসেবেও তুলনাহীন। কিন্তু কুসংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারছে না কিছুতেই।

আরো অনেক কথা বললেন ফাদার। ইয়োরিয়ার বদ্ধ ধারণা, তার পূর্বপুরুষ নাকি একটা তিমি। কোতুইতি উপসাগরে আটকা পড়েছিল সেই তিমি। ফাদার সিবাসটিয়ান পাদরী হতে পারেন,, কিন্তু এ ব্যাপারে সব কিছু জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ইয়োরিয়া এই কাহিনী শুনেছে বাবার কাছে, তিনি শুনেছেন তাঁর বাবার কাছে, তিনি শুনেছেন তাঁরও বাবার কাছে। ইনিই সব জানতেন। কেন না ইনিই ছিলেন সেই তিমি।

ইয়োরিয়ার মাথা থেকে এই তিমি কাহিনী বিতাড়িত করতে ব্যর্থ হয়েছেন ফাদার সিবাসটিয়ান।

এ বড় কঠিন ঠাঁই, হাড়ে হাড়ে বুঝলেন ফাদার এবং থবসাহেব। অপদেবতারা যে জায়গায় টহল দিচ্ছে, গুহামুখ আগলাচ্ছে, সেখানে কুসংস্কারাচ্ছন্ন দ্বীপবাসীদের নিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। হোলি ওয়াটার অর্থাৎ পূতসলিল দিতে চাইলেন ফাদার। দ্বীপের প্রত্যেকের অসীম আস্থা গির্জের এই জলের ওপর। মন্দিরের চরণামৃত আর মসজিদের জলপোড়া যেমন, গির্জের হোলি ওয়াটার ঠিক তাই। অপদেবতারা যেখানে প্রহরী, সেখানে পূতসলিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলে তেনারা প্রসন্ন হবেন। দ্বীপবাসীদের ভয় কাটবে। ফাদারকে কিন্তু এ ব্যাপারে টানলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। কেন না

ওরা কোনো গুপ্ত রহস্যই তাঁর কাছে ফাঁস করবে না। থরসাহেব যদি গুহার সন্ধান পান, রাতের অন্ধকারে এসে যাদারকে জানিয়ে যাবেন।

কুসংস্কার সভ্যমানুষের'ও অস্থিমজ্জায় কি নেই? তেরো সংখ্যাটা নিয়ে লোকে ভয়ে মরে কেন? কেন বহুতল অট্টালিকার তেরোতলা থাকে না? বারো তলার পরেই তেরোতলাকে চোদ্দতলা বলা হয় কেন? কেন নুন ছিটোতে ভয় পায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন সভ্যমানুষ? কেন, এরোপ্লেনে আসন সংখ্যা বারোর পরেই লাফিয়ে চোদ্দ সংখ্যায় পৌঁছায়? কেন ভাঙা আয়নায় মুখ দেখতে ভয় পায় মানুষ? কেন কালো বেড়াল রাস্তা পেরিয়ে গেলে ভবিষ্যতের ভাবনায় অনেকে পাগল হয়? ঈস্টার দ্বীপের বুদ্ধিমান মানুষ যাকে আকু-আকু বলছে, সভ্যমানুষরা ঠিক সেই ধরনের অশুভ শক্তিতে বিশ্বাস করে—শুধু অপদেবতার নামটা আকু-আকু দেয় নি। যে দ্বীপের গুহায় এত কংকাল আর করোটির ছড়াছড়ি, যে দ্বীপের পূর্বপুরুষদের বিরাট মূর্তি নিয়ে সভ্য মানুষরা এত রহস্য প্রকাশ্যে রচনা করে চলেছে—সেই দ্বীপের মানুষ আকু-আকু নামক অপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হবে, এ আর আশ্চর্য কী।

পুরুষানুক্রমে এই অবিশ্বাস দানা বেঁধে আছে এদের রক্তে। থরসাহেবের মত কেউ এ নিয়ে আগে মাথা ঘামায় নি। এই কারণেই দ্বীপবাসীদের মনের অন্দরে প্রবেশ লাভ সম্ভব হয়নি। যুক্তি দিয়ে এই কুসংস্কারকে তাড়ানো যায় না। দাবানলকে আগুন দিয়ে নেভাতে হয়—জল দিয়ে নয়। আগুনই আগুনের পরম শত্রু। ঈস্টার দ্বীপের মানুষও বিশ্বাস করে অপদেবতারা পাগলাচ্ছে দ্বীপের নানান অঞ্চল। এ সব জায়গায় রাত বিরেতে তো বটেই, দিনদুপুরে যাওয়াও বিপজ্জনক। এ দ্বীপের মহা আতংক এই আকু আকু কুসংস্কার। মেয়র এবং ল্যাজারাস দুজনেই তা মুখ কালো করে স্বীকার করে গেছে থরসাহেবের কাছে।

আগুনকে আগুন দিয়েই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। কুসংস্কারকে কুসংস্কার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না কেন? দ্বীপের লোক বিশ্বাস করে থরসাহেব অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী—ভূতেদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। সেই থরসাহেবও যদি বলেন যে, বাপু হে ভূতেরা এসে বলে গেছে, নিষিদ্ধ স্থানে এখন থেকে ঢুকে পড়ো আর কোনো ভয় নেই—তাহলে আর সুফল ফলবেই। সারারাত বিছানায় ছটফটিয়ে কাটালেন থরসাহেব। ওঁর স্ত্রী বললেন—'ব্যাপারটা বিপজ্জনক।' কিন্তু মদৎ জোগালেন স্বামীকে এগিয়ে যেতে।

পরের দিন ল্যাজারাস আর মেয়রকে নিয়ে ক্যাম্পের পেছনে পাথরের

আড়ালে মিটিং করলেন থরসাহেব। অসম্ভব প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। নিষিদ্ধ অঞ্চলের অনেক খবর রাখতেন উনি। 'ট্যাবু' কাকে বলে, জানতেন। দুই মক্কেলের বিশ্বাস উৎপাদন করতে বিলম্ব হল না। রসিয়ে রসিয়ে বললেন, ক্যানো নিয়ে নিজে গেছেন ভাই পো'র নিষিদ্ধ জলে, ঢুকেছেন ফাতুহিভা র পাতাল গুহায়। বড় ভয়ংকর সেই গুহা। পূর্বপুরুষরা নিষেধ করে গেছেন, সেই গুহায় ঢুকলেই বিপর্যয় অনিবার্য। সেই সেই-য়ের গুপ্ত পাতাল কক্ষেও প্রবেশ করেছেন—যেখানে 'ট্যাবু' এত প্রবল যে ঢুকলে কপালে অদ্ভুত দুর্গতি লেখা হয়ে যাবেই। শুনতে শুনতে চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল মেয়র এবং ল্যাজারাসের। ঠিক এমনি ঘটনা তো ঈস্টার দ্বীপেও ঘটে। কিন্তু অন্যান্য দ্বীপেও যে নিষিদ্ধ অঞ্চল আছে, তা তো জানা ছিল না তাদের। এখানেও 'ট্যাবু' অমান্য করলে ভোগান্তির একশেষ ঘটে। একবার তো একটা গোটা ফ্যামিলির কুষ্ঠ হল। আর একবার হাঙরে হাত কেটে নিয়ে গেল একজনের। ভীষণ বন্যায় নলখাগড়ার বাড়ীও ভাসিয়ে নিয়ে গেছে কতবার। সারারাত ভূতের খোঁচা আর চিমটি খেয়ে উন্মাদও হয়ে গিয়েছে অনেকে—নিষিদ্ধ গুহায় প্রবেশের এই তো পরিণাম! সিনর কোনটাইকির ভোগান্তি কি ধরনের হয়েছে?

'কিচ্ছু না,' বললেন থরসাহেব।

হতাশ হল ল্যাজারাস।—'হয়নি শুধু আপনার সঙ্গে 'মানা' আছে বলে।' 'মানা' একরকমের জাদুকরী ক্ষমতা—অলৌকিক শক্তি।

মেয়র আর এক কাঠি সরেস—'শুধু কি মানা, ওঁর নিজস্ব আকু-আকুও আছে। তাইতো ভাল ছাড়া খারাপ কখনো হয় না।'

এই হল সুযোগ।

বললেন থরসাহেব—'তাহলেই দেখুন। আমাকে আপনাদের নিষিদ্ধ গুহায় নিয়ে গেলে আমার ভালোই হবে—খারাপ কিচ্ছু হবে না।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল ল্যাজারাসের। বলল—'আপনার হবে না—কিন্তু আমাদের তো হবে।'

'কক্ষনো না, আমার আকু-আকু সব্বাইকে আগলে রাখবে,' বললেন থরসাহেব।

কিন্তু তাতে ভোলবার পাত্র নয় ল্যাজারাস আর তার ফ্যামিলি। আকু-আকু বড় ভয়ংকর চীজ। প্রতিশোধ নেবেই। নিজের গুহার ঠিকানা পর্যন্ত আর খুঁজে পাবে না—কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থেকেও চিনতে পারবে না গুহা কোথায়।

মেয়র বললে জাল ঠুকে—'ল্যাজারাসের ফ্যামিলি বড় যে সে ফ্যামিলি

নয়—অনেক গুহা আছে ওদের। বেজায় বড়লোক।'

গর্বে বুক দশ হাত হল ল্যাজারাসের।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল মেয়রের আত্মম্ভরিতা—'আমারও মানা আছে। আমার আকু-আকুই তো মূর্তিটাকে তুলে দিচ্ছে। লা-পেরুসে উপসাগরের একটা ছোট্ট আহু মন্দিরে আমার তিনটে আকু-আকু আছে। একটা হল পাখীর মূর্তি।'

অতএব, তিন মহাগুণী ব্যক্তি এক মাথা করে মত্ত হল নানান গল্পে। তিনজনেই 'মানা' শক্তির অধিকারী। তিনজনেই আকু-আকু অপদেবতার মালিক। তিনজনেই একই গুপ্ত রহস্যের ভাগীদার। ল্যাজারাস আর মেয়র দুজনেই পঞ্চমুখ হল হাজার রকমের বড়াই নিয়ে। কি করে ভাগ্য ফেরে আর কপালে দুর্গতি ঘনিয়ে আসে, সব তাদের নখদর্পণে। এই তো সেদিন থরসাহেবের অজ্ঞাতসারে মেয়র দেখছিল উনি তাঁবুর একটা দড়ির গিঁট বাঁধছিলেন ডান দিক থেকে। কপাল খুলে যায় ডানদিক থেকে গিঁট বাঁধলে। কপালে ভোগান্তি থাকত যদি বাঁধতেন বাঁ দিক থেকে।

এবার চরম আক্রমণ শুরু করলেন থরসাহেব। জমি প্রস্তুত, আর দেরী নয়। বললেন, ঈস্টার দ্বীপের ফ্যামিলি গুহায় বাজে লোকের প্রবেশ নিষেধ করে গিয়েছিলেন পূর্বপুরুষরা পাছে অমূল্য সম্পদগুলো খোয়া যায় এই ভয়ে। এ জিনিস নিয়ে বেচাকেনা করলে কপাল তো পুড়বেই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের হাতে যদি তুলে দেওয়া যায় এই লুকোনো জিনিস তাহলে জিনিসগুলো ঠাঁই পাবে মিউজিয়ামের কাঁচের বাক্সের মধ্যে—কেউ হাত দিতে পারবে না —দেখে নয়ন সার্থক করা ছাড়া পথ থাকবে না। পৃথিবীর লোক তাজ্জব হয়ে যাবে ঈস্টার দ্বীপের প্রাচীন মানুষদের কীর্তি দেখে—আকু-আকু অপদেবতা প্রহরীও জিনিসগুলোর সঙ্গে মিউজিয়ামে চলে যাবে— গুহার মালিক ফ্যামিলির কারো কপাল পুড়বে না, কারো গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। দ্বীপের মানুষদের ভয় চলে যাবে—নির্ভয়ে সব জায়গায় যেতে পারবে।

ওষুধ ধরল। থরসাহেব ল্যাজারাসের মুখ দেখে বুঝলেন সে নরম হয়েছে।

সেইদিন রাত্রে আঁচড় পড়ল তাঁবুতে। এবার এসতেভান নয়, এসেছে ল্যাজারাস। সঙ্গে এনেছে একটা বিদঘুটে চ্যাপ্টা পাথর। মাকড়শার জাল মাখানো। বালি দিয়ে ঘসামাজা বা জল দিয়ে শোওয়া নয়। গুহা থেকে পাথর নিয়েই চলে এসেছে সটান তাঁবুতে। মূর্তিটার অদ্ভুত সরু লম্বা গোঁফ

দেখবার মত। আরও অনেক অদ্ভুত মূর্তি আছে এই গুহায়। তিন মাথা-ওয়ালা একটা বিচিত্র পাত্র দেখে এসেছে ল্যাজারাস, দেখেছে কিম্ভূতকিমাকার জন্তু আর মানুষের মত মূর্তি। জাহাজের মডেলও দেখেছে। গুহাটা আছে হাংগা-ও-তেয়ো'তে। ল্যাজারাস আর তিন বোন এই গুহার মালিক। ছোটবোনের বয়স মোটে কুড়ি। এসব ব্যাপার বোঝে না। বড় দুই দিদিকে রাজী করিয়ে আরও কিছু পাথর নিয়ে আসবে বাইরে। কই, ল্যাজারাসের আকু-আকু তো আর ক্ষতি করল না? দিব্বি বেরিয়ে এল পাথর নিয়ে। আর একটা গুহা আছে অ্যালবার্তোর গুহার কাছে। তিন নম্বরটা আছে ভিনাপুতে খাড়াই পাহাড়ের গায়ে; চতুর্থটা রানো রারাকুর মূর্তি-পাহাড়ে। এ গুহাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনটে ফ্যামিলি একত্রে মালিক এই গুহার। কিন্তু কেউ কারো জিনিস নেয় না। প্রত্যেকের আলাদা অংশ। ফ্যামিলি আকু-আকুরা পাহারা দিচ্ছে নিজের নিজের অংশ। জিনিস খোয়া যাওয়ার ভয় নেই। কংকাল ঠাসা এই গুহার প্রবেশপথের ঠিকানা কিন্তু ল্যাজারাস নিজেও জানে না। ভেতরে পা দেওয়ার বুকের পাটাও কোনদিন হয় নি।

পরের দিন সকালে দেখা গেল প্রশান্ত ভঙ্গিমায় আহু প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে এক-দুই-তিন হেঁকে মূর্তি খাড়া করাচ্ছে মেয়র। ভাব-লেশহীন মুখ। ল্যাজারাসের চারটে গুহা আছে। কিন্তু মেয়রের যে একটিও নেই, তা হতে পারে না, অথচ এত কথার মধ্যেও তা সে প্রকাশ করে নি। শুধু বড়াই করে গেছে নিজের 'মানা' আর লা-পেরুসে উপসাগরের ছোট্ট আহুর বাসিন্দা তিনটে আকু-আকু নিয়ে। এ ছাড়াও যে তার ফ্যামিলি গুহা আছে, সে বিষয়ে বিন্দু বিসর্গ ফাঁস করে নি।

কড়া ওষুধ দরকার—মনে মনে বললেন থরসাহেব। মেয়রের মুখ খোলাতেই হবে—যে করেই হোক।

সেই দিনই বিকেলের দিকে আবার ল্যাজারাস আর মেয়রকে নিয়ে গুলতানি আরম্ভ করলেন থরসাহেব। মেয়র কি জানে এমনি গুপ্ত গুহা আর কাদের আছে?

না, মেয়র তা জানে না। তবে অনেকেরই আছে। যাদের আছে, তারা কাউকে তা বলে না। আবার এমন অনেক গুহা আছে, যার ঠিকানা কেউ আর পাবে না। কেন না, নিয়ম অনুসারে ফ্যামিলির কেবল একজনই গুহার খবর রাখতো। সেই লোকটি উত্তরাধিকার নির্বাচন করার আগেই পট করে মারা গেলে গুহা হারিয়ে গেছে চিরতরে। ল্যাজারাস বললে, এর

ফলেই নাকি অনেক ভোগান্তি শুরু হয় সেই ফ্যামিলিটির।

'সেই জন্যেই তো সব জিনিসপত্র মিউজিয়ামে রাখা দরকার।' কথাটা লুফে নিয়ে বললেন থরসাহেব—'সেখানকার ঠিকানা সবাই জানে। জিনিসও কোনোদিন হারাবে না। হারিয়ে গেলেই তো কপাল পোড়ে।'

মেয়র বাধা দিয়ে বললে—'কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা পই-পই করে বলে গেছে গুহার মধ্যে রাখতে।'

'তার কারণ নলখাগড়ার কুঁড়েঘরে নিরাপদ নয় বলে—হারিয়ে যেতে পারে বলে—চুরি যেতে পারে বলে। গুহার চেয়েও নিরাপদ কিন্তু মিউজিয়াম—সেখানে দারোয়ান থাকে। জিনিস অক্ষত হয়ে থাকে চোখের সামনে কাঁচের আলমারীতে।'

যুক্তি মনে ধরল না মেয়রের। বাপঠাকুর্দার নিষেধাজ্ঞার জোর তার কাছে অনেক বেশী। তার নিজস্ব 'মানা' আছে। তিন তিনটে বশংবদ আকু-আকু অপদেবতা আছে—পূর্বপুরুষরা কিন্তু একবারও কাউকে দিয়ে খবর দেয়নি যে নিষেধ নেই। এখন থেকে অবারিত দ্বার হোক—জিনিসপত্র বিদেশের সমস্ত মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

থমকে গেলেন থরসাহেব। বড় কঠিন ঠাঁই। নিজের গুহা আছে—একবারও তা কিন্তু বলল না। কিন্তু গুহার জিনিসপত্র বার করারও বিরোধিতা করে গেল। অদ্ভুত লোক বটে। লাজারাস পর্যন্ত মেয়রের যুক্তিতে টলে গেল মনে হল। তখন আরো উন্মাদ প্ল্যান আঁটলেন থর-সাহেব। মেয়রকে এমন কিছু অলৌকিক চিহ্ন দেখানো দরকার যা দেখে তার ধারণা হয় যে পূর্বপুরুষরা গুপ্ত গুহা থেকে তুলে নিয়েছেন সমস্ত নিষেধ তা—'টাবু' আর নেই [illegible]।

সমতল জমির শেষে ক্যাম্পের ঠিক পাশেই ছিল একটা পুরোনো আহু। মূর্তিগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে ধাপের ওপর। দ্বিতীয় মহাযুগে নতুন নির্মাণ-কাজের সময়ে মূল প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যাচ্ছেতাই ভাবে। কাজ কিন্তু শেষ হয় নি, তারপরেই শুরু হয়েছে ভাঙচোরের পর্ব। বড় বড় পাথরের চাঁই আর গোল পাথর রাশি রাশি পড়ে আছে সামনে বালির ওপর। এইখানেই একদিন [illegible] থেকে বালি চেঁচে ঢুকতে গিয়ে খটকা লাগল। তিমির নাক না? চ্যাপ্টা পাথরে দেখা [illegible] একটা তিমির নাক খোদাই করা রয়েছে। পাথরটার ওপর আর একটা বড় পাথর চাপা থাকায় তিমির বাকী দেহাংশ আর দেখা যাচ্ছে না। পাথর সরিয়ে পাওয়া গেল ফুট তিনেক লম্বা একটা তিমির মুণ্ড। হাত ফসকে পাথরটা গিয়ে পড়ল বালির মধ্যে।

অন্যান্য পাথরের মতই দেখতে তার পেছন দিকটা—কে বলবে উল্টোদিকে খোদাই করা হয়েছে তিমিব মূর্তি।

পাথরটা পড়েই রইল পেছন দিক আকাশের দিকে ফিরিয়ে। ধরসাহেবের মাথায় এল নয়া মতলব। তিমি খোদাই পাথর আর কেউ দেখে নি। ঠিক করলেন, মধ্যরাত্রে তাঁবুর মধ্যে প্রেতচক্র করবেন মেয়র আর ল্যাজারাসকে নিয়ে। পূর্বপুরুষদের নির্দেশ'জ্ঞা যে আর বলবে এই তার নিদর্শন স্বরূপ মাটির মধ্যে থেকে উঠিয়ে আনবেন একটা প্রাচীন মূর্তি। আসলে হবে গোঁড়া মেয়রের—হাতে হাতে বুঝবে ট্যাবুর দিন ফুরি য়েছে--আকু আকু স্বয়ং সেকেলে মূর্তি এনে দিচ্ছে ধরসাহেবকে।

অন্ধকারে গা ঢেকে ক্যাম্পে এল মেয়র আর ল্যাজারাস। ঠিক তার আগেই শেষবারের মত দর্শন দান করে তাঁবু ছেড়ে গেছে এডভেঞ্চার। ধর গৃহিনী ভয়ের চোটে কাঠ হয়ে শুয়ে অন্ধকার তাঁবু.—ঘুম উড়ে গেছে চোখের পাতা থেকে। ঘুমোচ্ছে অন্যান্য তাঁবুর আর সবাই।

ধরসাহেব বললেন কি করতে হবে রাত্রি নিশীথে। পেছন পেছন দাঁড়াবেন তিনজনে। হাত রাখবেন সামনের জনের ওপর। তারপর গোল হয়ে ঘুরে আসবেন যে কোনো একটা অঞ্চলে। গভীর মধ্যে পরের দিন সকালে আকু-আকু এনে রাখবে পূর্বপুরুষদের তৈরী যা হয় একটা মূর্তি। ট্যাবু যে আর নেই, সেকেলে মূর্তি প্রকাশ হলে আর যে কাউকে শাস্তি পেতে হবে না—এটা প্রমাণ করার জন্যেই আকু-আকুর নির্দেশেই দরকার এই অনুষ্ঠানের।

বেরিয়ে পড়লেন তিনজনে। সবার আগে রইলেন ধরসাহেব—দু'হাত আড়াআড়ি রাখলেন, বুকের ওপর। পেছনে থেকে মেয়র দু হাত রাখল তার কাঁধে। একদম পেছনে রইল ল্যাজারাস।

অন্ধকারে কোথায় পা ফেলছেন দেখতে না পেয়ে অনেকবার হোঁচট খেলেন ধরসাহেব। হাসির দমকে তখন তাঁর পেট ফাটবার জোগাড়। বাকী দুজন প্রেতচক্রের চক্রী হতে পেরে যেন কৃতার্থ হয়ে গেছে। অসম্ভব গম্ভীর এবং সিরিয়াস। শেকলে বাঁধা কুত্তার মত পায়ে পায়ে আসছে পেছন পেছন। বৃত্তাকারে টহল দিয়ে এসে দাঁড়ালেন তাঁবুর সামনে। কেউ কারো সঙ্গে কথা বললেন না। মাথা হেলিয়ে শুধু অভিবাদন জানানো হল পরস্পরকে। তারপর ধরসাহেব ফিরে এলেন তাঁবুতে—দুই সঙ্গী গেল গুহা অভিমুখে।

দিনের আলো দেখা দেওয়ার আগে হাজির হল মেয়র। গতরাতে হোতু

মাতুয়ার গুহার বাইরে নাকি সে একটা রহস্যময় আলোকপুঞ্জ দেখেছে? সে আলো দ্বীপগাঁভীর আলো নয়। কাজেই আজ বরাত খুলে যাবে আশা করা যাচ্ছে—ঐ আলো নাকি তারই সংকেত। অভিযানের অন্যান্য দৈনিক প্রোগ্রাম মাফিক কাজকর্ম শুরু করে দিয়ে মেয়র আর ল্যাজারাসকে থর-সাহেব বললেন বিশ্বস্ত এবং সৎ কাউকে নিয়ে আসতে—গতরাতের গভীর মধ্যে খুঁজে দেখবে পাথর আছে কিনা। তৎক্ষণাৎ নিজের ছোট ভাইকে এনে হাজির করল মেয়র। নাম তার আতান আতান। সরল সাদাসিধে মানুষ। মনটা নাকি সোনা দিয়ে গড়া। গ্রামের সবাই জানে। আতানকে প্রস্তরস্তূপের কাছে নিয়ে তল্লাশিপর্ব আরম্ভ করলেন থরসাহেব। বালির ওপর পড়ে থাকা প্রত্যেকটা পাথর যেন উল্টে দেখে আতান। পূর্বপুরুষদের তৈরী শিল্প নিদর্শন দেখলেই যেন চেঁকে ওঠে। পুরো ব্যাপারটাকে নাটকীয় করার জন্যে উল্টো দিক থেকে তল্লাসি শুরু করলেন থরসাহেব, যাতে ঝট করে তিমিকে উদ্ধার করা না যায়।

প্রথম বস্তুটা পেল আতান স্বয়ং—লাল পাথরে খোদাই অদ্ভুত একটা বস্তু। তারপরে থরসাহেব নিজে পেলেন একটা পাথরের উকো আর কালো আগ্নেয় পাথর অবসিডিয়ান দিয়ে তৈরী একটা কুড়ালি। আর একটু পরেই হাঁক শোনা গেল আতানের। একটা বড় পাথর উল্টে ফেলে তলা থেকে বালি চেঁচে কি যেন পেয়েছে। মেয়র, ল্যাজারাস এবং থরসাহেব তিনজনেই দৌড়োলেন। একটা তিমির মূর্তি পেয়েছে আতান—ভারী সুন্দর দেখতে। চ্যাপ্টা পাথরে উৎকীর্ণ মূর্তিটা কিন্তু থরসাহেবের পাওয়া মূর্তির মত নয়। মূর্তি খাড়াইয়ের কাজ ফেলে রেখে দৌড়ে এল লম্বকর্ণরা। চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল মেয়রের। আকু-আকুর শক্তি প্রমাণ করে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল আতান এবং মেয়র দুজনেই। দারুণ সিরিয়াস হয়ে গেল ল্যাজা-রাস। এ জায়গা নাকি তার ফ্যামিলির। এখানকার আকু-আকুও তাদেরই আকু আকু। শিহরিত হল মেয়র। থরসাহেব যেন অপার্থিব প্রাণী—এমনিভাবে নেটিভরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল তাঁর পানে। ধ্বংসস্তূপে দুটো তিমির অস্তিত্ব আবিষ্কার করে থরসাহেব নিজেও কম অবাক হন নি।

জিজ্ঞেস করলেন—'এর আগে দেখেছো কেউ এ-জিনিস?'

না, কেউ দেখে নি। তবে একটা সেকেলে ছবির সঙ্গে জিনিসটার মিল আছে। ছবিটা একটা ডলফিনের—মামামা মাইইউকি।

থরসাহেব বললেন—'ঠিক এই রকমই আবার একটা জিনিস এবার দেখাবো।'

মূর্তি খাড়াইয়ের কাজে লোকজন ফেরৎ পাঠালো মেয়র। চারজনে হাত লাগাল পাথর উল্টে দেখার কাজে। একটার পর একটা পাথর উলটোতে উলটোতে লক্ষ্য বস্তুর প্রায় কাছাকাছি চলে এলেন থরসাহেব। এমন সময়ে স্টুয়ার্ড এল—খাবার তৈরী। থরসাহেব নিজেই তিমি বার করতে চান পাথরের গাদা থেকে। তাই বলে গেলেন—'সবুর, আমি এলে আবার কাজ আরম্ভ হবে।'

মেস তাঁবুতে বসে খানা খাচ্ছেন থরসাহেব, এমন সময়ে কানে ভেসে এল চিৎকার চেঁচামেচি কথা কাটাকাটির গলাবাজি। তার পরেই হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এল মেয়র। দুটো ছোকরা গণ্ডীতে ঢুকে একটা তিমি উদ্ধার করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল হোতুমাতুয়ার গুহায়—পাকড়াও করেছে মেয়র। একটু অন্যমনস্ক হতেই এই কাণ্ড ঘটেছে। ছোঁড়া দুটো নাকি মূর্তিটাকে বেচতে চায় থরসাহেবকে। ভীষণ উত্তেজিত মেয়রের সামনে দাঁড়িয়ে ফাঁপরে পড়লেন থরসাহেব। কি করা উচিত ভেবে পেলেন না। যে জিনিসটা তিনি নিজে বার করবেন কথা দিয়েছেন, ছোঁড়া দুটো তা বার করে ফেলেছে। এখন তো আর তিনি ম্যাজিক দেখাতে পারবেন না!

ঝটপট অকুস্থলে পৌঁছোলেন থরসাহেব। ছোঁড়া দুটোকে ফিরিয়ে আনছে ল্যাজারাস। মুখ কালো করে পাথরটা টেনে এনে যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিল ছেলে দুটো। কিন্তু রাখল কোথায়? অন্য জায়গায় রাখল নাকি?

হতভম্ব হয়ে গেলেন থরসাহেব। কথা পর্যন্ত বলতে পারলেন না। ওঁর নিজের রাখা তিমি পিঠ উঁচিয়ে এখনো পড়ে স্বস্থানে—কেউ স্পর্শ করে নি! ছোঁড়া দুটো আর একটা তিমি আবিষ্কার করে ফেলেছে। আকারে যদিও একটু ছোট।

ঘাবড়াৎ মাৎ—সবাইকে আশ্বাস দিলেন থরসাহেব। লাঞ্চ খেয়ে এসে উনি নিজে এবার বার করবেন আর একটা তিমি—আরও বড়, আরও সুন্দর!

খাওয়ার পর শুরু হল তল্লাসি পর্ব। গণ্ডীর ধারে এসে পৌঁছোলো সবাই—কিন্তু বাকী তিনজনেই পাশ কাটিয়ে গেল তিমি খোদাই পাথরটা। গণ্ডীর শেষে পৌঁছে সব পাথর উল্টে দেখার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়র বললে—'আর নেই!'

আসল পাথরটা দেখিয়ে থরসাহেব বললেন—'ওটা তো ওলটালেন না!'

'উলটেছি বইকি। দেখছেন না, ফ্যাকাসে দিকটা রয়েছে ওপর দিকে!'

চমকে গেলেন থরসাহেব। প্রকৃতির কোলে লালিত এরা রোদ্দুরজলা পাথরের চেহারা দেখেই বুঝতে পারে কোন্ দিকটা ফেরানো ছিল আকাশের দিকে। আসল পাথরের পেছন দিকটা ফ্যাকাসে ছায়াচ্ছন্ন—তাই ধরে নিয়েছে পাথর উলটেছে নিজেরাই।

'তাতে কী? আবার উল্টে ছাখো।'

চারজনে মিলে ধরাধরি করে উল্টোলেন ভারী পাথরটা।

ল্যাজারাস অস্ফুট চিৎকার করে উঠল। আতান চেঁচিয়ে উঠল গলার শির তুলে। বিহ্বলাহতের মত শুধু বিড় বিড় করল মেয়র—'কী ভয়ানক! কী ভয়ানক! আকু-আকুর এত ক্ষমতা!'

তৃতীয় তিমিকে দেখতে চারদিক থেকে দৌড়ে এল সকলে। অতি কষ্টে মুখভাব নির্বিকার রাখলেন থরসাহেব। কাকতালীয় যে এমন নাটকীয় হতে পারে কে জানত!

ইয়োরিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে শুধু বললে, থরসাহেবের যে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, সে তা জানে। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইল তিন-তিনটে তিমির দিকে। অথবা বলা যায় তার পূর্বপুরুষদের দিকে—তিমির বংশধর যে সে!

ম্যারিয়ানা কিন্তু নতুন খবর আনল। মেষপালক লিওনার্দোর কুঁড়েতে সে থাকে। কাল রাতে লিওনার্দোর বড়দা ডোমিঙ্গো ঘুমিয়েছে সেখানে। ভোর বেলা উঠেই বলেছে—'স্বপ্ন দেখলাম, সিনর কোনটাইকি পাঁচটা পাথর পেয়েছে।'

ঝটিতি বললে মেয়র—'তাহলে আরো দুটো এখনো বাকী।' বলেই লোকজন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাহাড়ের গাদার ওপর। থরসাহেবের সম্বিৎ ফেরার আগেই খুঁজতে খুঁজতে অত্যুৎসাহী কয়েকজন বেরিয়ে গেল গণ্ডীর বাইরে। ডোমিঙ্গোর স্বপ্ন সফল করতেই হবে—যে করেই হোক। বিকেল নাগাদ দুটো অস্পষ্ট খোদাই করা পাথর পাওয়া গেল। দুটোকেই তিমি বলে মেনে নেওয়া হল তৎক্ষণাৎ। পাঁচটা পাথর পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হল বালির ওপর।

একটা নুড়ি পাথর তুলে নিল মেয়র। পাথর পাঁচটার সামনে একটা বৃত্তাংশ এঁকে গর্ত করল মাঝে।

বললে—'ব্যস, যা হবার তা হয়ে গেল! এবার লাগাও গান।'

ল্যাজারাস আর মেয়র দুজনে মিলে গাইল হোতু-মাতুয়ার প্রাচীন স্তোত্রের একটা পদ। হুলা নাচের কায়দায় তালে তালে দুলে উঠল নিতম্ব। সে গান থামিয়ে ধরল আর একটা গান। তারপর কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে

আবার গান। আবার বিরক্তি। এইভাবে চলল সন্ধ্যা পর্যন্ত। তারপর গেল যে-যার বাড়ী।

পরের দিন কাক ডাকা ভোরে একবস্তা পাথর এনে তাঁবুতে পৌঁছে দিয়ে গেল ল্যাভারাস। সেই থেকে প্রতিরাত্রে সে বেরিয়ে যেত হোতু মাতুয়ার গুহা থেকে—কাক ডাকা ভোরে এক বস্তা উপহার হাজির করত থরসাহেবের সামনে। প্রতি রাত ভোরে চলল এই কাণ্ড।

তিন-তিনটে দিন বিমন হয়ে রইল মেয়র। তারপর আর পারল না সামলে থাকতে। থরসাহেবকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে তার এক বন্ধু বাগানে লুকিয়ে রেখেছে মস্ত একটা লাল পাথর। সংখ্যা দেওয়া পাথর নয়। বন্ধু কথা দিয়েছে, থরসাহেব পাথর নিয়ে জাহাজে রেখে আসতে পারেন।

থরসাহেব বুঝিয়ে বললেন দ্বীপের স্মৃতি স্তম্ভ জাতীয় কোনো পাথর বাইরে নিয়ে যাওয়ার অধিকার কারো নেই। হতাশ হল মেয়র। থরসাহেবের মন ভেজানোর অন্য পন্থা বাতলালো দুদিন পরে। বললে, দ্বীপের সবার সঙ্গে কথা বলবে এবার। যাদের ফ্যামিলি গুহা আছে, তারা যেন মূর্তি বার করে এনে পৌঁছে দেয় তাঁবুতে। কিন্তু নতুন পাথরকে পুরোনো পাথরের মত হাজির করলে যেন ঠকে না যান থরসাহেব—ধুয়ে মুছে মেজে ঘষে আনলেও যেন প্রবঞ্চিত না হন।

বললে—'এ দ্বীপের লোক ফ্যামিলি গুহার মূর্তি নিয়ে প্রকাশ্যভাবে কথা বলতে ভয় পায়। মূর্তিগুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখে।'

থরসাহেব বললেন—'খবরদার। তাতে মূর্তি নষ্ট হয়ে যায়।'

'কিন্তু আমার বাবা তো বলে গেছে ধুতে।'

এই প্রথম বেফাঁস কথা বলে ফেলল মেয়র। ফ্যামিলি গুহা তারও আছে—নইলে মূর্তি ধোয়ামোছার আদেশ বাবা দেবে কেন?

থরসাহেব বললেন—'ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে দিলেই হল। নইলে মূর্তি ক্ষয়ে যাবে।'

মেয়রের তখনো খেয়াল নেই। ঝোঁকের মাথায় বলে গেল আরও অনেক কথা। ছিদ্রময় লাভা পাথরে অনেক সময়ে পোকা ডিম পাড়ে, গাছপালার শেকড় গজায়। যে সব গুহা কেউ আর দেখাশুনা করে না, সেখানকার বেশীর ভাগ মূর্তিই ফেটে গেছে, জখম হয়েছে। নানান কথার ফাঁকে বলে ফেলল, প্রতি মাসেই তার নিজের সমস্ত মূর্তি সে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখে এই কারণে।

মেয়রের জিভের আগল তখন খুলে গেছে। থরসাহেব চোখ মুখ নির্বিকার রেখে শুনে গেলেন—ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলেও বাইরে তা প্রকাশ করলেন না। ধোয়া মোছার কাজ সারতে পনেরোটা রাত লাগে মেয়রের। একাজ করতে হয়—বউয়ের প্রবেশ নিষেধ সে অন্য ফ্যামিলির মেয়ে বলে। বউ যখন মাছ ধরতে যায়, মেয়র তখন গুহায় ঢুকে এখান থেকে ওখান থেকে ঝপাঝপ খানকয়েক মূর্তি টেনে নিয়ে সাফ করতে বেরিয়ে আসে। চারটে গুহা আছে তার। একটায় থাকে লোহার টাকা কড়ি। কিন্তু ঐ গুহা এত স্যাঁৎসেঁতে যে কাঠের মূর্তি থাকে না সেখানে। 'আনা মাইরো' নামে অন্য ধরনের আরো দুটো গুহা তার আছে। কিন্তু এদের ঢোকবার পথ সে জানে না। তিনবার সেখানে গিয়ে মুরগি পুড়িয়েছে। কিন্তু এখনো ভাগ্য খোলে নি। আর একবার চেষ্টা করবে।

সম্প্রতি তার নিজস্ব দুজন আকু আকু উপদেশ দিয়েছে, অন্যান্য গুহা থেকে সামগ্রী বার করে যেন সিনর কোনটাইকিকে দেওয়া হয়। মেয়রের বাবা কিন্তু উল্টো নির্দেশ দিয়েছিল। গুহা থেকে কোনো জিনিস যেন একদম বার করা না হয়। সিনর কোনটাইকি যদি তাকে একটা প্যান্ট, একটা সার্ট, খানিকটা কাপড় আর কয়েকটা ডলার দেন, তাহলে একটা গুহায় সে রেখে দেবে—কোনো আত্মীয়ের দরকার পড়লে বার করে দেবে।

মেয়র তার ঈপ্সিত বস্তু পেয়ে বিদায় হল। কিন্তু ফল দেখা গেল না। সেদিন কিন্তু মূর্তি খাড়া করার ষোড়শ দিবস চলছে। গভর্ণর টেলিগ্রাম পেয়েছেন। যুদ্ধজাহাজ 'পিন্টো' আসছে। ফেব্রুয়ারী মাস এসে গেছে—যুদ্ধজাহাজের বার্ষিক আবির্ভাবের সময় হয়েছে। মেয়র তাই ক্ষেপে গেছে পিন্টো'র আসার আগেই মূর্তি খাড়া করার জন্যে। জাহাজের ক্যাপ্টেন দেখলে খুশী হবে। এ দ্বীপে পা দেবার পর থেকে ক্যাপ্টেনই সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ায়। তার মন ভেজাতে পারলে চিলির প্রেসিডেন্ট ভাল রিপোর্ট পাবে মেয়র সম্বন্ধে।

মেয়র আরো কিছু দড়ি চেয়েছিল মূর্তিটাকে টেনে তোলার জন্যে। জাহাজের এবং ক্যাম্পের সব দড়ি লেগে গেছে কাজে—তাতেও কুলোচ্ছে না। থরসাহেব গেলেন গভর্ণরের কাছে দড়ির জোগাড়ে। গিয়ে শুনলেন, টেলিগ্রাম এসেছে—পিন্টো জাহাজ পরের দিনই আসছে দ্বীপে। কাজকর্ম এখন বন্ধ থাকুক। সমস্ত লম্বকর্ণকে নিয়ে থরসাহেবকে হাজিরা দিতে হবে গভর্ণরের কাছে—তিনি নিরুপায়।

মুখ অন্ধকার হয়ে গেল মেয়রের। ক্যাপ্টেনের কাছে বাহাদুরি দেওয়া

তো আর গেল না। মূর্তি খাড়াই অবস্থায় আর তো দেখানো গেল না!

ফেরার পথে হঠাৎ চাপা গলা'য় বললে মেয়র—'সিনর কোনটাইকি, আসুন আপনি আর আমি আমাদের আকু-আকুদের দিয়ে 'পিন্টো' জাহাজকে সমুদ্রে আর একটা দিন ঠেকিয়ে রাখি—পরশুর-আগে যাতে না আসে। আমার মূর্তি পরশুর মধ্যে খাড়া হয়ে যাবে।'

থরসাহেব ক্যাপ্টেনকে খবরটা দিয়ে ফিরে আসছেন, এমন সময়ে মোড়ের মাথায় দেখলেন অ'নাকেনার দিক থেকে একটা জীপ এসে দাঁড়িয়ে আছে। একরাশ ফটি এনেছেন গভর্নর। সেই সঙ্গে দিলেন একটা তাজ্জব খবর।

আর একটা টেলিগ্রাম এসেছে এইমাত্র। 'পিন্টো' জাহাজ পরশুর আগে আসছে না।

বুক ফুলিয়ে অর্থব্যঞ্জক চাহনি মেলে ধরল মেয়র। বললে—'সাবাস, সিনর কোনটাইকি।'

থরসাহেবের পেটের মধ্যে তখন হাসির বোমা ফেটেছে। অতি কষ্টে মুখভাব শান্ত রাখলেন। অবাকও হলেন। কাকতালীয় তাঁর এরকম সহায় হবে পদে পদে, এ-যে ভাবাও যায় না।

তখন রাত হয়েছে। জীপ ছুটে চলল নাচতে নাচতে দ্বীপের ওপর দিয়ে। কারোর খেয়ালই হল না যে মূর্তিটাকে খাড়া করতে একদিন নয়—দরকার ছটো দিনের। মেয়রের নিজেরও হুঁশ নেই। আকু-আকু নিয়ে বড়াই করে যাচ্ছে বিরামবিহীনভাবে। থরসাহেবের কানের কাছে মুখ এনে বললে ফিসফিস করে, তার গুহায় অবিশ্বাস্য অনেক বস্তু আছে। এতদিন একটা জিনিস পাচার করতে দেয় নি আকু-আকু। কিন্তু কদিন ধরে উল্টো সুরে গান দিচ্ছে। বড় লোভ দেখাচ্ছে।

পরের দিন সকাল বেলা, মানে, সপ্তদশ দিবসে, লোকজন নিয়ে উঠে পড়ে লাগল মেয়র। আবির্ভূত হল থুথুরে সেই বুড়ি। চুল যার সাদা, চোখে বিদ্যুৎ, মুখের আদলে আভিজাত্যের ছাপ। মেয়রের সর্বশেষ জীবিত পিসী সে। নাম, ভিক্টোরিয়া। কিন্তু তাহু-তাহু নামটাই তার বেশী পছন্দ। তহু-তহু মানে জাদুকরী। অনেক নাচল বুড়ি আকু-আকুকে তুষ্ট করে ভাগ্য ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে। দিনের শেষে কিন্তু দেখা গেল বিশাল মূর্তিটা নাক পর্যন্ত ঠেলে ওঠা প্রস্তর পিরামিডের ওপর হেলেই রইল—নেমে এসে আর খাড়া হল না বেদীর ওপর। বৃথাই অর্ধচন্দ্রাকারে পাথর সাজিয়ে তুকতাক তন্ত্রমন্ত্র নাচ গান করে গেল তাহু-তাহু,

আকু-আকু সদয় হল না। মূর্তি হেলে রইল খাপ ছাড়া ভাবে।

মুষড়ে পড়ল মেয়র। আর তেলা স্বকর্ণদের সাহায্য পাওয়া যাবে না। যুদ্ধজাহাজ এলেই জাহাজ থেকে চিনি, ময়দা এবং সারাবছরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নামাতে থাকবে সবাই। হিরো বনে যেতে পারত মূর্তিটাকে দাঁড় করাতে পারলে, কিন্তু ঘাটে এসে তরী ডুবল। শেষ রক্ষা করা গেল না।

থরসাহেব সেই রাতেই দলবল নিয়ে জাহাজে উঠলেন। কেন না, পরের দিন সকাল বেলা জাহাজ নিয়ে ওঁকে খাস দরিয়ায় যেতে হবে যুদ্ধজাহাজ 'পিন্টো'কে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার জন্যে।

এই দুটি জলপোত ছাড়াও আর একটি জলপোত ঈস্টার দ্বীপবাসীদের মন কেড়ে নেওয়ার প্রতীক্ষায় ছিল অভিযাত্রী জাহাজের ডেকে। সূর্যরশ্মিতে সোনালী সোনার মতই ঝকঝক করছিল বিচিত্র পোতটি। অলবণাক্ত জলে জন্মানো নলখাগড়া দিয়ে তৈরী একটা জলযান।

ব্যাপারটা শুরু ওরোনগোর পাহাড় চূড়ার ধ্বংসস্তূপে। সেখানে দুটি জিনিস আবিষ্কার করেছিল পুরাতত্ত্ববিদ এড। একটা কাঁদুনে-চোখওলা মূর্তি—যা ইন্কা ইণ্ডিয়ানদের বৈশিষ্ট্য। আর একটা জাহাজের ছবি—সিলিংয়ে পাথর খুদে আঁকা। নলখাগড়া দিয়ে তৈরী। পাশে দড়িদড়া ঝুলছে। এমন কি একটা চৌকানা পালও রয়েছে মাস্তুলের ডগায়।

ইউরোপীয়রা প্রথম যখন ঈস্টার দ্বীপে আসে, ঈস্টার দ্বীপবাসীদের নিজেদের হাতে তৈরী একজনের অথবা দুজনের বসবাস উপযুক্ত নলখাগড়ায় ছোট নৌকো তারা দেখেছে। এ-নৌকো ইন্কা ইণ্ডিয়ানরা চালায় স্মরণাতীত কাল থেকে পেরুর উপকূলে। কিন্তু ঈস্টার দ্বীপে পালওলা বড় নৌকো তৈরী হয়—এটা কেউ জানত না। থরসাহেবের কৌতূহল বৃদ্ধির আরো কারণ ছিল। লেক টিটিকাকায় টিয়াহুয়ানাকোর পাহাড়ি ইন্কা বন্ধুদের দিয়ে দাঁড় টানিয়ে নলখাগড়ায় তৈরী নৌকোয় উনি নিজে চেপেছেন। দেখেছেন এই ধরনের নৌকোর গতিবেগ হয় অবিশ্বাস্য। বহন ক্ষমতাও তাজ্জব করার মত। স্প্যানিয়াডরা যখন হানা দেয় সে-অঞ্চলে, খাস দরিয়ায় পেরুর উপকূলে দেখা গেছে এই ধরনের নৌকো। ইন্কা-পূর্ব আমলের জারের গায়ে আঁকা হয়েছে এই নৌকার ছবি। বেশ বড় নৌকো। জাহাজ বললেই চলে। পেরুর প্রাচীন সভ্যতা নলখাগড়ার জাহাজ চালিয়ে যে অভ্যস্ত ছিল—জারের ছবিই তার প্রমাণ। ঠিক এই ভাবেই প্যাপিরাসের জাহাজ বানাতো প্রাচীন মিশরীয়রা। বালসা কাঠের গুঁড়ি অলবণাক্ত

জলের নল খাগড়া দিয়ে তৈরী নৌকো নিয়েই বার দরিয়া'য় পাড়ি জমানো পছন্দ করত পেরুর প্রাচীন মানুষ। থরসাহেব নিজেও জানেন, নলখাগড়া-নৌকো মাসের পর মাস ভেসে থাকে, ডুবে যায় না। লেক টিটিকাকা থেকে এমন একটা নলখাগড়া নৌকো প্রশান্ত-মহাসাগরে এনে চালিয়েছিল তাঁর পেরু বন্ধুরা। নৌকো ধেয়ে গিয়েছিল রাজহাঁসের মত গতিবেগে—যে গতিবেগ বালসা-গুঁড়ির ভেলা'র দ্বিগুণ।

ঠিক এই নলখাগড়া-নৌকোর ছবি এখন পাওয়া গেল ঈস্টার দ্বীপের পাহাড় চুড়োর সিলিংয়ে—সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের শিখরে। শুধু নৌকো নয়। যে নলখাগড়া দিয়ে নির্মিত হয়েছে নৌকো—তারও সন্ধান মিলল ঐ জ্বালামুখেই। পাখী মানুষদের ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামের এক-দিকে খাড়াই পাহাড়ের নিচে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, আর একদিকে নিস্তরঙ্গ জলরাশি জ্বালামুখের তলদেশে—নৈসর্গিক নলখাগড়ার জঙ্গল। অদ্ভুত এই নলখাগড়া দিয়েই ঈস্টার দ্বীপবাসীরা নির্মাণ করেছে তাদের সেকালের জলপোত—করে এখনো। বছরে একবার পাখী-মানুষদের দ্বীপ থেকে পাখীর ডিম কুড়িয়ে আনার প্রতিযোগিতায় যে নলখাগড়া-নৌকো নিয়ে ছুটে যায় ডানপিটের দল— তার নাম 'পোরা'।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের বিলক্ষণ কৌতূহল জাগিয়েছে বিশেষ এই নল-খাগড়া। লেক টিটিকাকায় এই নলখাগড়া অঢেল জন্মায়। আমেরিকান অলবণাক্ত জলেই এর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। সেই তার আদি জন্মস্থান। কিন্তু ঈস্টার দ্বীপে মরা আগ্নেয়গিরির জঠরে সেই একই নলখাগড়ার জঙ্গল বিস্ময়কর নয় কি? পেরুর মরু উপকূলে কৃত্রিম জলসেচ করে চাষ করা হয় এই নলখাগড়ার—হিমসিম খেয়ে যায় সেখানকার মানুষ। কারণ, ওখানে বালসা গুঁড়ি পাওয়া মুস্কিল—বালসা ভেলা নির্মাণে যা অপরিহার্য। আমেরিকার অলবণাক্ত জলের সেই নলখাগড়া ঈস্টার দ্বীপে জন্মায় কি করে?

জবাব দিল দ্বীপবাসীরা। ওদের কিংবদন্তীর মধ্যেই আছে এই ধাঁধার জবাব। ফাদার সিবাসটিয়ান লিপিবদ্ধ করেছেন সেই কাহিনী। নল খাগড়া বুনো গাছপালার মত প্রথম থেকেই জন্মায়নি ঈস্টার দ্বীপে—'উরু'নামে এদের এক পূর্বপুরুষ প্রথম নলখাগড়ার চাষ করে আগ্নেয়-গিরির জঠরে। শেকড় নিয়ে গিয়ে পুঁতে দেয় প্রথমে রানো রারাকু-র ভেতরে, তারপরে রানো আরোই-য়ের ভেতরে। লম্বা নলখাগড়া দিয়ে দ্বীপের মানুষ, কুঁড়েঘর, ঝুড়ি, টুপি—সব কিছুই এককালে বানানো

হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এ-দ্বীপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ এই আমেরিকান নলখাগড়া। দ্বীপবাসীরা নিয়মিত নলখাগড়া কেটে আনে আলামুখের অভ্যন্তর থেকে। দূরবীনের মধ্যে দিয়ে এই নলখাগড়ার জঙ্গলেই একটা নলখাগড়া দিয়ে তৈরী নৌকা ভাসতে দেখেছিলেন থরসাহেব। বাচ্চারা বানিয়েছে স্নান করার জন্যে।

সঙ্গে সঙ্গে 'পোরা' বানানোর সখ হয়েছে থরসাহেবের। 'পোরা'র ছবি কেবল ইউরোপীয়রা এঁকে নিয়ে গেছিল। এ ছাড়া এ নৌকার চেহারা আধুনিক যুগের কেউ দেখেনি। দ্বীপের আশেপাশে খোলা সমুদ্রে এ নৌকোর বিচরণও কি ধরনের হতে পারে, সে অভিজ্ঞতাও কারো নেই।

নতুন সমস্যার বৃত্তান্ত শুনে কৌতূহলী হয়ে ফাদার সিবাসটিয়ান প্রস্তাব করলেন—"পাকারাতি' ভাইদের পাকড়াও করুন—ওরা সাহায্য করবে। চারভাই জানে নৌকো কি করে বানাতে হয়। মাছ কি করে ধরা হয়।'

কিন্তু নৌকো হয় দু-ধরনের। একজন মানুষের জন্যে ছোট নৌকোয় চেপে পাখী-মানুষের দ্বীপে ডিম কুড়োতে যাওয়া হয়। আর দুজন মানুষের বড় নৌকোয় চেপে যাওয়া হয় মাছ ধরতে।

থরসাহেব অর্ডার দিলেন, দুরকম নৌকোই বানানো হোক একটা-একটা করে।

পেড্রো, সান্তিয়োগো, ডোমিংগো আর তিমোতিও—এই চারভাই রাজী হল। কিন্তু ধারালো ছুরি চাই নলখাগড়া কাটবার জন্যে। আর চাই প্রচুর সময়—রোদ্দুরে নলখাগড়া শুকোনোর জন্যে।

ছুরি নিয়ে নলখাগড়া কেটে রোদ্দুরে শুকোতে দেওয়ার পর দেখা গেল সময় যা লাগবার, তার বেশী লাগছে। কেন না, ঘোড়ায় চেপে অন্যান্য দ্বীপবাসীরা গিয়ে কাটা নলখাগড়া বাণ্ডিল বেঁধে নিয়ে সরে পড়ছে। জল থেকে কেটে আনার ঝকমারির মধ্যে যাচ্ছে না। কাজেই, আবার ছুরি নিয়ে জলে নামছে চারভাই। রোদ্দুরে শুকোতে দিয়েই ছুটছে ঘোড়া নিয়ে দ্বীপময় টহল দিতে। 'মাহুতে' আর 'হাইউ-হাইউ' ঝোপের খোঁজ করছে। ঐ ঝোপ থেকেই তৈরী হবে দড়ি এবং সেই দিয়ে সেকেলে প্রথায় বাঁধা হবে নলখাগড়ার নৌকো।

ইতিমধ্যে একদিন থরসাহেব ছেলেকে নিয়ে পাহাড়চূড়ার তাঁবু থেকে আলামুখের সরোবরে গিয়ে দেখে এলেন নলখাগড়ার জঙ্গল। মানুষের চেয়েও লম্বা সবুজ নলখাগড়ায় ছেয়ে আছে চারদিক। এমনিতে পাহাড়ি

অঞ্চল—পা ফেলা যায় না। তার ওপর নলখাগড়া। জলে পা রাখলে মনে হয় যেন রাবার বোটে পা রাখা হল—দেবে যায়—কিন্তু ডুবে যায় না। নলখাগড়ার ধারে ধারে অন্যান্য গাছপালাও জন্মেছে। দুর্গম এই অঞ্চল থেকেই ঈস্টার দ্বীপবাসীরা কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে যায় উনুন ধরানোর জন্যে আর ঝুড়ি, কুঁড়ে, টুপি বানানোর জন্যে। উক্রকে ধন্যবাদ জানালেন থরসাহেব তার দূরদর্শিতার জন্যে। ঈস্টার দ্বীপবাসীদের সভ্যতা অনেক পেছিয়ে যেত আমেরিকান নলখাগড়াকে মরা আগ্নেয়-গিরির জঠরে রোপন না করলে।

স্প্যানিয়ার্ডরা প্রথম দ্বীপে নেমে দানবিক এই নলখাগড়া দেখেই চিনেছিল—দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আমদানী করা। আধুনিক উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা তাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলে রায় দিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ সুবিশাল সরোবরে ড্রিলিং করে অনুসন্ধান করেনি। থরসাহেবই প্রথম সে কাজ করবেন মনস্থ করলেন। ওঁর কাছে আট মিটার ড্রিলিংয়ের সরঞ্জাম আছে. তাই দিয়ে কার্পেটের মত পুরু নলখাগড়ার স্তর ভেদ করে তলা থেকে ঘাসের চাপড়া তুলে আনবেন। যুগ যুগ ধরে বহু পরাগরেণু অবিকৃত অবস্থায় বন্দী আছে সেখানে। সেই পরাগরেণু পাঠাবেন স্টকহোমের প্রফেসর ওলোফ সেলিংয়ের ল্যাবোরেটারীতে। তিনি বলে দেবেন কি ধরনের উদ্ভিদ জগৎ ছিল ঈস্টার দ্বীপে পুরাকালে এবং নলখাগড়াদের প্রথম কবে রোপন করা হয়েছিল আগ্নেয় সরোবরে।

কাজটা সহজ নয়। নলখাগড়া মাথায় আট ফুট উঁচু। ঘন সবুজ এবং নিরেট জঙ্গলাকারে ছেয়ে আছে দশ বিঘেরও বেশী সরোবরের সমস্ত অঞ্চল। সাড়ে চোদ্দ লক্ষ বর্গগজ পরিমিত অঞ্চলের মাঝে মাঝে বাদামী জলা। শ্যাওলা আর টলটলে জলের আভাস দেখা যায় কেবল পাহাড় চূড়া থেকে। কিন্তু নিচে নেমে পথ খুঁজে যাওয়া বিপজ্জনক। দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে ঈস্টার দ্বীপবাসীরাই কেবল পারে। খাবার সময়ে এইখান থেকেই জল নিয়ে যায় তারা।

ঈস্টার দ্বীপের নলখাগড়ার ইন্কা নাম 'তোতোরা'। বিশাল আখের ক্ষেতের মত উজ্জ্বল সবুজ এই তোতোরা জঙ্গলে ঢুকে ভয় পেয়ে যাবে যে কোনো আধুনিক মানুষ। জল এখানে এত গভীর যে তলদেশ পাওয়া যায় না। ফাদার সিবাসটিয়ান জানালেন খোলা জলে পাঁচশ ফুট দড়ি ফেলেও তলদেশের নাগাল ধরা যায় নি!

এই সরোবরের তোতোরা জঙ্গল থেকেই সেকালের নৌকোর সরঞ্জাম

চালান হয়েছিল সুদূর অতীতে। এই খানেই তাঁবু পাতলেন থরসাহেব। বিকেল নাগাদ এল নেটিভ ফোরম্যান তেপানো। থরসাহেবদের পথ দেখিয়ে সে নিয়ে চলল 'তোতোরা', জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে। পথ নেই—ঠেলে পথ করে নিতে হচ্ছে। 'তোতোরা' ঝাপটে ধরছে অভিযাত্রীদের—কখনো পচা নলখাগড়ায় পা ডুবে যাচ্ছে—সতেজ 'তোতোরা' খামচে ধরে শরীর টেনে তুলে আবার এগোতে হচ্ছে। শেষ নেই···শেষ নেই যেন ন-শ বিঘারও বেশী সুবিশাল এই 'তোতোরা' অরণ্যের।

এ যেন একটা ডাইনীর কড়া। বিরাট ভয়ংকর রোমাঞ্চকর। এখানে নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত মনে যাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। সবুজ নীল বাদামী হলদে আর কালো রঙের বিচিত্র সমন্বয় ন-শ বিঘারও বেশী পরিমিত জল জঙ্গলের ওপর। কোথায় উন্মুক্ত জলরাশি কফি রঙের, কোথাও কালো জাম রঙের। কোথাও পা ডুবে যাচ্ছে, কোথায় সর্বাঙ্গ তলিয়ে যাচ্ছে, হাঁচড় পাঁচড় করে কোনো মতে সাঁতরে খামচে ধরতে হচ্ছে তাজা নলখাগড়া। তেপানো পই-পই করে বলছে—'খবরদার! জলের ওপর মাথা রাখুন। ডুব দেবেন না। একবার একজন ডুব দিয়ে ভাসমান ঘাসের চাপড়ায় পথ হারিয়ে ফেলেছিল। জীবন্ত উঠতে পারে নি।'

কিন্তু মাথার ওপর গনগনে সূর্য, নিথর বাতাস আর ঠাসবুনানি অরণ্যের মধ্যে থেকে উন্মুক্ত জল দেখলেই যে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে যায়। মায়াবিনীর একী আকর্ষণ! জল ঈষৎ উষ্ণ—কিন্তু ডুব দিলেই কনকনে ঠাণ্ডা।

ড্রিলিংয়ের উপযুক্ত জায়গা কিন্তু পাওয়া গেল না। ঘাসের চাপড়া কোথাও দশ থেকে বিশ ফুট—তারপরেই তলায় জল। কোথাও জলের তলায় ডুবন্ত চাপড়া অথবা নলখাগড়ার রাশি। তলদেশ পাওয়া গেল না কিছুতেই। তেপানো জানালো—উন্মুক্ত জলরাশি স্থির নয় কোথাও। বছরের মধ্যে কতবার খোলা জল সরে সরে যায়—নলখাগড়া ঝাঁপিয়ে পড়ে দখল করে সে জায়গা। ডাইনীর কড়ায় স্থির নয় কিছুই—সব কিছুই চলমান।

সন্ধ্যের আঁধার ঘনিয়ে আসার আগেই আলামুখের কিনারায় ফিরে গেল তেপানো। আলামুখের তলদেশে রাত কাটালেন থরসাহেব ছেলেকে নিয়ে তাঁবুর মধ্যে। বাদার প্রকৃতি মোটামুটি জেনে ফেলেছেন—কাজেই তেপানোর সাহায্য ছাড়াই ঘুরে বেড়াতে পারবেন। চাপড়ার রঙ আর উপাদান দেখেই বুঝবেন পা দেওয়া উচিত হবে কিনা। দিন কয়েক না থাকলে ছেঁদা করে নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না।

পরের দিন শুরু হল নমুনা সংগ্রহের অভিযান। বাদার মধ্যে দিয়ে আলা

মুখের অপর প্রান্তে পৌঁছোলেন থরসাহেব। হঠাৎ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন ঘন সবুজ গাছ গাছড়ায় প্রায় ঢেকে যাওয়া একটা সুউচ্চ প্রাচীর। খুব কাছ থেকে না দেখলে এ প্রাচীরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।

প্রাচীরের ওপর উঠে স্তম্ভিত হলেন। পর পর কয়েকটা সুবিস্তৃত চাতাল সিঁড়ির ধাপের মত উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে ওপর দিকে। ঝোপে ঢাকা কয়েকটা রন্ধ্রপথও দেখা যাচ্ছে—প্রস্তর কুটিরে ঢোকার প্রবেশ পথ!

কী আশ্চর্য! লোকচক্ষুর আড়ালে হারিয়ে যাওয়া আগ্নেয়গিরির ভেতর-কার এই ধ্বংসস্তূপের খবর তো নেটিভদের কাছে পাওয়া যায়নি এতকাল! কোনো শ্বেতকায়ের কাছে এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেনি দ্বীপবাসীরা, কেন? সন্ধান রাখত না বলে?

খুঁটিয়ে দেখা হল পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ। এ ধরনের প্রস্তর নিবাস দেখা গেছে কেবল ওরোনগোতে পাখী-মানুষদের গ্রামে।

চাতালগুলোর সৃষ্টি কিন্তু মূলতঃ চাষ আবাদের জন্যে। তারপর সহসা সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে নিপাত্তা হয়েছে দুর্দান্ত স্রষ্টারা।

এই প্রাচীরের তলদেশেই ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান পেলেন থরসাহেব। বিস্তর চাপড়া সংগ্রহ করলেন—যার মধ্যে পাবেন লুপ্ত উদ্ভিজ্জের পরা-গরেণু—বীক্ষণাগারে বিশ্লেষণ করলেই উদ্ঘাটিত হবে অবলুপ্ত বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

চতুর্থ দিনে দলবল নিয়ে জ্বালামুখের তলায় বসে টেস্ট টিউবে নমুনা ঢুকিয়ে গলা মোম দিয়ে মুখ বন্ধ করছিলেন থরসাহেব, এমন সময়ে পাহাড় বেয়ে নেমে এসে জাহাজের স্কীপার জানালে, রানো রারাকুর পাহাড় খাদে আবার একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার ঘটেছে। শুধু মাথা উঁচিয়ে সর্বাঙ্গ মাটির তলায় ঢুকিয়ে ঘাপটি মেরেছিল একটা দানব মূর্তি। তাকে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করার পর দেখা গেছে, দণ্ডায়মান মূর্তির বক্ষদেশে খোদাই করা রয়েছে একটা তিন মাস্তুলওয়ালা বলখাগড়া-জাহাজ। পাশ থেকে একটা দড়ি ঝুলছে। দড়ির প্রান্তে একটা কচ্ছপ খোদাই করা রয়েছে পেটের ওপর।

তৎক্ষণাৎ জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রানো রারাকু অভিমুখে রওনা হলেন থরসাহেব। জীপ থেকে নেমে দেখলেন বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেছে গহ্বরের মধ্যে সিধে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটাকে নিয়ে। নেটিভ খনকদের সেকী উল্লাস! এ জাহাজ নিঃসন্দেহে হোতু মাতুয়ার। একমাত্র তিনিই

নাকি কয়েকশ অনুচর নিয়ে অবতরণ করেছিলেন ঈস্টার দ্বীপে। তাঁর লোকবল দেখেই তো পরম শত্রু 'ওরোওই' মানে মানে সরে পড়েছিল পথ ছেড়ে দিয়ে। আর কচ্ছপটা? ওটাও হোতু মাতুয়ার আমলের। তাঁর এক অনুচর আনাকেনার সৈকতে কচ্ছপ শিকার করতে গিয়ে জখম হয়েছিল যাচ্ছেতাইভাবে। 'এখন অবশ্য কচ্ছপ' আর নেই ঈস্টার দ্বীপে।

প্রতিবারের মত এবারেও পূর্বপুরুষদের অবিনশ্বর কীর্তি উপলক্ষ্যে বসল ভোজসভা। ভোজের আসরে মহান হোতু মাতুয়ার অনেক কীর্তিই শুনলেন তিনি। অবাকও হলেন। ঈস্টার দ্বীপবাসীরা এককালে দানবিক মূর্তি সৃষ্টি করেছে, এই পর্যন্ত জানত সভ্যদেশের মানুষ। এইটুকু জেনেই স্তম্ভিত হয়েছিল অপার বিস্ময়ে। কিন্তু কেউ কি কল্পনাও করতে পেরেছিল সমুদ্রগামী বিশাল জাহাজ তৈরী করতেও তারা জানত সামান্য 'তোতোরা' নলখাগড়া দিয়ে? নলখাগড়া-জাহাজ অবিনশ্বর নয় বলে অবলুপ্ত হয়েছে মহাকালের অমোঘ নিয়মে—কিন্তু ভাগ্যিস কঠিন শিলার বুক কেটে তারা নির্মাণ করেছিল প্রস্তর মূর্তিগুলো—তাই তো একটির বক্ষদেশে উৎকীর্ণ জাহাজ দেখে জানা গেল শুধু মূর্তি নির্মাণেই কুশলী তারা ছিল না—তিন মাস্তুলওয়ালা বিশাল সমুদ্র-পোত নির্মাণেও ছিল পাকা মেরিন ইঞ্জিনীয়ার। এই দুই বিদ্যাকে সম্বল করে তারা সুদূর অতীতে প্রশান্ত মহাসাগরের একটেরে বিশ্বের সবচেয়ে নিরালা এই অঞ্চলে পরম প্রশান্তির নীড় রচনা করেছিল। 'তোতোরা' দিয়ে জাহাজ বানিয়েছে, পাথর কেটে মূর্তি বানিয়েছে। লড়াই তারা ভালবাসত না—নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে তাই সৃষ্টির পর সৃষ্টি করে গেছে মনের আনন্দে। তারপর বিগত হল শিল্পসৃষ্টির সুবর্ণযুগ। ইউরোপীয়ানরা এসে জাহাজ দেখে নি—দেখেছিল কয়েকটা ছোটখাট ক্যানো নৌকো আর মূর্তি। তারপর শুরু হল বর্বরদের তাণ্ডবলীলা। মূর্তি ভাঙচোর করে, পুরাকীর্তি ধ্বংস করে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দ্বীপময় তারা নরক গুলজার করে বেড়াল যুগ যুগ ধরে, মানুষ খেতেও তাদের রুচিতে আটকালো না। জাহাজ বা মূর্তি বানাবে কী? হায়রে সভ্যতা! কতটুকুই বা তোমার আয়ু! আজ আছো—কাল নেই!

ঐতিহাসিক দুটি নিদর্শন এই কারণেই হাতে এল থরসাহেবের। প্রথমটি পলিনেশিয়ান ক্যানো—'ভাকা আমা'; দ্বিতীয়টি—সাউথ আমেরিকান নলখাগড়া-ভেলা 'পোরা।' দ্বীপবাসীরা কিন্তু জোর গলায় বললে—'এই টুকু নৌকো বানিয়েই বসে থাকেনি পূর্বপুরুষরা। সমুদ্রে হাওয়া খাওয়ার

মত পেল্লায় জাহাজও বানিয়েছে।' কথাটা যে মিথ্যে নয়, তা ফাদার রুশেলের বর্ণনাতেও আছে। গত শতাব্দীতে দ্বীপের লোকজন ফলাও করে তাঁকে শুনিয়েছিল, পূর্বপুরুষরা চারশ জন লোক বইবার উপযুক্ত জাহাজ বানাতে পারত। রাজহাঁসের গলার মত উঁচু গলুই ছিল সেই জাহাজের। আর ছিল দুটো আলাদা অংশ। পেরুর • জারে আঁকা নলখাগড়ার জলপোতের সঙ্গে কিন্তু মিলে যায় এই বর্ণনা। ঈস্টার দ্বীপের জলপোতে ইতিহাসে আরও বৈচিত্র্য আছে অবশ্য। অন্য ধরনের জাহাজও বানিয়েছে। ফাদার সিবাসটিয়ান লিখেছেন, এদের কিছু কিছু জলপোত ছিল চ্যাপ্টা ভেলা প্যাটার্নের—ওজনেও দারুণ হাল্কা। এর নাম ছিল 'ভাকা পোই পোই'। অনেক লোক নিয়ে দূরপথে পাড়ি জমালে ঈস্টার দ্বীপবাসীরা শরণ নিত এই জাহাজের।

দু-দুটো জাহাজের ছবি যখন পাওয়া গেছে, তখন খোঁজাখুঁজি করলে নিশ্চয় পরিশ্রম ব্যর্থ যাবে না। হুকুম দিলেন থরসাহেব, জাহাজের মত রেখাচিত্র দেখলেই যেন খুঁটিয়ে দেখা হয়। ফল পাওয়া গেল হাতেনাতে। পাথর-খাদের বেশ কিছু মূর্তির গায়ে খোদাই করা নলখাগড়ার বাণ্ডিল দেখা গেল। একটা মূর্তির গায়ে পাওয়া গেল একটা মাস্তুল আর চৌকোণা পাল। তিরিশ ফুট লম্বা ভূপাতিত একটা মূর্তির তলার দিকে পাওয়া গেল এমন একটা লম্বাটে মাস্তুল যার গোল মাস্তুল হয়ে দাঁড়িয়েছে মূর্তির নাভিকেন্দ্র। ওরোনগোতে সিলিংয়ের গায়ে আবিষ্কৃত হল তিন মাস্তুলের মাঝে আঁকা একটা ছোট্ট গোল মাস্তুল।

কিন্তু আরো প্রমাণ পেলেও পাওয়া যেতে পারে যদি অভিযান চালানো যায় সমুদ্রের তলায়। ঈস্টার দ্বীপের চারদিকের উপকূলে রাস্তা নেমে গেছে সমুদ্র গর্ভে। পাথর বাঁধাই সমুদ্রগামী এই রাস্তা দেখে বহু কল্পনাকাহিনীর সৃষ্টি করেছে কল্পনাবিলাসীরা। ঈস্টার দ্বীপ নাকি মু নামক এক জলমগ্ন মহাদেশের জেগে থাকা অংশ। রাস্তাগুলো দিয়ে হেঁটে গেলেই মু পৌঁছোনো যাবে।

থরসাহেবের পক্ষে কাজটা কঠিন নয়। ফ্রগম্যান সঙ্গেই এনেছেন। হুকুম দিলেন সরঞ্জাম নিয়ে জলে নামতে। সবুজ ইউনিফর্ম পরে মাথায় মজলগ্রহী হেলমেট এঁটে পিঠে অক্সিজেনের সিলিণ্ডার চাপিয়ে থপাস্ থপাস্ করে ব্যাঙ-পা ফেলে পাথর বাঁধাই রাস্তা বেয়ে সে এগুলো মু অভিমুখে—হাতে রইল লণ্ঠনের মত ক্যামেরার আধার। আস্তে আস্তে নেমে গেল মু-গামী-পথ বেয়ে। প্রথমে ব্যাঙ-পায়ের ঝপাস ঝপাস্

দৃশ্য দেখা গেল জলের ওপর—ভেসে রইল অক্সিজেনের সিলিণ্ডার। তার পর ডুব দিল জলে। বুদ্ বুদ উঠে এল একবার বাঁদিকে, আবার ডান দিকে। যেন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পরে ভেসে উঠে আবার দম নিয়ে ডুব দিল জলে। এবার এঁকেবেঁকে বুদবুদের রেখা এগিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে, ফিরে এল একটু পরেই। সাঁতরে উঠে এল তীরে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নবর্ষণ শুরু হল বৃষ্টির মত:

'কিহে, সাইন পোস্ট খুঁজে পেলে না বুঝি?'

'মৎস্যকন্যার দেখা পেলে না? রাস্তা ঠিক বাতলে দিত।'

ফ্রগম্যান বেচারী বাস্তবিক রাস্তা পায়নি মু যাওয়ার। জলের ধার পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়েছে পথ। তারপর বড়বড় গোলপাথর প্রবালের ঝোপ, এবড়ো খেবড়ো গর্ত আর পাথর। অনেক দূর গিয়ে শুরু হয়েছে সমুদ্রতল—নেমে গেছে বহুদূরের আবছা কুয়াশার নীল সমুদ্রগর্ভে। কিছু বড়মাছ সেদিকে চোখে পড়েছে ঠিকই—মু নয়।

মু পর্যন্ত এ-পথ যে যায়নি, থরসাহেব তা আগেই জানতেন। মু থাকলে তো যাবে। সমুদ্রতল গবেষকরা বহু আগেই রায় দিয়েছেন, মানুষ যতদিন পৃথিবীতে এসেছে ততদিনের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ উঠে আসেনি জলের ওপর- ওপরের জমিও তলিয়ে যায়নি জলের তলায়, কাজেই জলমগ্ন মহাদেশ মু নিছক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।

খটকা লাগল থরসাহেবের। তবে কি জাহাজ থেকে মালখালাস করার জন্যে এই পথের পাশে জেটির গায়ে এসে ভিড়ত সমুদ্র থেকে বড়বড় জাহাজ?

রাস্তাগুলো তাহলে কিসের? কি কাজে ব্যবহৃত হয়? কারও তা মনে নেই। তবে হাঁ, রাস্তার নামটা কিন্তু 'আপাপা'। আপাপা' মানে খালাস করা।

দক্ষিণ উপকূলে একটা বিরাট মন্দির মঞ্চের ঠিক তলায় এই রকম একটা পথ আছে। পথের প্রান্তে রাশি রাশি গোল পাথর। ফলে একটা প্রণালী ঘুরে তবে মন্দির মঞ্চের তলায় নিশ্চয় আসতে হয়েছে পুরাকালের জাহাজকে। এই খানে অগভীর জলের মধ্যে কিন্তু পাওয়া গেল তিনটে ঝুঁটি। দুটো ঝুঁটি গায়ে গায়ে লেগে পড়ে আছে। নিশ্চয় একই জাহাজে তোলা হচ্ছিল অথবা জাহাজ থেকে নামানো হচ্ছিল। এ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে এলেন থরসাহেব। বিশ টন ওজন নিয়ে যাওয়ার মত নলখাগড়া জাহাজ বা ভেলা তৈরী হয়েছিল এই ইস্টার দ্বীপে। ঝুঁটি তোলার যখন দরকার হয়নি তখন

নিশ্চয় দশ জন খালাসীকে নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে বিশাল জলপোত। আরও একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন থরসাহেব। জাহাজে করেও খুঁটি নিয়ে যাওয়া হয়েছে উপকূল বরাবর দ্বীপের একদিক থেকে আরেক দিকে। পরে প্রমাণ পেয়েছিলেন থরসাহেব—শুধু লাল পাথরের খুঁটি নয়—বিশাল মূর্তি পড়ন্ত ভেলায় চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দ্বীপের অন্য প্রান্তে। সে জাহাজ অগভীর জলে পাড়ি দেওয়ার উপযুক্ত—গুরুভার প্রস্তর মূর্তি নিয়েও তাই দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসেনি।

পুরাকালের অত্যাশ্চর্য নৌ অভিযানের ঘটনা-চিত্র টুকরো টাকরা নিদর্শন মিলিয়ে যখন পুনঃ সংগঠিত করছেন থরসাহেব ঠিক তখনি কিন্তু সত্যিকারের নলখাগড়া নৌকো বানিয়ে আনছে চার ভাই রানো রারাকুর জ্বালামুখে। 'তোতোরা' শুকিয়ে আঁটি বেঁধেছে এমন রশি দিয়ে যে দেখে মনে হচ্ছে যেন বড় সাইজের হাতীর দাঁত। চারজনের প্রত্যেকেই বানাল এমন এক-একটা 'পোরা'। একজনের চড়ার উপযুক্ত ছোট এই ছিপনৌকো অবিকল পেরুর বহু শতাব্দী-ব্যবহৃত এক দাঁড়ী নৌকোর মত। একই সাউথ আমেরিকান নলখাগড়া থেকেই নির্মিত হয়েছে সেই নৌকোও।

এর পর দু-দাঁড়ী নৌকো তৈরীর পালা। তিমোতিও অবলীলা ক্রমে হুকুম দিয়ে বানিয়ে নিতে লাগল নিজের নৌকো—কিন্তু অপর তিনভাই দেখা গেল নেহাৎই অসহায়। তিমোতিও না বলে দিলে বুঝতে পারছে না কি করা দরকার। কেন? কারণটা ব্যাখ্যা করল তিন ভাই। তিমোতিও বয়সে বড়। নৌকো নির্মাণের কৌশল কেবল সে জানে। কারণটা নিয়ে কিন্তু পরে সন্দেহের অবকাশ দেখা দিয়েছিল থরসাহেবের মনে।

যাক, যথাসময়ে তৈরী হল নৌকো। প্রথম এক দাঁড়ীর নৌকো সৈকত ভূমির কাছে তরঙ্গোচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে চেপে বসল দুই ভাই। অপর দুই ভাই তরঙ্গোচ্ছ্বাস কাটিয়ে পাড়ি দিল বারদরিয়ায় দু-দাঁড়ীর নৌকোয়। গঠন দেখে কে বলবে লেক টিটিকাকার নৌকো নয়। একই নলখাগড়া দিয়ে তৈরী হুবহু একরকমের ক্যানো নৌকো। তফাৎ শুধু গলুইয়ে। হাতীর দাঁতের মত বেঁকে সরু হয়ে উঠে গেছে ওপর দিকে—যেমনটি থাকে পেরু উপকূলের নৌকোয়। দুই ভাই নৌকোয় লাফিয়ে উঠে নিজের নিজের আলাদা দাঁড় টেনে ঢেউয়ের ওপর নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল দূরে সমুদ্রে। ওপরে বসে দাঁড় টেনে গেল অক্লেশে, গায়ে একটুও জল লাগল না—নৌকো উলটেও গেল না।

অপর দুইভাই এক-দাঁড়ীর দুটো নৌকোর সামনের মোটা দিকটায় শুয়ে

পড়ে চার হাত পায়ে দাঁড় টানার মত সাঁতার কাটতে লাগল স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায়। দু-দাঁড়ীর নৌকো মহড়া দিয়ে ফিরে আসতেই পোরা থেকে দু-ভাই লাফিয়ে এসে উঠে পড়ল বড় নৌকোয়। চার ভাই এক সঙ্গে পাড়ি জমালো আরো দুস্তর সমুদ্রে।

বিস্ফারিত চোখে সৈকতে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখেছিলেন ফাদার মেয়র এবং থরসাহেব। পেছনেই তাঁবুর সামনে প্রস্তর পিরামিডের ওপর শুয়ে তিলতিল করে দানবমূর্তি উঠছে ঊর্ধ্বে। মেয়রের দৃষ্টি কিন্তু সেদিকে নেই।

সজল চোখে নিমেষহীন দৃষ্টি মেলে রয়েছে ঢেউয়ের মাথায় নৃত্যপর নৌকোটার দিকে।

অবশেষে বলল আবেগরুদ্ধ গলায়—'ঠিক এই ভাবেই বহু বছর আগে সমুদ্রে যেত আমাদের পূর্বপুরুষরা। কিন্তু কেউ সে দৃশ্য দেখেনি—দেখল এই প্রথম। মাঝখানের কয়েকশ বছরের ব্যবধান যেন মিলিয়ে গেল—এখন কত কাছের মানুষ মনে হচ্ছে তাঁদের।'

তিমোতিওর নৌকো চার জনকে নিয়ে আনাকেনায় ফিরে আসতেই থর-সাহেবের সবচেয়ে গায়ে গতরে ভারী এবং লম্বা চওড়া একজন অনুচর লাফিয়ে গিয়ে বসল নৌকোয়। কী আশ্চর্য! সামান্য নলখাগড়ায় তৈরী নৌকো বিন্দুমাত্র টলমল করল না, বেসামাল হল না, পাঁচ-পাঁচটা ভারী পুরুষকে নিয়ে দিব্বি জল কেটে এগিয়ে গেল তরতরিয়ে।

ফাদার সিবাসটিয়ান হাঁ হয়ে গেলেন এই দৃশ্য দেখে! এইটুকু নৌকো যদি পাঁচজনকে নিতে পারে তাহলে প্রাচীন ইঞ্জিনীয়ারদের তৈরী বড় জাহাজ কেন কয়েকশজনকে নিতে পারবে না? দরকার শুধু তিনটে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ গহ্বর থেকে এন্তার নলখাগড়া কেটে আনা।

অদ্ভুত এই নৌকোর কথা দ্বীপবাসীদের কাছে আগেই শুনেছিলেন ফাদার। এখন স্বচক্ষে দেখলেন সেই জিনিস। সেইসঙ্গে মনে পড়ল একটা সুপ্রাচীন ছবির দৃশ্য। পয়েক অন্তরীপের একটা গুহাগাত্রে আঁকা ছিল সেই ছবি। নৌকোর ছবি।

সোনালী নৌকোগুলো দেখিয়ে সগর্বে বলল মেয়র—'এ তো শুধু মাছ ধরা নৌকো দেখছেন। রাজারা যে জাহাজে লম্বা পাড়ি দিতেন, ভাবুন তো সেগুলো কত বড়।'

থরসাহেব সুযোগ বুঝে জানতে চাইলেন, পাল ছিল কিনা সে-জাহাজে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়র বললে—'ছিল বইকি। নলখাগড়ার পাল। এইরকম।'

বলে বালির ওপর ধীরস্থির ভাবে এঁকে দেখিয়ে দিল পালের চেহারা।

তাজ্জব হয়ে গেলেন থরসাহেব। মেয়র একটা জীবন্ত বিস্ময়। পেটে পেটে এত বিদ্যে! যে পালটা আঁকল পাকা হাতে, তা অবিকল লেক টিটিকাকা-র নলখাগড়া পালের মত। তফাৎ শুধু এক জায়গায়। লেক টিটিকাকার পালে নলখাগড়া থাকে• আড়াআড়ি—আজও সেখানে এইভাবে মাদুরের মত পাশাপাশি নলখাগড়া বেঁধে বানানো হয় বিচিত্র এই পাল। কিন্তু মেয়রের আঁকা পালে দেখা গেল, নলখাগড়াগুলো রয়েছে লম্বালম্বি।

হতভম্ব স্বরে থরসাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন—'আপনি এত খবর জানলেন কি করে বলুন তো?'

চোরা হাসি হেসে মেয়র শুধু বললে—'ডন পেড্রো অনেক খবরই রাখে, সিনর।'

নলখাগড়া নৌকো নিয়ে এই মহড়া চলার সময়ে প্রতি রাতে বস্তাবস্তা পাথরের মূর্তি এনে হাজির করছিল এসতেভান। ঠিক তার আগের রাতে গুহা থেকে সর্বপ্রথম পাথর বার করে আনে ল্যাজারাস। উত্তেজনার চোটে এখন বলে ফেলল, গুহার মধ্যে মডেল জাহাজ সে অনেক দেখেছে। তিমোতিও যা তৈরী করেছে, ঐ রকম নৌকোর মডেলও আছে।

শুনেই মনস্থির করে ফেললেন থরসাহেব।

এসতেভান স্ত্রীর তরফে জিজ্ঞেস করেছিল, থরসাহেবের যা দরকার বলুন—এনে দেবে। তখন উনি বলতে পারেন নি কি দরকার।

এখন বললেন। এসতেভানকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন নৌকোর খানকয়েক মডেল এনে দিতে। গুহার মধ্যেই তো আছে।

আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া বৃথা গেল না। চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল এসতেভান। কিন্তু রাত হতেই বেরিয়ে গেল ঘোড়া নিয়ে গ্রামের দিকে। গভীর রাতে এনে দিল থলি বোঝাই পাঁচ-পাঁচটা আশ্চর্য সুন্দর পাথরের নৌকোর মডেল। কলার পাতার মোড়ক খুলে প্রথমেই বার করল চন্দ্রকলার মত বাঁকা ভারী সুন্দর একটা নলখাগড়া নৌকো। বউ বলেছে, এর চাইতেও সুন্দর নৌকো-মডেল নাকি আছে গুহায়। দড়িদড়াগুলো স্পষ্ট তাতে—দুপাশে আছে দুটি মানুষের মূর্তি।

সেই রাতেই প্রেতচক্র করবার জন্যে ল্যাজারাস আর মেয়রের আসবার কথা। তিমি উদ্ধারের ম্যাজিক অনুষ্ঠিত হবে প্রেতাবেশের অভিনয় মারফৎ। তাই এসতেভানকে বেশীক্ষণ জেরা করতে পারলেন না থরসাহেব। এসতেভান সেই যে গেল, আর এল না। অতিক্রান্ত হল বহু রজনী। আকু-

আকুর ভয়ে বউ নাকি বারণ করেছে—গুহার মূর্তি গুহাতেই থাকবে—আর বাইরে আনা হবে না।

সেই রাত্রেই যেয়র বিনিদ্ররজনী যাপন করেছে হোতু মাতুয়ার গুহামুখে রহস্যজনক আলোকচ্ছটা দেখে।

ল্যাজারাস কিন্তু সরে পড়েছিল রাত্রি নিশীথে। বস্তা ভর্তি পাথর নিয়ে এল থরসাহেবের তাঁবুতে ভোর রাতে। একটা পাথর হাতীর দাঁতের গড়নে 'পোরা' নৌকোর মডেল। আর একটা পাথর কুমীরের মত দেখতে একটা রাক্ষসের। তৃতীয় পাথরটা একটা লাল পাথরের বাটি—তিনদিকে তিনটে মানুষের মুখ। গুহার মধ্যে নাকি আরো তিনটে নৌকো আছে। কিন্তু কোনোটাই তিমোতিওর তৈরী নৌকোর মত দেখতে নয়।

তিনরাত পর নিয়ে এল আরো কয়েকটা জাহাজের মডেল। একটার ডেক বেশ চওড়া। ডেক আর জাহাজের পাশ দড়ি দিয়ে বাঁধা নলখাগড়ার আঁটি দিয়ে তৈরী। দ্বিতীয় জাহাজটা 'ভাকা পোই পোই'। চ্যাপ্টা ভেলার মত। পাথরে খোদাই করা একটা মাস্তুল আর পাল। সামনের ডেকে পাশাপাশি দুটো অদ্ভুত গম্বুজ। তৃতীয়টাকে নৌকো বা জাহাজ বলা যায় না—একটা ডিস। কিন্তু নলখাগড়া দিয়ে যেন তৈরী, মাঝে মাস্তুলের ফুটো। দুই প্রান্তে দুটো মুখ। মাস্তুলের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা মুখ গাল ফুলিয়ে ঠোঁট সরু করে যেন ফুঁ দিচ্ছে পালে। মাথার চুল মিশে গেছে জাহাজের পাশের নলখাগড়ার সঙ্গে।

পাথরগুলো প্রাচীন তো বটেই, এই ধরনের শিল্পকর্মও ঈস্টার দ্বীপে অজ্ঞাত। ল্যাজারাস নিজেও কিছু জানে না। তবে এত পাথর আনবার পরেও যখন কপাল পোড়ে নি, থরসাহেবকে নিয়ে যাবে একদিন গুহার মধ্যে—কিন্তু কেউ যেন জানতে না পারে। অনেক অদ্ভুত বস্তু আছে সেখানে।

এবার যেয়রকে কব্জায় আনা দরকার। গভীর রাতে তাকে তাঁবুতে ডাকিয়ে আনলেন থরসাহেব। বললেন—'আমার আকু-আকু আপনাকে সবচেয়ে দামী কিছু উপহার দিতে বলেছে। এই নিন।'

বলে নিজের দামী সুটকেশ ভর্তি সব জিনিস এগিয়ে দিলেন থরসাহেব। সেই সঙ্গে দিলেন খড়ঠাসা একফুট লম্বা একটা বাচ্চা কুমীর। পানামায় খুব সস্তায় কিনেছিলেন থরসাহেব। একই কুমীরের মূর্তি এনে দিয়েছিল ল্যাজারাস আর এসতেভান। কাঠের তৈরী এই কুমীর মূর্তিকেই ঈস্টার দ্বীপে বলা হয় 'মোকো'। তামাম পলিনেশিয়ায় 'মোকো' বলতে বোঝায় ভয়ংকর হিংস্র পৌরাণিক দানব—যদিও এসব দ্বীপের অনুরূপ প্রাণীগুলো

নিরীহ ক্ষুদে টিকটিকি ছাড়া কিছু নয়। এই কারণেই ঈস্টার দ্বীপের 'মোকো' বলতে বোঝায় সাউথ আমেরিকার কুমীরদের নকল প্রাণী—পুরাকালের নাবিকরা যাদের দেখে এসেছে দক্ষিণ আমেরিকায়।

খড় ঠাসা মূর্তিটা পেয়ে আনন্দে আটখানা হল মেয়র। এ রকম কুমীর মূর্তি নাকি তার গুহাতেও আছে। এনে দেবে 'খন থরসাহেবকে।

মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল মেয়র। বিশ্বস্ত অনুচর ল্যাজারাসকে দিয়ে ঘোড়ায় চাপিয়ে উধাও হল অন্ধকারে গ্রাম অভিমুখে।

গুহারহস্য অব্যাখ্যাত রয়ে গেল। তাঁবুর সামনে দানবমূর্তি হেলে রইল অসম্মানজনক ভঙ্গিমায়।

সাময়িকভাবে তাঁবু ছেড়ে থরসাহেব সদলবলে গিয়ে উঠলেন জাহাজে পরের দিন 'পিন্টো' জাহাজকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে।

৭। গুহার বোবা প্রহরী

একুশবার তোপধ্বনি করে পিন্টো জাহাজ এল ঈস্টার দ্বীপে। গভর্নর আগে গেলেন ডেকে। তারপর থরসাহেব গেলেন ডাক্তার আর স্কীপারকে নিয়ে। ক্যাপ্টেন আর গভর্নর দুজনেই দারুণ খাতির করলেন তাঁকে। চিঠির থলি এগিয়ে দিলেন। সৌজন্য-পর্ব শেষ হল—এবার আলাপ জমানোর পালা।

এরপর এল মেয়র—লম্বকর্ণদের নিয়ে। ক্যাপ্টেনের সামনে গান গাইল পর পর দুটো। একটা চিলির জাতীয় সংগীত, আর একটা হোতু মাতুয়ার বন্দনা সংগীত।

তারপরেই একযোগে পকেটে হাত ভরে থরসাহেবের দেওয়া সিগারেটের প্যাকেট বার করে রাখল ক্যাপ্টেনের সামনে।

অত ভাল সিগারেট ক্যাপ্টেন এনেছিলেন কিনা, সে পরীক্ষায় মধ্যে তিনি গেলেন না। উত্তম সুরা খাওয়ালেন মেয়র এবং লম্বকর্ণদের। চোঁ-চোঁ করে মদ্যপান করে পরমানন্দে জাহাজ পরিদর্শনে বেরোলো মেয়র সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে।

পিন্টো জাহাজে কিছু পুরাতত্ত্বের ছাত্র এসেছিল থরসাহেবের অভিযান প্রত্যক্ষ করতে। আর এসেছিলেন দুজন প্রফেসর—উইলহেলম আর পেনা। এঁদের সামনেই মদের ঝোঁকে হেঁকে উঠল মেয়র—'শুনুন মশাইরা, আমার একটা গুহা আছে।'

কিন্তু কেউ শুনল না। শুনলেও মানে বুঝল না অথবা মাতালের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিল। থরসাহেব কিন্তু শংকিত হলেন। গুহা রহস্যের সমাধান ঝুলছে একটি মাত্র সুতোর ওপর। খবরটা নেটিভদের মধ্যে চাউড় হয়ে গেলেই সব মাটি হয়ে যাবে।

মেয়র কিন্তু বেফাঁস বলেই মুখে চাবি দিল। সবার আগেই সরে পড়ল দ্বীপে।

দ্বীপবাসীরা পিন্টো জাহাজের সবাইকে নিরেস দারুমূর্তি কিছু উপহার দিল—সরেসগুলো সবই বিনিময় প্রথায় চালান হয়েছে থরসাহেবের জাহাজে।

প্রফেসর পেনা কিন্তু খুঁজে খুঁজে ঠিক হাজির হলেন মেয়রের বাড়ীতে। প্রথম শ্রেণীর দারুমূর্তি কিনতে চাইলেন। কিন্তু সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল মেয়র—এ-মূর্তি নাকি সিনর কোনটাইকির জন্যে তৈরী হচ্ছে—বিক্রীর জন্যে নয়।

মেয়রের বাকতাল্লার মধ্যে থেকে প্রফেসর পেনা যা উদ্ধার করলেন, তা এই : দ্বীপের বহু অমূল্য সম্পদ থরসাহেব সংগ্রহ করে ফেলেছেন।

এরপরেই চিলির শিক্ষামন্ত্রীর একটা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে ফের দ্বীপের মাটিতে পা দিলেন প্রফেসর পেনা। মন্ত্রীমশায় প্রফেসরকে ক্ষমতা দিয়েছেন, অভিযাত্রীদের কাছ থেকে সমস্ত পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার বাজেয়াপ্ত করে যেন যুদ্ধজাহাজে তুলে নেওয়া হয়।

শুনে চখল হলেন গভর্ণর, এমন কি ক্যাপ্টেনও। কিন্তু মন্ত্রীমশায়ের হুকুমের ওপর তাঁরা কথা বলেন কি করে? মুষড়ে পড়লেন ফাদার। মুখ শুকিয়ে গেল মেয়রের। তার বকবকানির জন্যেই তো এই দুর্গতি।

নেটিভরা ছুটে এসে অভয় দিলে থরসাহেবকে। তাদের জিনিস তারা বিক্রী করেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রী করার অধিকার তাদের আছে বইকি। দ্বীপের মাটি থেকে কিছুই লুঠ করেন নি সিনর কোনটাইকি।

সবচেয়ে ঘাবড়ে গেল ল্যাজারাস আর এসতেভান। গুহা থেকে মূর্তি সরানোর খবর এবার ফাঁস হয়ে না যায়।

শেষকালে ক্ষেপে গেল মেয়র। প্রফেসর পেনার কাছে দেখা করতে গেল শুধু একটা কথা বলবার জন্যে। সিনর কোনটাইকিকে আমরা ঘরের জিনিস বেচেছি, তাতে কার কী? উনি চুরি চামারি তো করেন নি।

ইতিমধ্যে থরসাহেব তাঁর লোকজন দিয়ে পিন্টোর ক্যাপ্টেনকে জীপে করে দ্বীপের সমস্ত খনন কার্য ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করলেন। প্রফেসর পেনা এবং পুরাতত্ত্বের ছাত্রদেরও ঘুরিয়ে দেখানোর আয়োজন হল।

পিন্টো জাহাজের বাদবাকী যাত্রীর কিছু দ্বীপে নেমেছিল—কিছু জাহাজেই ছিল। সমুদ্র উত্তাল হলে জাহাজে যারা ছিল, তারা আর দ্বীপে নামল না। দ্বীপে যারা ছিল, তারা ফাদার সিবাসটিয়ানকে ঘিরে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে ফেলল।

শুষ্ক মুখে ফাদার শেষকালে পালিয়ে এলেন। মেয়রকে নিয়ে চলে এলেন থরসাহেবের জাহাজে।

সেখানে ঘটল একটা অদ্ভুত কাণ্ড। বিয়ারের ক্যান খুলে খেয়েই যাচ্ছিল মেয়র, ফাদার বাইরে যেতেই থরসাহেবের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে—'এবার আমি আপনাকে আমার গুহা থেকে পাথর এনে দেবো। ঠাকুমাকে আগে জিজ্ঞেস করে নিই—আমার আকু-আকু রাজী আছে।'

ঠাকুমা কিন্তু পরলোকে। কবরে গিয়ে অনুমতি নেবে মেয়র।

পেটুক মেয়রকে সারি সারি শূন্য বিয়ার ক্যানের সামনে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে এলেন থরসাহেব। বাইরে আসতেই দেখলেন একটা নতুন খোলা বিয়ার ক্যান দরজার পাশে পিপের ওপর বসিয়ে রেখে গেছে স্টুয়ার্ড। থরসাহেব ক্যানটা মেয়রের টেবিলে রেখে বেরিয়ে এলেন। আসবার সময়ে দেখলেন সর্বশেষ ক্যানটা মুখের ওপর উপুড় করছে মেয়র।

কিছুক্ষণ পরেই মেয়রের বিকট চিৎকার শুনে দৌড়ে গেলেন। দু চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে মেয়রের। সদ্য খোলা ক্যানটা দেখিয়ে চেঁচাচ্ছে তারস্বরে—'কে রাখল? এটা কে এনে দিল?'

চকিতে থরসাহেব বুঝলেন। মেয়র দেখেনি তিনি রেখে গেছেন। সুযোগটাকে কাজে লাগালেন তৎক্ষণাৎ।

বললেন—'আমার আকু-আকু।'

বাক্‌রহিত হয়ে গেল মেয়র। থরসাহেবের আকু-আকু এত ভালো? তার প্রয়োজনমত বিয়ার জুগিয়ে যাচ্ছে মুখের কাছে?

এই একচালেই দারুণ বিচলিত হল মেয়র যা ডিমি-উদ্ধারের নাটক করেও সম্ভব হয়নি।

আড়ালে ডেকে বললে থরসাহেবকে—'দ্বীপে নেমেই ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করব। পাথর আপনাকে দেবই।'

ল্যাজারাস আর এসতেভানের কাছে যে মূর্তি পেয়েছে অবিকল সেই সব মূর্তির বর্ণনা দিয়ে থরসাহেব বললেন—'আপনার গুহায় তো আছে এই সব মূর্তি। এনে দেখান।'

হাঁ হয়ে গেল মেয়র। সর্বনাশ! সিনর কোনটাইকির আকু-আকু তার

গুহায় গিয়ে সব দেখে এসেছে!

সাংঘাতিক আকু-আকু তো!

পরের দিন দ্বীপে গেলেন থরসাহেব। দেখা হল প্রফেসর পেনার সঙ্গে। ছাত্রদের নিয়ে খুঁড়ে বার করা মূর্তি দেখতে দেখতে হতভম্ব হয়ে গেছেন। একজন বলিভিয়ান ছাত্র রানো রারাকুর আসন পিঁড়ি হয়ে বসা লাল পাথরের মূর্তি আর ভিনাপুর লাল পাথরের স্তম্ভ দেখেই লাফিয়ে উঠল। আরে! এ তো তার দেশের জিনিস!

প্রফেসর কাষ্ঠ হেসে থরসাহেবকে বললেন—'আপনার সঙ্গে একটা অপ্রীতিকর ব্যাপারে কথাবার্তা আছে কিন্তু।'

'সে ব্যবস্থা হয়েই আছে,' মৃদু হেসে জবাব দিলেন থরসাহেব। সত্যিই তিনি মিটিংয়ের আয়োজন করে ফেলেছেন অনেক আগেই।

দিন দুয়েক পরে মেয়র খবর পাঠালো থরসাহেবকে—'জীপ গাড়ীটা পাঠাবেন? বস্তা ভর্তি গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিস পাঠাবো।'

জীপ ফিরে এল ল্যাজারাস আর মেয়রকে নিয়ে। মস্ত একটা বস্তা এনেছে সঙ্গে। ঠাকুমার মত পেয়েছে মেয়র। উত্তেজনায় খেঁকিয়ে আছে যেন!

মেয়র কব্জায় এল শেষ পর্যন্ত। বস্তা ভর্তি গুহা সম্পদ এনেছে ঠাকুমার মত পেয়ে। ফলে স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেলেছে ল্যাজারাস। গুহা-সম্পদ পাচারে সে আর একক নয়—দোসর পেয়েছে। উদ্বেগ তাই উধাও হয়েছে।

গুহা থেকে বস্তাবোঝাই সম্পদ জীপে তোলার সময়ে অবশ্য ভয় ছিল দুজনেরই। কিন্তু দুর্ঘটনা যখন ঘটে নি, কপাল মন্দ হওয়ার সম্ভাবনা আর নেই।

পাঁচটা বড় পাথরের একটা বিশাল পুলিন্দা ছিল বস্তায়। ভিনাপুতে ল্যাজারাসের যে দ্বিতীয় গুহা আছে এই প্রথম সেই গুহা থেকে এই পাঁচটা পাথর বার করে এনেছে সে।

বাকী তেরোটা পাথর এসেছে মেয়রের নিজের গুহা থেকে। এত উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য নিদর্শন গোটা ঈস্টার দ্বীপে এর আগে দেখেননি থরসাহেব। একটা মূর্তি দংষ্ট্রা বিকট কুকুরের মাথা। তেরচা চোখ। দাঁতের চেহারা দেখে মনে হয় নেকড়ে বা শেয়াল—গৃহপালিত কুকুর যেন নয়। দেখে দেখে আশ আর মেটে না থরসাহেবের। কুকুর অথবা কুকুরের মত আরও কয়েকটা মূর্তি দেখলেন। একটা এত লম্বা যে কুমীর বলে ভ্রম হয়। চারটে

খাটো পায়ে ভর দিয়ে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে কুকুরের মতই। কুমীরের মূর্তিও দেখা গেল তেরোটা মূর্তির মধ্যে। পিঠে খাঁজ কাটা, মাথা চওড়া, বিকট চোয়াল। সত্যিকারের কুমীরের হুবহু অনুকরণ। এ ছাড়াও আছে একটা অত্যন্ত অদ্ভুত মুণ্ড, কয়েকটা পাখী আর পাখী-মানুষের মূর্তি। ল্যাজারাসও এনেছে খান কয়েক অদ্ভুত মূর্তি। একটা মূর্তি সহবাসরত ছুটো সাপের চ্যাটালো পাথরে উৎকীর্ণ?

এ ধরনের মূর্তি খোদাইয়ের কারণটা জানতে চাইলেন থরসাহেব। ফিস-ফিস করে মেয়র বললে—'যাদের মূর্তি, তাদের শক্তি বাড়ে। যেমন ধরুন এই গলদা চিংড়িটা'—ভারী সুন্দর একটা পাথরের গলদা চিংড়ি দেখালো মেয়র। পাগুলো শরীরের তলায় গুটোনো—শুঁড় হেলে রয়েছে পিঠের ওপর। জলের তলায় যেভাবে ছুটে যায় গলদা চিংড়ি—ঠিক সেই ভঙ্গিমা।

মেয়র বললে—'গলদা চিংড়িদের শক্তি বৃদ্ধি পায়—উপকূল বরাবর সংখ্যা বেড়ে যায়।'

পরস্পরকে জড়িয়ে থাকা সাপ দুটোকে দেখিয়ে বললে—'ডবল সাপ মানেই ডবল শক্তি।'

তামাম পলিনেশিয়ায় কিন্তু সাপের দর্শন পাওয়া যায় না। 'ঈল' মাছের মূর্তি নয় তো? জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে মেয়র বললে—'মোটেই না। ঈল মাছের ঘাড় সরু হয় হয় না—সাপের চ্যাপ্টা মাথায় পেছনের ঘাড় এই রকম সরু হয়।' তোবা! তোবা! মেয়র প্রাণী জগৎ সম্বন্ধে এত খবরও রাখে!

চিলির মানুষ কিন্তু এই ধরনের সাপকে বলে কুলেব্রা। হাঙ্গা ও-তেও উপত্যকায় যাওয়ার রাস্তায় একটা পাহাড়ের গায়ে ঠিক এমনি একটা দানবিক সাপের উৎকীর্ণ মূর্তি দেখেছিলেন থরসাহেব। মনে মনে ঠিক করলেন, জায়গাটা খুঁড়ে দেখা দরকার।

ল্যাজারাস খুব খুশী। গুহার জিনিস বার করে এনে থরসাহেবকে যে সে দিয়েছে, এ-নিয়ে এই প্রথম খোলাখুলি কথা বলার সুযোগ সে পেয়েছে। মেয়রের সঙ্গে আলোচনার ফলে জানা গেল দুজনের গুহাতেই প্রায় একই রকমের জিনিস আছে।

মানুষের চুলের নাকি জাদুকরী ক্ষমতা আছে—ঈস্টার দ্বীপবাসীদের এই বদ্ধ ধারণার খবর রাখতেন থরসাহেব। তাই এমন ভাব করলেন যেন ব্যাপারটার আদ্যোপান্ত তাঁর জানা। ওষুধ ধরল। মেয়র বললে, তার

গুহায় বংশের প্রত্যেকের মাথার চুল সযত্নে রক্ষিত আছে—এমনকি তার মরা মেয়েরও। আর আছে একটা মানুষের মাথা। না, না, নরকরোটি নয়—আস্ত মাথা। বলতে বলতে শিউরে উঠল মেয়র।

সর্বনাশ। তবে কি নরমুণ্ড মামী বানিয়ে রাখা হয়েছে মেয়রের গুহায়?

ল্যাজারাসের গুহাতেও কি চুল আছে? না। চুল নেই, নরমুণ্ডও নেই। তবে পূর্বপুরুষদের মাথার খুলি আর হাড় আছে রাশি রাশি।

গুপ্ত গুহা নিয়ে তিনজনের মধ্যে তখন ধর্ম ভাই সম্পর্ক এসে গেছে বললেই চলে। কেউ কারো কাছে আর কিছু গোপন করছে না। উৎসাহের চোটে মেয়র বলে ফেললে, সারা ইস্টার দ্বীপে মোট পনেরোটা ফ্যামিলির নিজস্ব গুপ্ত গুহা আছে। সব গুহাই লম্বকর্ণদের—হ্রস্বকর্ণদের একটিও নেই। শেষ জীবিত লম্বকর্ণ ওরোরোইনা আহুকোর পরিখায় পুড়ে মরেনি। লম্বকর্ণদের মূল্যবান সামগ্রী লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তাঁর গুহায়। পুরুষানুক্রমে গুহার দখলদারি হাত বদল হয়েছে কেবল ওরোরোইনার বংশধরদের মধ্যেই। মেয়র যখন পাঁচ বছরের, তখন বাপঠাকুর্দা গুহার জিনিসপত্র নিয়ে তার সামনে আলোচনা করলেও দেখতে দেয় নি। পনেরো বছর বয়সে গুহার কাছাকাছি তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতর থেকে বাবা কয়েকটা মন্ত্র জিনিস এনে দেখিয়েছিল। একাদশ পুরুষ ধরে এই ধারাই চলে আসছে বংশ পরম্পরায়।

গুহায় ঢোকানোর আগে মেয়রের বাবা তার মাথার একগোছা চুল কেটে নিয়েছিল একদম তালু থেকে। কলার পাতায় মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে এগারোটা গিঁট দিয়েছিল। গুহার ভেতরে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল পাথরের পাত্রে—ওপরে ঢাকা দিয়েছিল আরেকটা পাথরের পাত্র। তার বাবার চুলের গোছাও প্যাকেট বাঁধা অবস্থায় আছে আর একটা পাত্রে—সে প্যাকেটের সুতোয় আছে দশটা গিঁট। তার বাবার প্যাকেটে নটা গিঁট। এইভাবে কমতে কমতে গিয়ে একটা গিঁটে ঠেকেছে ওরোরোইনার চুলের প্যাকেটে।

পাথরের পাত্রে চুল রাখবার পর গুপ্ত গুহার প্রবেশপথের সন্ধান জানতে পেরেছিল মেয়র—তার আগে নয়। গোপনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তন্ত্রমন্ত্রের আচার অনুষ্ঠান। আকু-আকুকে প্রসন্ন করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভবিষ্যতে গুহার দেখাশুনো করার ভার দেওয়া হল আর একজনকে—এই সেই মানুষ—মেয়র। সেই থেকে মেয়র নিষ্ঠার সঙ্গে গুহার সমস্ত জিনিস সযত্নে দেখাশুনা করেছে—কাউকে কোনো কথা বলেনি—বলল এই প্রথম। কারণ, দিনকাল পালটাচ্ছে। অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে।

মেয়রের ছেলেটা হয়েছে অকালকুষ্মাণ্ড। পুরোনো প্রথায় বিশ্বাসী নয়। বিয়ে করে সাপের পাঁচ পা দেখেছে। এ ধরনের গুরুতর আর গুপ্ত বিষয়ে তাকে বিশ্বাস করা চলে না। গুহার সন্ধান পেলেই ভেতরকার সম্পদ বিক্রী করে দেবে টুরিস্টদের—বড়লোক হবার বড় সাধ তার। ছোট ভাই আতান থাতান কিন্তু সেরকম নয়। বাপঠাকুর্দার শিক্ষায় আস্থা আছে। সময় হলে গুহায় ঢোকবার গুপ্ত দীক্ষা দেবে এই ভাইকেই।

ডিনার খেতে গভর্ণর এবং অভিযাত্রীরা আসব বলে বিদায় নিল মেয়র আর লাজারাস। তিনজনের আকু-আকুরা বন্ধু হয়ে গেছে বলেই হাসিমুখে মেয়র বললে, তার আকু-আকু নাকি সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। বেঁটে তো, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। পায়ে পায়ে জড়িয়ে চলে। তবে দারুণ স্পীড। দু মিনিটে চিলি গিয়ে আবার চলে আসতে পারে।

তাঁবুর বাইরে গিয়ে লাজারাসকে বুঝিয়ে দিলে মেয়র তার অবর্তমানে মূর্তি খাড়া করতে হবে কি করে। পিন্টো জাহাজে চিলি রওনা হচ্ছে মেয়র।

তাঁবুতে রাতের আহার সেরে জীপে চেপে গভর্ণর এবং থরসাহেব রওনা হলেন গ্রাম অভিমুখে। ফাদারের বাড়ীতে মিটিং বসবে প্রফেসর পেনার সঙ্গে। ফাদার যদিও জ্বরে পড়েছেন মিটিং হবে তাঁর পড়ার ঘরে।

দ্বীপের সর্বময় অধীশ্বর এখন পিন্টো জাহাজের ক্যাপ্টেন। তাই মিটিংয়ের সভাপতিত্ব তিনি। ঈস্টার দ্বীপের একটা দানবমূর্তি জাহাজে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইবেন তিনি চিলিয়ান নেভীর কর্তার কাছে রেডিও মারফৎ। এ-চেষ্টা আগেও হয়েছে। কিন্তু এখন তো অনেক অদ্ভুত মূর্তি বেরিয়ে আসছে মাটির তলা থেকে। একটা নিয়ে গেলেও আরও অনেক আবিষ্কৃত হবে থরসাহেবের প্রচেষ্টায়। প্রফেসর পেনা থরসাহেবকে শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে সরকারী ক্ষমতাপত্র বার করে দেখালেন—যাবতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু বাজেয়াপ্ত করার অধিকার তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর উইলহেলম। প্রত্নতত্ত্বে তিনি ভুবন-জোড়া নাম কিনেছেন। থরসাহেবকে বাঁচিয়ে বক্তৃতা দিলেন। অভিযাত্রীদের আবিষ্কার নিজেদের ল্যাবোরেটরীতে নিয়ে যাওয়ার আগে বাজেয়াপ্ত করা চলে না। তাছাড়া আগে একথা ওঠেনি কেন? থরসাহেব তো চিলি গিয়ে অনুমতি নিয়ে এসেছেন।

তাতো বটেই, সায় দিয়ে বললেন প্রফেসর পেনা। কিন্তু আমলাদের ভুলে এই বিভ্রাট ঘটেছে। অনুমতি দেবার অধিকার শিক্ষা মন্ত্রকের—বিদেশ দপ্তরের নয়।

কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীও থরসাহেবকে নিজে সবরকমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন-বললেন থরসাহেব। উনি তো শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেছেন।

তাড়াতাড়ি ম্যানেজ করলেন উইলহেলম। সাহায্য সবাই করবে। কিন্তু আইনে যে গলদ থেকে গেছে।

পেনার এক ছাত্র বললে—ইস্টার দ্বীপ চিলি সরকারের সম্পত্তি। অথচ সেই দেশের মিউজিয়মেই ইস্টার দ্বীপের শিল্পনিদর্শন আছে সবচেয়ে কম।

থরসাহেব তখন বুঝিয়ে বললেন মূর্তি আর পাথর উদ্ধার ছাড়া অভিযাত্রীরা সবচেয়ে বেশী পরিমাণে যা পেয়েছে তা হল পোড়া ছাই, কাঠকয়লা আর হাড় মিউজিয়ামে কি এসব রাখা যায়? এসব আর মূর্তি ইত্যাদি ছাড়াও অভিযাত্রীরা দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে যথেষ্ট মন দিয়েছে—কাজও হচ্ছে। এই সব তথ্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে লিপিবদ্ধ না করলে তার কোনো দামই থাকবে না। আগে তাই করা হোক। রচনা ছাপা হোক—তারপর চিলি সরকার যা চাইবেন তাই দেওয়া হবে। স্মৃতিস্তম্ভ জাতীয় কোনো বস্তুই কিন্তু দ্বীপের বাইরে যাবে না।

ঠিক এই প্রস্তাবই করতে যাচ্ছিলেন পেনা—থরসাহেবের কথা তিনি লুফে নিলেন।

থরসাহেব বললেন, এ ছাড়াও দ্বীপবাসীদের কাছ থেকে অনেক অমূল্য শিল্পনিদর্শন তিনি পেয়েছেন।

'ব্যক্তিগত সম্পত্তি?' পেনার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ।'

'তবে তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। দ্বীপের লোক আপনাকে যা দিয়েছে। আমরাও তা কিনতে পারি। আমি এখানে কাস্টমস্ অফিসার হিসেবে তো আসিনি। আমার কাজ হল মাটি খুঁড়ে কি কি পেয়েছেন তার হিসেব রাখা—কেননা আপনার আগে এখানে প্রত্নতত্ত্বের কোনো কাজ হয়নি।'

সেই ভাবেই চুক্তিপত্রের খসড়া তৈরী হয়ে গেল। দ্বীপের প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু সমূহের স্থায়ী অধিকার থেকে থরসাহেব বঞ্চিত হলেন—তার বেশী কিছু নয় মিটিং শেষ হলে পেনাকে তিনি নিজের জাহাজে নেমন্তন্ন করলেন দ্বীপবাসীদের দেওয়া এবং নিজেদের পাওয়া যাবতীয় বস্তু স্বচক্ষে দেখে যাওয়ার জন্যে।

বেরিয়ে এসে চমকে উঠলেন ঠিক পাশে একটা অদ্ভুত ছায়ামূর্তি আবির্ভূত হচ্ছে।

ল্যাজারাস। চাপা গলায় বললে—'সব শুনেছি জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে। বেঁটে মোটা লোকটা আপনাকে দেওয়া আমাদের জিনিস দখল করতে চাইলেই মেয়র আর দু-শ আদমী নিয়ে এসে হল্লা আরম্ভ করতাম।'

ভগবান বাঁচিয়েছেন! মেয়রের বাড়ি চললেন থরসাহেব।

বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে মেয়র। সদ্য মুরুগীর মত কাঁপছে আপাদমস্তক।

'ঘাবড়াবেন না! ঘাবড়াবেন না!' এমন ভাবে বলল যেন নিজে মোটেই ঘাবড়ায়নি—'কি হল বলুন!'

ফলাফল শুনেই কিন্তু বুক ফুলে উঠল। বললে বুক ঠুকে চাপা গলায়—'তিনজনের আকু-আকু জোট বেঁধেছে তো—ঠিক এমনটাই আশা করেছিলাম।'

মেয়রের প্রাণে তখন উৎসাহের জোয়ার এসেছে। জীপে ইঞ্জিনীয়ার আর স্কাপারকে আটকে রাখল ল্যাজারাসকে দিয়ে। থরসাহেবকে নিয়ে এল বসবার ঘরে। বড় গোল টেবিলে রাখল একটা মদের বোতল। মদ দিয়ে আঙুল ধুয়ে মাথায় মুছে নিল। থরসাহেবকে করতে হল একই কাণ্ড। তারপর সুরাপান করে জীপ নিয়ে সবাই বেরোলো মরা ঠাকুমার অনুমতি ভিক্ষা করার জন্যে।

গভর্ণরের বাংলার রাস্তা যেদিকে গেছে, জীপে এসে দাঁড়ালো সেইখানে। আশপাশ দিয়ে অন্ধকারে গা মিলিয়ে চলে গেল কয়েকজন নেটিভ ঘোড়-সওয়ার। থরসাহেবকে নিয়ে মেয়র চলল মরা ঠাকুমার আস্তানায়।

অন্ধকারে গতি কিন্তু শ্লথ হল না। অতিকষ্টে পেছনে লেগে রইলেন থরসাহেব। মাথার ওপর তারার চন্দ্রাতপ। নিঃসাম অন্ধকার চারধারে।

হঠাৎ সামনে দেখলেন আবছা একটা প্রাচীর।

গলা নামিয়ে বলল মেয়র—'পাঁচিলের ওদিকে কিন্তু কথা বলা বারণ। যা বলব, সংকেতে বলব।'

আরও পঞ্চাশ গজ গিয়ে একটা আবছা সাদাটে ছায়ার সামনে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে গেল মেয়র। মাটিতে পড়ে রয়েছে একটা বস্তু। কংক্রিট অথবা পাথরের চাঁই। অন্ধকারে এর বেশী ঠাহর করা যাচ্ছে না।

হঠাৎ সামনে দু-হাত বাড়িয়ে চেটো সিধে করে হরে শরীর ঝুঁকিয়ে রইল মেয়র। থরসাহেব ইসারা বুঝে তাই করলেন।

সাদা বস্তুটাকে একচক্কর ঘুরে এসে আবার হাত বাড়িয়ে চেটো সিধে করল মেয়র। একইভাবে চক্কর মেরে এসে করতে হল থরসাহেবকেও। এইভাবে প্রদক্ষিণ এবং বিচিত্র প্রমাণ চলল তিনবার। পায়ের তলার মাটি কেটে বসে গেছে বহু-প্রদক্ষিণের ফলে—হাঁটতে গিয়ে তা টের পেলেন

থরসাহেব।

মাথা ঝুঁকিয়ে নিথর নিশ্চুপ দেহে দাঁড়িয়ে রইল মেয়র।

রোমাঞ্চিত হলেন থরসাহেব। একী পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপে জড়িয়ে পড়েছেন তিনি? এ-যেন কয়েক-শ বছর আগেকার অজ্ঞাত অঞ্চলের অসভ্য-বর্বর জাতির পিশাচ পূজা!

রোমাঞ্চিত কলেবরে আকু-আকুকে তুষ্ট করার ভান করে বিড়বিড় করে কয়েকটা কথা বলেই ভুলটা বুঝতে পারলেন থরসাহেব।

'যাচ্চলে! চলে গেল ঠাকুমা!' বলেই ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে গেল মেয়র। তীর বেগে বেরিয়ে এল পাঁচিলের এদিকে। অতিকষ্টে প্রায় বিলীয়মান ছায়া মূর্তির পেছন ধরে কোন মতে বেরিয়ে এলেন থরসাহেব।

বললেন—'হ্যাঁ বলেছে তো?'

'না বলেছে। আমার আকু-আকু বলছে, হ্যাঁ। ঠাকুমা বলছে, না। আকু-আকু বলছে গুহার সমস্ত জিনিস আপনাকে দিতে। তিন-তিনবার জিজ্ঞেস করার পরেও ঠাকুমা বলছে—না, না, না। কিন্তু আমি দেবই। চিলি থেকে ফিরে এসে একটা গুহা সমস্ত জিনিস সমেত আপনাকে উপহার দেব।'

থরসাহেব জানতে চাইলেন—'ঠিক কি বলছে ঠাকুমা বলুন না।'

মেয়র বললে—'আর একবার জিজ্ঞেস করে তারপর বলব। এবার একা যাব—আর এক রাতে।'

দু-দিন পরে মেয়রের বাগানের সামনে জীপ দাঁড় করিয়ে বাড়ীর মধ্যে থরসাহেব ঢুকে দেখলেন মদের বোতল নিয়ে বসেছে মেয়র আর ল্যাজারাস। মদ খাওয়ার কারণ ঘটেছে বইকি!

কপাল খুলেছে ল্যাজারাসের। অভিযাত্রীরা দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার দু-দিন আগে একটা গুহা দেখাবে থরসাহেবকে।

কিন্তু কপাল পুড়েছে খোদ মেয়রের। ঠাকুমা আবার অসম্মতি জানিয়েছে। বেঁকে বসেছে ভাইরা-ও। গুহায় থরসাহেবকে ঢোকালেই অক্কা পেতে হবে মেয়রকে। দলপতিকে হারাতে তারা রাজী নয়। গোদের ওপর বিষফোড়ার মত ঘটেছে আর একটা কাণ্ড। স্ট্রাইক করেছে নেটিভরা, বেতন বাড়াতে হবে। নইলে জাহাজ থেকে মালখালাস করবে না। মেয়র-কেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধর্মঘট মেটাতে না পারলে তাকে জাহাজে করে চিলি নিয়ে যাওয়া হবে না।

ধর্মঘট কিন্তু ছড়িয়ে পড়ল। হাওয়া কল বন্ধ হয়ে গেল। প্রাগৈতিহাসিক কূপ থেকে ভেড়াদের খোঁয়ারেও আর জল পৌঁছোলো না পাম্প অচল হওয়ায়।

জাহাজ থেকে কিন্তু লঞ্চে করে মাল খালাস চলল অল্প অল্প করে দুই জাহাজের লোকজনের সহযোগিতায়। পিন্টো জাহাজের রওনা হওয়ার দিন পিছিয়ে গেল।

যেদিন রওনা হবে পিন্টো, তার আগের দিন প্রফেসর পেনা এল থরসাহেবের জাহাজে। থরসাহেব একটা খাম দিলেন তাঁর হাতে শিক্ষা-মন্ত্রীকে দেওয়ার জন্যে। কপি দিলেন পেনাকে। কি-কি পাওয়া গেছে দ্বীপে, পূর্ণ বিবরণ আছে রিপোর্টে। মিলিয়ে দেখে নিতে আহ্বান জানালেন থরসাহেব। কিন্তু খোঁড়াখুঁড়ি করে পাওয়া ছাই, হাড় আর কাঠকয়লা দেখে নিরাশ হলেন ভদ্রলোক। থরসাহেবের ব্যক্তিগত সঞ্চয় নিয়েও আগ্রহ দেখালেন না—দ্বীপের লোক উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যা দিয়েছে তাঁকে, তা নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথা নেই। রোঙ্গো-রোঙ্গো পেয়েছেন কী? না, পান নি থরসাহেব। পেনা কিন্তু একজন দ্বীপবাসীকে একলক্ষ পিসো অর্থাৎ ১৫০ ডলার পর্যন্ত দিতে চেয়েছিলেন একটা রোঙ্গো-রোঙ্গোর জন্যে। আরও দিন পাঁচেক থাকলে গুপ্ত গুহা থেকে একটা উদ্ধার করতেনই।

পিন্টো জাহাজে থরসাহেবের ফ্রগম্যানও রওনা হচ্ছে চিলি অভিমুখে। বাহাদুরি করে নিষিদ্ধ গভীরতায় ডুব দিতে গিয়ে কানের পর্দা ফাটিয়ে বসে আছে সে। গেল না কেবল মেয়র—ধর্মঘট মেটাতে পারেনি বলে।

পিন্টো রওনা হওয়ার আগে ছাত্রদের ডেকে থরসাহেব বললেন—'অনেক গুপ্ত গুহা আছে এ দ্বীপে—অনেক সম্পদ লুকানো আছে সেখানে। শীগগিরই একটা গুহায় আমি ঢোকবার সুযোগ পাব। তোমরা কিন্তু একজন মানব জাতি-তত্ত্বজ্ঞকে পাঠানোর ব্যবস্থা কোরো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমার কাজ যেন শেষ করতে পারি আমি চলে যাওয়ার পর।'

ছাত্রদের একজন মুচকি হেসে বলে গেল—'ওদের সব ধাপ্পায় কিন্তু ভুলবেন না।'

নিজের জাহাজ নিয়ে পিন্টো জাহাজকে এগিয়ে দিয়ে ভোঁ বাজিয়ে বিদায় জানিয়ে ফিরে এলেন থরসাহেব। আবার নিস্তরঙ্গ হয়ে এল দ্বীপের জীবনযাত্রা। আবার আকু-আকু আর মুখচেপা দ্বীপবাসী ছাড়া আর কেউ রইল না তাঁর আশেপাশে। মাথার ওপর তারকা খচিত আকাশ। দিগন্ত বিস্তৃত অথই সমুদ্র—মাঝে নিঃসঙ্গ, একক দ্বীপ—ঈস্টার আয়ল্যাণ্ড।

পিন্টো দিগন্তে অদৃশ্য হতেই তার অস্তিত্বটাও যেন অলীক পর্যায়ে পৌঁছোলো। অস্তিত্ব রইল কেবল ঈস্টার দ্বীপের। এ-দ্বীপের মানুষের কাছে তাহিতির সবুজ তালবৃক্ষ আর চিলির বিশাল ইমারত কাহিনী স্বপ্নসম—অস্তিত্বহীন। এ যে তাদের পৃথিবীর নাভিকেন্দ্র। আমেরিকা, চিলি, নরওয়ে, তাহিতি সবই যেন না-থাকা অবাস্তব দেশ। বাস্তব শুধু এই ঈস্টার দ্বীপ। পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের মিলন বিন্দু—পৃথিবীর নাভিমূল।

পূর্বাবস্থায় ফিরে এল দ্বীপের জীবনধারা। 'কোকোঙ্গো' এখনও দেখা দেয়নি। 'কোকোঙ্গো' এক ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা। প্রতিবছর যুদ্ধজাহাজ বিদায় নেওয়ার পর দ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে। দু-এক মাস সবাইকে শুইয়ে দেয়। বুক, পেট, মাথা ক হিল হয়ে পড়ে। কয়েকজন মারাও যায়। বাইরের মানুষের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটলেই ঘড়ি ধরে যেন বছরে একবার 'কোকোঙ্গো' আবির্ভূত হয়। কিন্তু এ-বছর এখনো রোগটা নিপাত্তা। কারণটা দ্বীপ-বাসীদের অজ্ঞাত নয়। অভিযাত্রীদের জাহাজ এসেছে যে। এতদিন দ্বীপে রয়েছে—'কোকোঙ্গো' হয়নি কারোর। দ্বীপে 'গুডলাক' নিয়ে এসেছেন থরসাহেব।

ওরোনগোতে আবার আরম্ভ হল কাজকর্ম। দ্বিতীয় মহাযুগের যাচ্ছেতাই ভাবে ভাঙাচোরা একটা অ ৩ মন্দিরের নিচে দেখা গেল দ্বিতীয় মহাযুগে নির্মিত পাকু-ইমা বৈশিষ্ট্য সমন্বিত একটা ইমারত। সামনের দিকে হাস্যমুখ গোল পাথর সারবন্দী সাজানো। বড় বড় চোখগুলো যেন প্রতীক। জটিল নির্মাণ কার্যের মধ্যখানে অনেকগুলো ফুটো রয়েছে পাথরের মধ্যে। পুরাতত্ত্ববিদের সন্দেহ হল। দক্ষিণ গোলার্ধে কর্কটক্রান্তির তারিখ ২১শে ডিসেম্বর। একটা ফুটোয় একটা ডাণ্ডা ঢুকিয়ে অপেক্ষা করার পর দেখা গেল সূর্য লাল মুখ ছাড়িয়ে উঠে আসতেই ডাণ্ডার ছায়া গিয়ে পড়ল বিশেষ একটা ফুটোয়—যে ফুটোয় ছায়া পড়বে আন্দাজ করা গিয়েছিল আগে থেকেই।

অর্থাৎ জটিল এই ইমারত আসলে একটা সৌর মানমন্দির। গোটা পলিনেশিয়ায় এই প্রথম সৌর মানমন্দির আবিষ্কৃত হল ঈস্টার দ্বীপে।

উল্লসিত হলেন গভর্নর। মকর ক্রান্তির তারিখে আর একটা ডাণ্ডার ছায়া কোন্ ফুটোয় গিয়ে পড়বে তিনি জেনে নিলেন। অভিযাত্রীরা তখন ঈস্টার দ্বীপে অবশ্য থাকবে না।

হিসেব কিন্তু মিলে গেছিল মকর ক্রান্তির তারিখে। সঠিক ফুটোয় গিয়ে

পড়েছিল তাণ্ডার ছায়া।

জমি জরীপের সরঞ্জাম বার করা হল এই সময় থেকেই। সঠিক সমকোণে সূর্যরশ্মি হেলে পড়ল সুবিশাল ইঙ্কা-স্টাইল প্রাচীরের ওপর। ইস্টারা এবং পেরুতে তাদের পূর্বপুরুষরা সূর্যোপাসক ছিল। নতুন প্রমাণ পাওয়া গেল দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন সংস্কৃতির। সেই সঙ্গে আবিষ্কৃত হল আরও নতুন তথ্য।

লাল স্তম্ভ মূর্তি খুঁড়ে বার করা হয়েছে যেখানে সেখানকার ভূগর্ভে পাওয়া গেল একটা অতিকায় মন্দির চত্বর। চারশ থেকে পাঁচশ বর্গফুট ক্ষেত্রফল। চার ধারে উঁচু মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল এককালে—চিহ্ন এখনো দেখা যাচ্ছে। মাটির দেওয়ালের নিচে পাওয়া গেল মানুষের জ্বালানো আগুনের পোড়া কাঠকয়লা। রেডিও কার্বন 14 টেস্টিং করে জানা গেল এ-আগুন জ্বালানো হয়েছে ৮০০ খৃষ্টাব্দে। টিয়াওয়ানাকোতে অনুরূপ লাল স্তম্ভ মূর্তিকে পড়ে থাকতে দেখা গেছে একই রকমের আয়তাকার মাটিতে ঢোকানো মন্দির চত্বরের মধ্যে। ঈস্টার দ্বীপের এই মন্দির চত্বরও সমতল জমি থেকে নিচু করে নির্মিত হয়েছে। বিশাল প্রাচীরের সামনে পাওয়া গেল বহু হাড়গোড়। শ্মশান ভূমি ছিল এককালে। মৃত দেহ পুড়িয়ে ছাই করা হয়েছে মন্দির চত্বরে। ঈস্টার দ্বীপের অন্ধকারে শ্মশানের নিদর্শন কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় নি।

ম্যাপ এঁকে নেওয়া হলো পুরাতন পাথর প্রাচীর এবং চত্বরের। ‘তে পিতো কুরা’র মন্দির মঞ্চের সুদীর্ঘ দেওয়াল খুঁড়তে গিয়ে সন্ধান মিলল একটা ভূগর্ভ কবরখানার। উপকূলের এই অঞ্চলেই কিন্তু ছিটকে পড়েছে সবচেয়ে বড় প্রস্তর মূর্তিটা। মানুষের গুঁড়িয়ে আসা হাড়গোড়ের মধ্যে চোখে পড়ল নিরতিশয় সুন্দর দুটো কর্ণভূষণ—কানের ফুটোয় পরত লম্বাকর্ণরা। খুব পুরু শামুকের খোলা থেকে তৈরী গয়না দুটো বাস্তবিকই দেখবার মত।

রানো রারাকুর ভেতরে বাইরেও চলেছে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারে। অল-ক্যানোর পাদদেশে পাওয়া গেছে সারি সারি গোলমত টিলা। টিলার ধার দিয়ে ট্রেঞ্চ কাটতে হুকুম দিয়েছেন থরসাহেব। বিরাট এই টিলাগুলোর স্থানীয় নামকরণ করেই নিশ্চিন্ত ছিল দ্বীপের মানুষ। বিজ্ঞানের চোখে প্রাকৃতিক টিলা ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি এদের এতদিন। এবার দেখা গেল প্রতিটি টিলাই মনুষ্য নির্মিত। পাথর খাদ থেকে টুকরো টাকরা রাবিশ পাথর ঝুড়ি বোঝাই করে এনে গড়া হয়েছে এক একটা টিলা। স্ট্যাচু নির্মাণের সঠিক সময় নির্ধারণের এ হেন সুযোগ পেয়ে বেঁচে গেলেন থর-

সাহেব। বিজ্ঞানসম্মতভাবে তারিখ নির্ণয়ের এই হল সুবর্ণ সুযোগ। টিলার গা কেটে মাটির তলায় নামতে নামতে পাওয়া গেল পাথরের ভাঙা শাবল আর কাঠকয়লার আগুনের চিহ্ন। রেডিও অ্যাকটিভিটি টেস্ট করা হল এই কাঠকয়লার। জানা গেল, ১৪৭০ সালে আগুন জ্বালানো হয়েছে সেখানে অর্থাৎ লম্বকর্ণদের পরিখায় আগুন জ্বালিয়ে পাইকারী হারে লম্বকর্ণদেরই পুড়িয়ে মারার দু-শ বছর আগে।

পিন্টো জাহাজে ঠাঁই না পাওয়ায় মেয়রের খুব একটা বিকার দেখা যায় নি। দোরগোড়ায় বসে তন্ময় হয়ে থাকত দারুমূর্তির মাজাঘষা নিয়ে। গভর্ণরের ইচ্ছায় থরসাহেব কথা দিলেন, তাহিতি পানামা-হিভাওয়া যাওয়ার সময়ে মেয়রকেও নেওয়া হবে সঙ্গে। মেয়রের উল্লাস তখন দেখে কে! একেই বলে গুড লাক। সবই আকু-আকুদের মহিমা!

অতএব আবার ঠাকুমার কাছে ধর্না দিল মেয়র। কিন্তু কিছুতেই রাজী করা গেল না চ্যাটা বুড়িকে! মরেও জেদ কমেনি। কিন্তু রাত্রে ঘুমোয় কার সাধ্যি আকু-আকুর খোঁচানি আর চিমটির জ্বালায়। গুহায় যাওয়ার জন্যে পাগল করে দিল মেয়রকে। নিরুপায় হয়ে গুপ্ত গুহায় গিয়ে দাঁত বার করা একটা বিকট মূর্তি নিয়ে যেই চলে আসতে গিয়েছে মেয়র অমনি আবার কানের কাছে শুরু হল ফিসফিসানি—'আরো নাও...আরো নাও।' অগত্যা দু-হাত ভরে যত মূর্তি পারে তুলে এনেছে মেয়র। লুকিয়ে রেখেছে গ্রামের বাইরে গুপ্ত স্থানে। জীপ নিয়ে থরসাহেবকে গিয়ে দেখে আসতে হবে রাতের অন্ধকারে।

এবারের গুহাসম্পদের বেশীর ভাগই জন্তুমূর্তি। বেশী করে দেখা গেল অদ্ভুত একটা ঘাড়-লম্বা জন্তুকে। নাক আর চোয়াল লম্বাটে। ওপরে তিনটে আর নিচের তিনটে দাঁত ছাড়া ফোকলা। কিন্তু মুগ্ধ হতে হল তিন মাস্তুল-ওয়ালা একটা ভারী সুন্দর নলখাগড়া জাহাজের মডেল দেখে। গোলাকার পালের ছিদ্র রয়েছে চওড়া এবং ঠেলে বেরিয়ে আসা ডেকে। কে বলবে কঠিন লাভা পাথর খোদাই করে নির্মিত মডেল—যেন ময়দার তাল দিয়ে বানানো অনুপম শিল্প নিদর্শন।

পালের গায়ে নলখাগড়াগুলো বাঁধা হয়েছে লম্বালম্বি ভাবে। এই দেখেই নাকি মেয়র জেনেছে সেকালের পাল তৈরী হত কিভাবে।

সেদিনই কাশতে দেখা গেল মেয়রকে। ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ আরম্ভ হল তাহলে। সুতরাং গুহায় প্রবেশ এখন বন্ধ। অতীতে যারা গেছে গলা খুশ খুশ করা সত্ত্বেও, তারা স্বেচ্ছায় মরতে গেছে। মরেওছে

গুহায় লুকিয়ে থেকে।

ঝড় উঠল সেইদিন। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে জাহাজ আর নিরাপদ নয়। গ্রামের দিকে শান্ত সমুদ্রে দিন ছয়েকের জন্যে জাহাজ নিয়ে গেল স্কীপার। আনাকেনায় জাহাজ ফিরিয়ে আনার পরে ওয়াকি-টকি মারফৎ থরসাহেবকে জানালে, জাহাজে একজন নেটিভও এসেছে। দরকারী একটা বস্তু দেখাতে চায় সিনর কোনটাইকি কে।

নেটিভটি এসতেভান। খুশী যেন আর চেপে রাখতে পারছে না। থরসাহেব কি একটা অন্ধকার ঘরের ব্যবস্থা করতে পারেন?

কেবিন ঘরের পর্দা নামিয়ে দিতেই ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। দুটো মূর্তি বার করল। একটাকে রাখল মেঝেতে—আরেকটাকে বাঙ্কের পাশে উচ্চাসনে। তারপর নিজেও ধড়াচূড়া পালটালো। নাচ-আরম্ভ হবে নাকি? অন্ধকারে এর বেশী যে ছাই দেখাও যাচ্ছে না।

না, নাচ নয়। গান। সুর করে স্তোত্রপাঠ শুরু করল এসতেভান। এক হাত রইল মেঝেয় রাখা মূর্তির ওপর। অদ্ভুত পলিনেশিয়ান ভাষার সুরেলা স্তোত্রসঙ্গীতের বিন্দু বিসর্গ বুঝতে পারলেন না থরসাহেব। কিন্তু গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল অন্ধকারে। অদ্ভুত ছমছমে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে ছোকরা। আবেগে গলা কাঁপছে। সুর উঠছে, নামছে। শেষের দিকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কথা না বুঝলেও নিজের নামটা বেশ কয়েক বার উচ্চারিত হতে শুনলেন থরসাহেব।

শেষ হল শয়তান-পূজা। পর্দা সরিয়ে দিতে বলল এসতেভান। চোখে তার জল। কিন্তু মুখে হাসি। গায়ে জীর্ণ উলের জার্সি। মাথায় তিমি শিকারীদের কান ঢাকা টুপি।

মেঝের ওপর রাখা মূর্তিটা বালি দিয়ে ঘ:স মেঝে চকলেট মূর্তির মত একটা পিণ্ড করে তোলা হয়েছে। কিন্তু উঁচুতে রাখা মূর্তিটা অপেক্ষাকৃত শক্ত ধূসর পাথর খোদাই করে তৈরী বলে অটুট রয়েছে। সাক্ষাৎ শয়তান যেন। পশুমূর্তি। চিবুকে ছাগুলে দাড়ি। পিঠকুঁজো। দাঁত বার করে সে কি ভয়াল হাসি।

হ্যাঁ, দুটো মূর্তির মধ্যে এই মূর্তিটাই বেশী অশুভ শক্তির অধিকারী। দুটোই এসতেভানের বউয়ের দুটো গুহা পাহারা দেয়। এরাই রেগেছে বলে গুহার বাইরে পাথর আনা বন্ধ করেছে সে। এখন বউ বেচারীর পেটে আরম্ভ হয়েছে যন্ত্রণা। তাই আকু-আকু দুজনকে ঠাণ্ডা করার জন্যে থরসাহেবের সামনে আনার ইচ্ছা প্রকাশ করছে তার বউ। সেইসঙ্গে

এনেছে আরও পাঁচটা পাথর। চমৎকার একটা পাথরের জাহাজ—দুদিকে দুটো মানুষ মূর্তি। এর কথা আগেই বলেছিল এসতেভান। আর আছে একটা দু-মুখো গায়ে-কাঁটা-জাগানো ভয়াল ভয়ংকর দানো মূর্তি। সবই এখন থরসাহেবের সম্পত্তি।

শুধু তাই নয়। গুপ্ত-গুহার আইনতঃ অভিভাবক এই দুটো আকু-আকুও এখন থেকে থরসাহেবেরই হয়ে গেল। বছরে চারবার এদের সাফ করতে হবে। ছিদ্রময় পাথরে সাদা তুলোর মত জাল গজায়, পোকা ডিম পাড়ে। বালি আর জল দিয়ে মেজে ঘসে ধোঁয়া দিয়ে এদের যেন পরিষ্কার রাখা হয়।

থরসাহেব যদি মনস্থ করেন, আকু-আকু দুটো অন্য কাউকে দেবেন—তখনও এই রকম অনুষ্ঠান করতে হবে। নইলে আকু-আকু খাপ্পা হবে। বড় বদ্‌মেজাজী এরা।

এরা কি শয়তান ? থরসাহেবের প্রশ্নের উত্তরে এসতেভান স্প্যানিশ-ভাষা'য় যা বললে, তার মানে শয়তানই বটে। ঈস্টার দ্বীপে এরাই আকু-আকু।

অশুভ শক্তিধর মূর্তি দুটো পাচার করতে পেরে ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে গেল এসতেভানের। অধিকার থাকলে বাকী গুহা দুটোর আকু-আকুদেরও এনে দিত জাহাজে। এ দ্বীপের সমস্ত আকু-আকু জাহাজে চাপিয়ে দ্বীপের বাইরে নিয়ে গেলে দ্বীপের মানুষ বেঁচে যায়। নিষ্ঠাবান খৃস্টান সবাই। পূর্ব-পুরুষদের আচার অনুষ্ঠান করে যেতে হয় আকু-আকুদের ভয়ে। এ সব কি পোষায় ?

স্কুলে পড়া বিদ্যে আছে এসতেভানের। আকু আকু প্রশস্তি লিখে দিল কাগজে। মানেটা কিন্তু বলতে পারল না। সেকালের পলিনেশিয়ান ভাষা তো। মোটামুটি অর্থ হল—বহির্জগতের অধীশ্বর লিনর কোনটাইকি এসেছেন দ্বীপে। তাঁর জাহাজ জলে ভাসছে। আকু-আকু দুজন আগুনে সেঁকা মুরগির নাড়ি ভুঁড়ি উদরস্থ করে পরিতৃপ্ত যখন, তখন যেন সব মঙ্গল হয়।

অর্থাৎ জাহাজে ওঠার আগে মুরগি পুড়িয়ে নাড়ি ভুঁড়ির ভোগ দিয়ে এসেছে এসতেভান আর তার গুণবতী স্ত্রী।

থরসাহেব কিন্তু ডাক্তারকে নিয়ে এরপর গেলেন এসতেভানের বাড়ী। আড়াল থেকে বেরিয়ে এল স্ত্রী। পরমা সুন্দরী মেয়ে। জেদী কাঠখোট্টা নিরস প্রকৃতির একদম নয়—আগে যা ভেবেছিলেন থরসাহেব। চোখ বেশ

বুদ্ধিদীপ্ত। স্প্যানিশ ভাষা ভাল জানে না। এসতেভান মাঝে থেকে আলোচনা অব্যাহত রাখল। না, থরসাহেবকে কোনমতেই গুহার মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আকু-আকু রেগে টং হলে সঙ্গে যে যাবে তাকে মরতে হবে। এসতেভানকে বি শ্রীক করার অথবা নিজে বিধবা হবার সাধ তার নেই। গুহার মধ্যে মূর্তিগুলোর ফটোও সে তুলে আনতে পারবে না— জগৎ দেখে ফেলবে যে গুহার ছবি। তবে হ্যাঁ, মূর্তিগুলোকে বাইরে এনে ছবি তুলতে পারেন থরসাহেব। এই বাড়ীতেই উঠানে ছবি।

পেটের ব্যামো তেমন কিছু নয়। কাল সকালে পেনেও সেরে যাবে। নিদান দিলেন ডাক্তার।

গুপ্ত গুহার মূর্তিগুলোর স্রষ্টা কে?

এসতেভানের স্ত্রীর ঠাকুরদা। বাবাকে শেখাও—বাচ্চা অবস্থায় শুনেছে এসতেভানের বউ। সব মূর্তিই ঠাকুরদা'র তৈরী।

যাক, অন্ততঃ একটা গুহার খবর পাওয়া গেল। আসলে ঈস্টার দ্বীপের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলা চলে গুহাগুলোকে। শিল্প শিক্ষার স্কুল। শিল্প সৃষ্টি-গুলোও লুকিয়ে রাখা হয়েছে ঘরানা হিসাবে—পাছে সবাই শিখে ফেলে।

ভারতবর্ষেও বংশ পরম্পরায় সঙ্গীত ঘরানা চলে আসছে এইভাবে। বংশের মানুষ ছাড়া শিক্ষার সুযোগ কেউ পায় না। ঈস্টার দ্বীপের মানুষদের দোষ কী।

৮। ঈস্টার আয়ল্যাণ্ডের গুপ্ত গুহার ভেতরে

সূর্যাস্তের সময়ে একদিন দেখা গেল রহস্যময় সেই ঘোড় সওয়ারকে।

সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে আসছে। রানো রারাকুর পাথর খাদ থেকে পাশা-পাশি ঘোড়ায় চেপে থরসাহেব আর ল্যাজারাস চলেছেন আনাকেনায় ক্যাম্প অভিমুখে। লম্বা ছায়া পড়েছে পেছনে। চারিদিক নিস্তব্ধ। নিঝুম। নির্জন।

আচমকা স্তব্ধ হলেন থরসাহেব। সহসা ডাইনে আবির্ভূত হয়েছে একজন তৃতীয় ঘোড়সওয়ার। কালান্তক যমদূতের মত সটান চেয়ে আছে থরসাহেবের পানে। পাণ্ডাসপানা মুখে প্রাণের স্পন্দন যেন নেই। দীর্ঘ শীর্ণ মূর্তি যেন পাথর কুঁদে গড়া। থরসাহেব গতিরুদ্ধ করতেই

সে ও দাঁড়িয়ে গেল। থরসাহেব লাগাম ঢিলে দিয়ে এগোতেই ঘোড়সওয়ারও এগোলো।

কে এই রহস্যময় ঘোড়সওয়ার? চেনা তো যাচ্ছে না।

ল্যাজারাস কিন্তু চেনে। খাটো গলায় পরিচয় দিল থরসাহেবকে। গাঁয়ের কবরখনকের সহোদর ভাই। দিন কয়েক আগে ল্যাজারাসকে ধরেছিল থরসাহেবের দলে ঢুকিয়ে দিতে। কিন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত ভাবলেশহীন এ-হেন মানুষকে চাকরী দিতে প্রস্তুত নন থরসাহেব।

লোকটা কিন্তু কাছেও আসছে না। কথাও বলছে না। দূরত্ব বজায় রেখে কেবল পেছন পেছন আসছে। দাঁড়ালে দাঁড়াচ্ছে। চললে চলছে। চোখ রয়েছে থরসাহেবের ওপর। মাইলের পর মাইল অব্যাহত রইল পাছু নেওয়া। তারপর আঁধার হয়ে এল চারিদিক।

যেতে যেতে ল্যাজারাসকে বললেন থরসাহেব, গুপ্ত গুহা নিয়ে এত লুকোচাপার অবসান ঘটবে ভবিষ্যতে। সুড়ঙ্গ সন্ধানী যন্ত্র দিয়ে বলে দেওয়া যাবে কোথায় কোথায় আছে গুপ্ত গুহা।

ল্যাজারাস ভড়কে গেল। এ-যন্ত্র প্রথম যে আমদানী করবে ঈস্টার দ্বীপে, রাতারাতি কুবের সম্পদের মালিক হয়ে বসবে সে। পায়ের তলাতেই তো সুড়ঙ্গের ছড়াছড়ি। প্রবেশ পথের সন্ধান কেউ আর জানে না। বেশী কি, গাঁয়ের মধ্যে যন্ত্র নিয়ে গেলেই সেকালের এক রাজার একটা তিনশ গজ লম্বা সুড়ঙ্গের সন্ধান মিলবে। গাঁয়ের একদম উত্তর প্রান্ত থেকে এই সুড়ঙ্গ গিয়েছে সমুদ্র পর্যন্ত। যে লোকটা খবরটা এনেছিল, আবু-আকুকে ফাঁকি দিয়ে অভিকায় কারুকটা বর্শাফলকও এনেছিল গুহা থেকে। পরিণামটা হল ভয়ানক। আবু আকু তাকে কামড়ে আর খাঁমচিয়ে যমালয়ে পাঠিয়েছে।

পরের দিন সকালবেলা তাঁবুর বাইরে বেরোতেই পাতাসপানা চর্মাবৃত শীর্ণ মূর্তিটাকে ফের দেখতে পেলেন থরসাহেব। তাঁবুর চৌহদ্দির বাইরে ঘাসের ওপর বসে রয়েছে স্ট্যাচুর মত। স্থির চাহনি নিবদ্ধ থরসাহেবের ওপর।

রাত হল। শুতে গেল সবাই যে-যার তাঁবুতে। দূরে পাঁচিলের সামনে ছায়ামূর্তির মত বিচিত্র ব্যক্তিটিকে বসে থাকতে দেখলেন থরসাহেব।

সেই রাতেই ভয়াবহ ঝড়জল আরম্ভ হল ঈস্টার দ্বীপের ওপর। বজ্রপাত আর মুষলধারে বৃষ্টি। অথচ ঝড়জলের সময় তখন নয়।

সকাল হতেই সোরগোল উঠল ক্যাম্পে। বন্যার মত জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে তাঁবু চত্বরের ওপর দিয়ে। জিনিসপত্র জলে ভাসছে। রান্না তাঁবুর ময়দা জলে গলে সে এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড। রান্না তাঁবু ঝড়ে উড়ে

যাওয়ায় এই বিপত্তি। জল নামছে জীপ যাতায়াতে পথ বেয়ে নদীর আকারে।

তাড়াতাড়ি খাল কেটে জলের ধারা ঘুরিয়ে দেওয়া হল অন্যদিকে। দ্বীপবাসীদের আনন্দের কিন্তু অবধি নেই। কুয়োটুয়োগুলো শুকিয়ে এসেছিল—বৃষ্টির জলে সেগুলো ভরে উঠেছে। এমন কি জাহাজেও কয়েক টন বৃষ্টির জল ধরা হয়েছে খাবার জলের ট্যাঙ্কে—এক গাদেই।

বৃষ্টি নাকি সৌভাগ্য নিয়ে এসেছে দ্বীপে—দ্বীপবাসীদের তাই খুব উল্লাস।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এনেছে কেবল একজনের জীবনে। হোতু মাতুয়ার গুহায় শুয়ে কালো ছাগলের মত ছটফট করছে। মৃত্যুর নাকি আর দেরী নেই। ফ্যামিলি গুহা থেকে পাথর নিয়ে ফেরবার সময় আকাশ ভেঙে নামে বৃষ্টি। তারপর এখন প্রাণটা যেতে বসেছে।

পরের দিন বাড়ে ব্যাপারটা শুনলেন ধরসাহেব। খবর নিয়ে এল এসতেবান আর তার বউ। হোতু মাতুয়ার গুহায় যে মরতে বসেছে তাকে ধরসাহেব চেনেন বইকি। ঘোড়ায় চড়ে সে ছুটে গিয়েছিল, গাবুর বাইরে ছুটি করে বসেছিল। কবর খনকের সাগরেদ—রহস্যময় ঘোড়সওয়ার যে শেষ দেখা দেখতে চায় ধরসাহেবকে। ডাক্তার নিয়ে গেলে হয় না?

ডাক্তার নিয়ে গেলেন ধরসাহেব। যেতে যেতে ল্যাজারাসের মুখে শুনলেন সব কথা। কবর খনকের এই শাগরেদ গোপনে তাকে সব বলেছে। নিজের গুপ্তগুহা থেকে খান কয়েক পাথর নিয়ে বেরিয়ে আসার সময়ে হঠাৎ রুদ্র হয়েছে প্রকৃতি। তারপরেই এই ব্যাধি। প্রাণ যায় যায় অবস্থা।

হোতু মাতুয়ার গুহাভর্তি লম্বকর্ণরা নির্বিকার ভাবে চেয়েছিল এক প্রান্তে যন্ত্রণায় তেউড়ে যাওয়া ক্ষীণ মূর্তিটার দিকে। আকু-আকু যাকে নিয়েছে, তাকে বাঁচায় কার সাধ্য।

কিন্তু সাবাস আধুনিক ওষুধ। আকু-আকু পালাবার আর পথ পেল না। কলিক পেনে কাৎরাচ্ছিল কবর খনকের শাগরেদটা। ওষুধ পড়তেই ব্যথা কমল। যথা সময়ে সেরেও গেল। আকু-আকুকে প্রসন্ন করার জন্য তৎক্ষণাৎ কিন্তু পাগল হয়ে উঠল মৃত্যুর দোর গোড়া থেকে ফিরে আসা ভয়ে আধমরা লোকটা। পড়ি কি মরি করে দৌড়ে পাথর রেখে এল গুপ্ত গুহায়। কাজ কি বাবা আকু-আকুকে ঘাঁটিয়ে। অকালবৃষ্টি নামিয়ে প্রাণ নিয়ে, টানাটানি করে যে তার হেপাজতেই ফিরে যাক ফ্যামিলি পাথর।

হোতু মাতুয়ার গুহানিবাসী লোকগুলোর মনে গভীর রেখাপাত ঘটে গেল এই ঘটনায়।

তাঁবুতে ফিরে এসে বিছানার ওপর একটা সিংহ অথবা পুমার প্রস্তর মূর্তি দেখলেন থরসাহেব। গিন্নী বললে, মেয়রের ছোটভাই তাঁবুর তলা দিয়ে মূর্তিটাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে চম্পট দিয়েছে।

পরের দিন খোলা গোঁফ আর গরুর মত বড় বড় চোখ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল আতান—মেয়রের ছোট ভাই। তার নিজস্ব একটা গুপ্ত গুহা আছে। সাইজে ছোট হলেও ষাটটা পাথর খোদাই মূর্তি আছে সেখানে। ল্যাজারাসের কাছে সে শুনেছে, শীগগিরই নাকি মেশিন দিয়ে দ্বীপের সমস্ত গুপ্ত গুহার সন্ধান করা হবে। এতদিন ধরে এত যত্নে রাখা গুপ্ত গুহা আর গুপ্ত থাকবে না জেনে বেজায় মুষড়ে পড়েছে বেচারা। রাজী হলে গুহার যাবতীয় বস্তু মিউজিয়ামে দান করতে পারলে সে বাঁচে এখন।

তিন রাত পরে গাঁয়ের ধারে নিজের ছোট কুঁড়ে ঘরে থরসাহেবকে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি আতান বললে, বুড়ি পিসী তাং-তাক রাজী হয়েছে। তিন দাদার মধ্যে দুই দাদা—পেড্রো আর জুয়ান বলেছে এখুনি যেন গুহার দখল দেওয়া হয় থরসাহেবকে। কিন্তু বেঁকে বসেছে আর একদাদা, তার নাম এসতেভান আতান।

থরসাহেবকে ঘরে বসিয়ে এই একবগ্‌গা দাদাটিকে নিয়ে এল আতান। বছর তিরিশ বয়স। চমৎকার পেটাই চেহারা। চোখ মুখ গায়ের রঙ দেখে খাঁটি ইউরোপীয় বলে মনে হয়—উত্তর ইউরোপে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে কেউ ধরতেও পারবে না।

থরসাহেবের কাজে একদম হাত লাগায়নি এই একজনই—অথচ খাঁটি লম্বকর্ণ সে। তাহিতি পাড়ি দেবার জন্যে যে বড় নৌকোটি নির্মিত হয়ে পড়ে রয়েছে—থরসাহেবরা জাহাজ নিয়ে পাছে পেছন নেয়, এই ভয়ে যে নৌকোটিকে জলে ভাসানো যাচ্ছে না, অভিযাত্রীদের জাহাজ দ্বীপ ছেড়ে গেলেই যে ডানপিটের দলটি তাহিতি রওনা হবে এই নৌকোয় চেপে—এসতেভান আতান তাদের দলপতি।

পাগলের গোদাটিকে তাহলে দ্বীপের একমাত্র স্কীপার বলা যায়। সমুদ্র স্রোত, হাওয়ার গতিবিধি ইত্যাদি সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য লক্ষণীয়। থরসাহেবকে জেরা করে জানতে লাগল নানান তথ্য।

থরসাহেব প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন গুপ্তগুহার ব্যাপারে।

দ্বীপের স্কীপারেরও একটা গুহা আছে বই কি। একশটা চমৎকার খোদাইকরা পাথর আছে সে গুহায়। সবসেরা হল একটা রোঙ্গো-রোঙ্গো 'কেতাব'।

রোঙ্গো-রোঙ্গো কেতাব? হ্যাঁ, বই। পাতায় পাতায় লেখা আছে রোঙ্গো-রোঙ্গো। আজ পর্যন্ত দ্বীপের কেউ সে জিনিস দেখেনি—খবরও রাখে না। তার ফ্যামিলি গুহার সর্দারনী-হল গিয়ে পিসী তাহু-তাহু। ডাকসাইটে জাদুকরী। তার নিজেরও একটা গুহা আছে—একদিন তা ভাইপোরই হবে। তাহু-তাহুর কিন্তু বিলক্ষণ দুর্বলতা আছে ধরসাহেবের ওপর—তাঁর দেওয়া সিগারেট খেয়ে বড় ভাল লেগেছে। সেইসঙ্গে পেয়েছে একটা কালো বস্ত্র—যা তার বিশেষ দরকারে লাগবে।

দিনকয়েক পরেই দারুণ খবর এল। ব্রাড পয়েজনিং-য়ে মরতে বসেছিল আতান। গাঁয়ের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। গেঁইয়া ডাক্তার আঙুলে বর্শা ফুটিয়ে প্রাণটা বাঁচিয়ে দিয়েছে। কপাল ভাল বলে এযাত্রা বেঁচে গেছে।

যাচ্ছলে। গুপ্তগুহার দখলদারি হাতে এসেও কি ফস্কে যেতে বসেছে।

ছুটলেন আতানের বাড়ী। আঙুলে বিরাট ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে মুমূর্ষু মুখে অভ্যর্থনা জানাল আতান। দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসল টেবিলে। মোমবাতি জ্বেলে কাপড়ের ঢাকনা খুলে দেখাল একটা পৈশাচিক বিকট মুণ্ড দাঁত খিঁচিয়ে যেন কামড়াতে আসছে। চোয়াল আর দাঁত অতি সুস্পষ্ট। চোখ আর নাসিকা গহ্বরের ফুটোগুলো অন্ধকারময়। কঠিন লাভা পাথর কুঁদে তৈরী ভয়াবহ মুণ্ডটার মাথায় অদ্ভুত দুটো কাপের মত গর্ত। আকারে বুড়ো আঙুলের নখের মত।

করোটি দেখিয়ে বললে আতান—'নিন, আপনার জিনিস।'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন ধরসাহেব। ঝটিতি বলল আতান—'খুলির মাথায় এই যে দুটো ছোট ছোট গর্ত দেখছেন, এখানে থাকত হাড়ের গুঁড়ো। আকু-আকুর হাড়ের গুঁড়ো। আর এই মুণ্ডটা হল গুপ্তগুহায় ঢোকবার চাবি। গুহায় যার অধিকার নেই, সেরকম কোনো লোক এ-চাবি ছুঁলেই আকু-আকু তাকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দিত। কিন্তু আমার পিসী গুহায় গিয়ে হাড়ের গুঁড়ো খুব সাবধানে সরিয়ে ফেলেছে। তাই আর কোন ভয় নেই আমার। এখন থেকে এ-চাবি আপনার হয়ে গেল। যদ্দিন না গুহায় ঢুকছেন, বিছানার তলায় রেখে দেবেন। গুহায় ঢোকবার সময়ে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।'

মোমবাতির ছায়ামায়ায় দাঁত বারকরা মুণ্ডের সামনে আতান আতানের চাপা গলায় হুঁশিয়ারি শুনে গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল ধরসাহেবের। দৃশ্যটা অবিস্মরণীয়।

ঘর নিস্তব্ধ। কিন্তু বাইরে এত ঘোড়সওয়ার যাতায়াত করছে কেন? রাত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এত কিসের তৎপরতা গ্রামে?

কিন্তু থরসাহেব তো আর একা গুহায় যাবেন না—সঙ্গে ফটোগ্রাফার নেবেন। আরও দু-একজনকে নিতে হবে। রাজী কি হতে চায় আতান। তারপর ভেবে দেখল, যার গুহা সে যদি লোক নেয় সঙ্গে—কিছু বলার নেই। তাতে কপাল মন্দ হবার সম্ভাবনাও থাকছে না। তবে হ্যাঁ, আতানও সঙ্গে নেবে একজনকে। এ ছাড়াও বুড়ি পিসী থাকবে গুহার বাইরে।

দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। সেই দিনই সকালের দিকে গুহায় গিয়ে পিসী একটা মুরগী সেঁকে রেখে এল— আকু-আকুকে আগে প্রসন্ন করা দরকার।

যাওয়ার আগে ভোজসভা অনুষ্ঠিত হল তাঁবুতে। জীপে করে এল আতান, তার ভাই আর এক বন্ধু। গম্ভীর মুখে সবাইকে পলিনেশিয়ান ভাষায় বলতে হল—'আমি নরওয়ের লম্বকর্ণ। নরওয়ে-লম্বকর্ণদের মাটির উনুনে রাঁধা খাবার খাচ্ছি।'

এতক্ষণে বুঝলেন থরসাহেব—তাঁকে দিয়েই আকু-আকুকে তুষ্ট করা হল।

কিন্তু হাসতে পারলেন না। পই-পই করে বারণ করেছে আতান। উৎকট গম্ভীর হয়ে আচার অনুষ্ঠান করে যেতে হবে—হাসলেই আকু আকু চটবে। অভিযান ভণ্ডুল হবে।

রাত গভীর হতেই সদলবলে গুহা অভিমুখে রওনা হল আতান। থরসাহেব ব্যাগের মধ্যে নিলেন গুহায় ঢোকাবার চাবি—সেই বিকট দর্শন মুণ্ডটা।

প্রথমে জীপ গেল দ্বীপের কেন্দ্রে উচ্চভূমিতে। লোককে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে বাসি জামা কাপড় আনা হয়েছিল জীপে—ভেড়ার খোঁয়াড়ের ম্যানেজার-মেয়েকে দেওয়া হল কেচে দেওয়ার জন্যে।

যাত্রা শুরুর সময়ে তারা ঝকমক করছিল আকাশে। এখন নামল বৃষ্টি। ঘাবড়ে গেল আতান। লক্ষণ ভাল মনে হচ্ছে না তো! ঘাবড়ে গেলেন থরসাহেবও। শেষ মুহূর্তে না পেছিয়ে যায় কুসংস্কার ঠাসা আতান।

পথিমধ্যে আবার উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করল জীপটা। খানায় পড়ে গোঁ-গোঁ করতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল আতান আর তার বন্ধু। মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে। আকু-আকু পথ আটকাল মনে হচ্ছে?

কিন্তু না। ঝাঁকুনি মেরে খানা টপকে ছিটকে গেল জীপ। আকু-

আকুর ক্ষমতা নেই দুর্ধর্ষ এই জীপের পথ রুখে দাঁড়াবার।

আগে ঠিক ছিল জীপ রেখে বাকী পথটুকু হেঁটে যেতে হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে পেঁৗছে মত পালটালো আতান। আগে তার বাড়ী যাওয়া যাক— জিরেন নিয়ে রওনা হওয়া যাবে। বাড়ী মুখো জীপ এগোতেই আবার শুরু হল কাঁদুনি—না, না, আগে যাওয়া যাক তার ভাইয়ের বাড়ী। নিজের বাড়ীতে এত রাতে যাওয়া ঠিক হবে না।

ভাই তো সঙ্গেই এসেছে—এসতেভান আতান—গেঁইয়া স্কীপার। তার বাড়ী যেতে গিয়ে পা মচকে যাওয়ার উপক্রম হল অভিযাত্রীদের। আলগা লাভা পাথরে ছাওয়া বিপজ্জনক একটা প্রান্তর পেরিয়ে তবে তার নিরালা কুটির। জানলায় টোকা মারতেই বেরিয়ে এল তার খাণ্ডারনী বউ। খাঁটি হ্রস্বকর্ণ। চুল কালো। সুগঠিত সুঠাম শরীর। বছর তিরিশ বয়স। মুখভাব অতিশয় গম্ভীর। বর্বর বিউটি বলা যায়।

অভিযাত্রীদের টেবিলে বসিয়ে মোমবাতি জালিয়ে ভেতর থেকে প্রচ্ছদহীন রোঙ্গো-রোঙ্গো বইটা নিয়ে এল গেঁইয়া স্কীপার।

বই মানে একটা পাণ্ডুলিপি। পাতা হলদে হয়ে এসেছে। চিলিতে স্কুলের ছেলে মেয়েরা যে খাতায় হাত মক্স করে, এ-সেই খাতা। কিন্তু তাতে লেখা হয়েছে একেবারে অন্য জিনিস।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন থরসাহেব।

গেঁইয়া স্কীপার ধাপ্পা দেওয়ার জন্যে যে শিলাময় এই প্রান্তরে টেনে আনেনি—পাণ্ডুলিপিটাই তার প্রমাণ। এ বই যে লিখেছে, রোঙ্গো-রোঙ্গো লিখনের গুপ্তরহস্য সে জানত। পাতায় পাতায় আঁকা রহস্যময় এই সাংকেতিক চিহ্নগুলো দিয়ে প্রাচীন ছবি-লেখার অর্থ তার কাছে দিনের আলোর মত সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

কেন না, নিছক কেতাব এটা নয়, রোঙ্গো-রোঙ্গোর সাংকেতিক লিপির অভিধান। বাঁ দিকের স্তম্ভে ছবি-সংকেতগুলো স্পষ্টভাবে এঁকে ডান দিকের স্তম্ভে তার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ঈস্টার আয়ল্যাণ্ড পলিনেশিয়ান ভাষায়—গোটা গোটা রোম্যান অক্ষরে।

এই বই পেল কোথায় আতানের দাদা? বইয়ের একটা পাতায় 1936 লেখা রয়েছে কেন?

বইটা আতানের বাবা মারা যাওয়ার এক বছর আগে দিয়ে যায় আতানের দাদাকে। বাবা অবশ্য নিরক্ষর ছিল। রোঙ্গো-রোঙ্গো তো দূরের কথা, আধুনিক কোনো হরফের সঙ্গেও পরিচয় ছিল না। কিন্তু অন্ধের মত পুরোনো

পাঠাখসেথাওয়া বই থেকে কপি করেছে—সে বই পেয়েছিল তারও বাবার কাছ থেকে। আতানের এই ঠাকুর্দা শুধু যে বিদ্বান ছিল তা নয়, কাঠ আর পাথরে রোঙ্গো-রোঙ্গো খোদাই করতে পারত। রোঙ্গো-রোঙ্গো গানও গাইতে পারত। সেই সময়ে দ্বীপের কিছু লোক পেরুতে ক্রীতদাস হিসেবে থাকার সময়ে আধুনিক অক্ষর শিখে নিয়েছিল। এদেরই একজন ঠাকুর্দাকে দিয়ে সাংকেতিক প্রতীকগুলোর মানে লিখিয়েছিল—যাতে অতীত ঐতিহ্য নিদর্শন একেবারেই হারিয়ে না যায়। ক্রীতদাস আক্রমণ শুরু হওয়ার সময়ে দ্বীপের প্রাচীন বিশেষজ্ঞ আর কেউ ছিল না—রোঙ্গো-রোঙ্গোর অর্থও একেবারে হারিয়ে যেত এই অভিধান লেখা না হলে।

বইটা সযত্নে ফ্যামিলি গুহায় সিমেন্ট ব্যাগে এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল আতানের দাদা। আতানের বৌ'ও পর্যন্ত জানত না অমূল্য এই গ্রন্থ আছে তার কাছে। এই বইও খাস্তা হয়ে এসেছে, সুতরাং আর একটা নকল সে বানিয়ে রাখবে মনস্থ করেছে। একচল্লিশটা পৃষ্ঠার পাতায় পাতায় এত হরফ আর ছবি কপি করার কথা ভাবলেই কিন্তু উৎসাহ নিভে যাচ্ছে।

থরসাহেব প্রতিটি পৃষ্ঠার ফোটোগ্রাফ-কপি করার প্রস্তাব করলেন। অনেক গাঁইগুঁই করে-অবশেষে রাজী হল আতানের দাদা। ফটো তুলে না নিলে কিন্তু অমূল্য এই গ্রন্থ সভ্যসমাজ আর দেখতে পেত না। সমুদ্র-বিলাসী আতানের দাদা পাণ্ডুলিপিসহ সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে আর ফিরে আসেনি।

রাত গভীর হচ্ছে। রওনা হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন থরসাহেব। আতানের সমুদ্রবিলাসী দাদা বললে, এত অধীর হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। রাত এগারোটা বাজলেই সে টের পাবে কেন না, ঠিক ঐ সময়ে হাম্বা-হাম্বা করে উঠবে একটা গাভী।

গাভীর ডাক কিন্তু কানে এল না থরসাহেবের। কিছুক্ষণ পরেই গাত্রোত্থান করলেন সবাইকে নিয়ে। জীপ চলল দ্বীপের একদম উত্তর দিকে। খুঁটি খাদ রইল পেছনে। ঘন্টাখানেক পরে অনেক পেছনে হারিয়ে গেল গ্রাম।

ঠিক এই সময়ে বৃষ্টি থামল। সমুদ্র-বিলাসী আতান বললে—'লক্ষণ শুভ। বৃষ্টি থেমেছে।'

মন্তব্যটা অদ্ভুত। কেননা শুষ্ক ঋতুতে বৃষ্টি হওয়াটাই ভাল লক্ষণ ঈস্টার দ্বীপবাসীদের কাছে।

জীপ থেকে নেমে একটা সঙ্কীর্ণ এবং বিপদসংকুল প্রাচীরের ওপর দিয়ে

যেতে হল প্রাণটাকে হাতে নিয়ে। প্রাচীরের ওপর উঠতে গিয়েই তো প্রাণটা বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল—তারপর এই ধরণের সঙ্কীর্ণ পথে যাওয়া কি সোজা কথা? তাতেও কি রক্ষে আছে! ধরসাহেবকে টর্চ নিয়ে আগে আগে যেতে নির্দেশ দিয়েছে আতান। কিছুদূর যেতেই টর্চ গেল নিভে। অমনি সে কি উদ্বেগ লম্বকর্ণ তিনজনের! না জানি আবার কি অশুভ লক্ষণ দেখা দিল। তাড়াতাড়ি অন্ধকারে ফটোগ্রাফার নিজে টর্চ চালান করল ধরসাহেবের হাতে। নিশ্চিন্ত হল আতান-ভ্রাতা তুজন।

শস্যক্ষেতের মধ্যে দিয়েও যেতে হল, কিছুটা পথ। জায়গাটার নাম মাতামিয়া। ঈস্টার দ্বীপের ভাষায় যার নাম মঙ্গলগ্রহ। ডানদিকে একটা আর সামনে তুটো বড় পাহাড় চোখে পড়ল ধরসাহেবের।

শস্যক্ষেতের পর ঘাস জমি। লম্বা লম্বা ঘাস ঠেলে একটু এগোতেই ফিস ফিস করে দাঁড়াতে বলল আতান। ধরসাহেব পিঠের ব্যাগে হাত বুলিয়ে নিলেন, গুপ্ত গুহার চাবি তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে রোঙ্গো-রোঙ্গো পুস্তকের পাণ্ডুলিপি।

টর্চ নিভিয়ে দিতে হল ধরসাহেবকে। বাঁ দিকে পঞ্চাশ গজ হেঁটে গেল সমুদ্রবিলাসী আতান। লম্বা ঘাসের মধ্যে দাঁড়াস বাকী সবার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। অনুচ্চ কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে পলিনেশিয়ান ভাষায় স্তবগান করল রগচটা আকু-আকুর। কারও অমঙ্গল যেন না হয়—হে আকু-আকু, সদয় হও তুমি।

হেঁট হয়ে তু-হাতে বালি সরিয়ে একটা কলাপাতা চাপা উনুন বার করল সমুদ্রবিলাসী আতান। উনুনের ওপর তিনটে আলু সমেত একটা সেঁকা মুরগীর তোফা গন্ধে জিভে জল এসে গেল ধরসাহেবের। এ হেন সুবাসে আকু আকু তৃপ্ত হবে, এ-আর আশ্চর্য কী! পিসীবুড়ির কাণ্ড নিঃসন্দেহে। সকাল বেলা এসে মুরগীর মাংস রেঁধে রেখে গেছে।

হাঁটু পেতে বসে ঈস্টার আয়ল্যাণ্ড মন্ত্র উচ্চারণ করলেন সবাই গলা মিলিয়ে—'হেকাই তে তুমু পারে হায়োঙ্গা তাকাপু হানৌ ঈপি কাই নর উয়েগো।'

সবচেয়ে মজার কথা, তুর্বোধ্য এই মন্ত্রের মানে কিন্তু তিন লম্বকর্ণই জানে না বললেই চলে। ভারতবর্ষের সংস্কৃত মন্ত্রের মত আর কি। মানে না জেনেই উচ্চারণ করতে হয় পালাপার্বনে।

মানেটা অবশ্য পরে উদ্ধার করেছিলেন ধরসাহেব—হে আকু-আকু, নরওয়ের এই লম্বকর্ণদের মানা শক্তি দাও—যাতে বিনা বাধায় গুপ্ত গুহায়

প্রবেশ করতে পারে।

এরপর মুরগীর ল্যাজের দিক থেকে এক চিমটে ভেঙে নিয়ে মুখে পুরতে হল থরসাহেবকে। অহো! কি তোফা রান্না! আরও খেতে ইচ্ছে গেলেও সাহস হল না। মুরগীর হাড়টাও মুখ থেকে ফেলতে পারলেন না—পাছে অকল্যাণ হয়, এই ভয়ে।

তারপর অবশ্য আতান বললে, মুখের হাড় এবার ফেলে দেওয়া যেতে পারে। আকু-আকু আনন্দে আটখানা হয়েছে। কাজেই বাকী মাংস পেটে চালান করা যাক।

ঠিক এমনি সময়ে কোত্থেকে উড়ে এল একটা সবুজ জোনাকি-মাছি। ভন্ ভন্ করে মাংসের ওপর চকি পাক দিতেই লাফিয়ে উঠল আতান—কী সৌভাগ্য! আকু-আকু নিজেই গান ধরেছে!

মাংস ফুরোলো। আলু তিনটে ভেঙে দু-টুকরো করে নিয়ে খেল দু-জনে। পশ্চিম দিকে পনেরো পা গিয়ে থরসাহেবকে চাবি বার করতে হুকুম দিল আতান। পায়ের কাছে বালি আর ঘাস চাপা অগুন্তি ছোট ছোট পাথরের দিকে আঙুল নামিয়ে বললে—'বলুন চাবিকে গুহার দরজা খুলে দিতে।'

উৎকণ্ঠায় তখন অবস্থা কাহিল হয়ে এসেছে থরসাহেবের। ধারে কাছে কুকুর ঘরের উপযুক্তও পাথর নেই—গুহার দরজা খুলতে বলেন কি করে?

বললেন—'আমি বলতে পারব না। পরের বাড়ীতে ঢোকবার হুকুম আমি দেব না।'

কপাল ভাল, তাই আতান নিজেই চাবিকে হুকুম দিতে রাজী হল। পায়ের কাছে ছোট একটা পাথরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল থরসাহেবের। এরকম পাথর এ তল্লাটে লাখে লাখে পড়ে আছে। একই রকম বালি আর খড় রয়েছে প্রতিটি পাথরের ওপর।

বিশেষ এই পাথরটাকেই বজ্রকণ্ঠে হুকুম দিল আতান—'খোলো দ্বার গুহার!'

অনেকটা আলিবাবার চিচিং ফাঁক মন্ত্র যেন!

বেকুবের মত চাবি নামক দাঁতবার করা মুণ্ড হাতে হেঁট হয়ে আতানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মন্ত্র পড়লেন থরসাহেব—'মাতাকি ইতে আনা কাহাতা মাই।'

হাত থেকে মুণ্ডটা নিয়ে নতুন হুকুম দিল আতান—'নেমে পড়ুন!'

বালি আর খড় সরালেন থরসাহেব। চায়ের ট্রের মত ছোট পাথরটায় চাপ দিতেই ঘুরে গেল। আতানের নির্দেশ মত পা ঝুলিয়ে দিলেন

আগে। কিন্তু পা ঠেকল না মেঝেতে।

সর্বনাশ! কত গভীর গুহা? পা ভাঙবেন নাকি লাফাতে গিয়ে?

তিরিক্ষে মেজাজে কিন্তু লাফাতেই নির্দেশ দিল আতান। যা থাকে কপালে বলে হাত ছেড়ে দিলেন থরসাহেব।

থুপ করে এসে পড়লেন নরম একটা বস্তুর ওপর।

টর্চ জ্বাললেন। পায়ের তলায় নলখাগড়ার গদীর মত মত মাদুর। মাদুরের ওপর দুটো চকচকে নরকরোটি—দাঁত খিঁচিয়ে ভেংচি কাটছে থরসাহেবকে।

গুহার পেছন দিকে নিরেট দেওয়াল। বাঁদিকে একটা সুড়ঙ্গ—জমাট লাভার মধ্যে সঙ্কীর্ণ একটা পথ। মাদুরের ওপর সাজানো সারি সারি বিদঘুটে মূর্তি যেন নিঃশব্দে হেসে উঠল কিংকর্তব্যবিমূঢ় থরসাহেবকে দেখে।

গুহার ছাদটা কৃত্রিম। আলগা পাথর বসিয়ে নির্মিত। ঢোকবার পথে ছোট্ট ঐ পাথর। মুণ্ডটা নামিয়ে দিল আতান ফুটো দিয়ে। তারপর নিজেও এসে নামল থরসাহেবের পাশে। মুণ্ডটা সসম্ভ্রমে রাখল নরকরোটি দুটোর পাশে। বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানিয়ে বললে বিড়বিড় করে—'হে আকু-আকু অপদেবতা, সবার শুভ হোক--সবার মঙ্গল করো।'

গুহার অভিভাবক এবং প্রহরী এরা। এদের ভজনা না করে গুহায় প্রবেশ নাকি মৃত্যুকে ডেকে আনতে পারে।

সুড়ঙ্গপথে আলো দেখিয়ে বললে—'সিনর, এ সবই আপনার! যা খুশী নিয়ে যান—শুধু ঐ চাবিটা বাদে। ওর ঠাঁই এখানে—এখানেই থাকবে।'

সারি সারি ভাস্কর্য দেখে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল থরসাহেবের। বিশ্বের কোনো মিউজিয়ামে যা নেই তা রয়েছে এখানে। রয়েছে বিদঘুটে দানো-মূর্তি, পশু আর পাখীর অনুকরণে অর্ধ-পশু অর্ধ-নর মূর্তি। রয়েছে সাপ মাছ পাখী এবং অমেরুদণ্ডী সদৃশ অকল্পনীয় মূর্তি। কয়েক গজ দূরেই গুহার শেষ। এখানে পেছনে হাত রেখে দাঁড়িয়ে একজন পাখী-মানব। রয়েছে বেড়ালের মত একটা পশুকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন পাখী-মানুষের মূর্তি। এত জিনিস রয়েছে যে যে কোনো সংগ্রাহকের রক্ত নাচিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। অমূল্য সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে ভূগর্ভের ছোট এই গুপ্ত গুহায়। খড় পাতা রয়েছে মেঝেতে। টাটকা খড়। দুটি মূর্তিও ভিজে। পিসী বুড়ির কাণ্ড। সকালে এসেছিল। সাফ সুতরো করে গেছে।

বাকী চারজনেও নেমেছে গুহায়। চক্ষুস্থির প্রত্যেকেরই। আতান এখন নিরুদ্বেগ। নিশ্চিন্ত। কাঁধ থেকে যেন বিরাট বোঝা নেমে গেছে।

এ-গুহার জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আজ থেকে থরসাহেবের—আর তার কোনো ভাবনা নেই।

তাই বললে ফুভিসে—'নিয়ে যান যা পারেন কার্ডবোর্ডের বাক্সয় পুরে। আদার, আজ থেকে এ সমস্তই আপনার।'

রাত বারোটায় গুহা নেমেছিলেন থরসাহেব, উঠলেন রাত দুটোয়। সব জিনিস আনা গেল না। পরের দিন আবার আসতে হবে। নিঃশব্দে সবাই ফিরে এলেন দ্বীপে। তাঁবুতে এসে সে-রাতে কারো ভাল ঘুম হল না।

খবরটা কিন্তু ছড়িয়ে গেল নেটিভদের মধ্যে।

পরের দিন আতানের গুহায় যাওয়ার জন্যে তোড়জোড় করছেন থরসাহেব, এমন সময়ে ঘুর ঘুর করতে দেখা গেল ল্যাজারাসকে।

সিনর কোনটাইকিকে সে নিজের গুহা দেখাতে চায়।

কিন্তু রাত্রে তার গুহায় যাওয়া ঠিক হবে না। কদিন আগে এই ল্যাজারাসই একটা পেঙ্গুইনের আর একটা কাল্পনিক পক্ষীর মূর্তি এনে থরসাহেবকে দেখিয়ে বলেছিল কিভাবে প্রাণে বেঁচে গেছে সে গুপ্ত গুহায় ঢুকতে গিয়ে। পাহাড়ের ওপর থেকে খাদে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে।

পেঙ্গুইনটা দেখে কিন্তু তাজ্জব বনে গেছিলেন থরসাহেব। মেরু অঞ্চল আর গ্যালাপাগোস আয়ল্যাণ্ড ছাড়া পেঙ্গুইন আর কোথাও দেখা যায় না। ঈস্টার দ্বীপের মানুষ পেঙ্গুইন কল্পনা করে কি ভাবে?

সেই ল্যাজারাসই এসে নেমন্তন্ন করল থরসাহেবকে বিপদসংকুল গুপ্ত-গুহায়।

থরসাহেব কথা দিলেন যাবেন—কিন্তু আজ নয়, পরের দিন।

নিশ্চিন্ত হয়ে বিদায় নিল ল্যাজারাস। সেই দিনই সকালে থরসাহেবকে জেরা করে সে জেনে গেছে আতানের গুহায় ঢোকবার পরেও কোনো অমঙ্গল ঘটে নি তাঁর অথবা দলের অন্য কারোর। 'গুড়লাক' নিঃসন্দেহে।

পরের দিন সাত সকালেই এসে একটা মুরগী চাইল ল্যাজারাস। মুরগী ধরে দিল স্টুয়ার্ড। সাদা মুরগী। আহ্লাদে এক গাল হেসে ল্যাজারাস বললে—'গুড়লাক! মুরগীর রঙ সাদা দেখছেন না?'

থরসাহেব আঁচ করলেন মুরগী নিয়ে কি করতে চলেছে ল্যাজারাস। আকু-আকুর মুড়ি ঠাণ্ডা করা দরকার আগে—তারপর সেই মাংসে ভুঁড়ি ঠাণ্ডা হবে নরলোকের কিছু মানুষের।

তার পরের দিন সকালবেলা এল ল্যাজারাস। সমুদ্র তখন উত্তাল। জাহাজে গেলেন থরসাহেব। ল্যাজারাসও গেল সঙ্গে। নামল খোলের

যখো। দুটো বস্ত্র খণ্ড আর যে কোনো একটা জিনিস চাই তার। গুহার সব পাথর বার করে জিনিসগুলো রেখে দেবে তার বদলে।

দুটো কাপড় আর একটা কাঁচি নিল ল্যাজারাস। কাপড় দুটো নিঃসন্দেহে দুই বোনের জন্যে—কাঁচিটা আকু-আকুর জন্যে।

এদের মতলব বোঝা ভার! আতানের গুহা শূন্য হয়ে যাওয়ার পর থর-সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন—'কি করবে এখন শূন্য গুহা নিয়ে?'

ঝটিতি জবাব দিয়েছিল আতান—'রেখে দেবো—যুদ্ধ লাগলে কাজে কাজ দেবে।'

ল্যাজারাসও জিনিস রাখার নাম করে দখল রাখতে চায় গুহার!

আশ্চর্য গুহা-মোহ বটে! গিয়েও যাবার নয়!

যাই হোক, জাহাজ থেকে লঞ্চে নামলেন থরসাহেব ল্যাজারাসকে নিয়ে। খাড়াই উপকূল ঘেঁসে দামাল সমুদ্রের ওপর নাচতে নাচতে চলল লঞ্চ। সমুদ্রের দুরন্তপনার জুৎসই ব্যাখ্যা হাজির করল ল্যাজারাস। গুপ্ত গুহার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে আকু-আকুই নাকি ক্ষেপিয়ে দেয় সমুদ্রকে।

একজায়গায় উপকূল থেকে প্রস্তর সমাকীর্ণ দুটো ঢাল নেমে গেছে সমুদ্রের বুকে। এইখানে নাকি একটা গুপ্ত গুহা আছে এক বুড়ির। ল্যাজারাসের ঠাকুমা মাছ ধরছিল নৌকায়। বুড়িকে দেখতে পায় জলের ধারে বসে মূর্তি ধোওয়া মোছা করছে। সাড়াশব্দ না দিয়ে এগিয়ে গেছিল ঠাকুমা। ফিরে এসে দেখে বুড়ি আর মূর্তি ধুচ্ছে না—মাছ ধরছে।

আরও একটু এগিয়ে দেখা গেল একটা পরিত্যক্ত উইণ্ডমিল। এককালে জনপদ ছিল এখানে। এখন খাঁ-খাঁ করছে। উপকূল এখানে অতিশয় বিপজ্জনক।

ল্যাজারাস বললে, এইখানেই তার তুতো ভাই অ্যালবার্তো আইকার একটা গুপ্ত-গুহা আছে। রোঙ্গো-রোঙ্গো ফলক আনতে গিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়েছিল বেচারী। ফলক নিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু আকু-আকু এমন পেছনে লেগেছিল যে ফলক ফিরিয়ে দিতে পথ পায়নি।

প্রায় একশগজ দীর্ঘ বিপজ্জনক এই উপকূলের কাছে এসেই সহসা আঁৎকে উঠল ল্যাজারাস।

চারটে মানুষ মূর্তি দেখা যাচ্ছে। নির্জন পরিত্যক্ত এই অঞ্চলে মানুষ কেন?

থরসাহেব এবং অনুচররা কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না।

ল্যাজারাস কিন্তু ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। দিনের বেলা তার চোখে ঈগলের দৃষ্টি আসে, রাতে পেচকের। সে যা দেখেছে। তা আর কারো চোখে পড়েনি এই কারণেই।

বিপজ্জনক অঞ্চলটা পেরিয়ে আসার পর সমুদ্র আরো উত্তাল হল। খাড়াই পাহাড়ের গায়ে অজস্র ছোটবড় চাতালের দিকে আঙুল তুলে ল্যাজারাস বললে—'ঐ আবার গুহা দেখতে পাচ্ছেন? খোলা গুহা—মুখে ঢাকা নেই। ঐ যে ঐ চাতালটা—ঠিক তার পেছনে।

কিন্তু কোথায় যে সেই চাতাল, আর কোথায় যে সেই গুহা মুখ—অনেক ঠাহর করেও থরসাহেব তা দেখতে পেলেন না। গড়ানে জমাট লাভার গায়ে লঞ্চ রাখতে গেলেই সলিল সমাধির ষোল আনা সম্ভাবনা রয়েছে বলে ডাঙায় নামাও সম্ভব নয়।

অগত্যা লঞ্চ নিয়ে আনাকেনায় ফিরে এলেন থরসাহেব। হাঙ্গা-ও-তেও উইগুমিলের কাছে দেখা গেল কালো ফুটকির মত চারজন অশ্বারোহীকে—উপত্যকার একদম শেষ প্রান্তে।

ল্যাজারাস কিন্তু ঠিক চিনেছে। ওদের একজন অ্যালবার্তোর ভাই। বাকী তিনজন নিশ্চয় তার ছেলে। কিন্তু এখানে কি মতলবে?

মুখ গোঁজ করে লঞ্চ থেকে নামল ল্যাজারাস। একটি কথাও না বলে এল তাঁবুতে।

লাঞ্চ-খেয়ে আবার সবাই রওনা হলেন গুহা অভিমুখে। আর লঞ্চে নয়—এবার ঘোড়ায় চেপে। উত্তর উপকূল বরাবর একটা সরু পায়ে চলা পথ গেছে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে। সুদূর অতীতে যে রাস্তা ছিল এখানে—তার অবশিষ্ট। প্রাগৈতিহাসিক এই পথের সঙ্গে কিন্তু আশ্চর্য সাদৃশ্য আবিষ্কার করলেন থরসাহেব পেরুর ইঙ্কা নির্মিত রাস্তায়।

এইখানে ঘোড়া থেকে নামল ল্যাজারাস। সামনেই চ্যাটালো পাথুরে—দেওয়ালে উৎকীর্ণ একটা কুণ্ডলী পাকানো সর্পমূর্তি।

আবার সাপের মূর্তি! প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো দ্বীপেই সাপের দর্শন পাওয়া যায় না। ঈস্টার দ্বীপের বিজন পর্বত গাত্রে ভাস্করের কল্পনায় নাগ মূর্তি এল কিভাবে?

এরপরেই পথের পাশে পড়ল একটা ভূপাতিত প্রস্তরমূর্তি। উত্তর অন্তরীপে নিয়ে যাওয়ার সময়ে পরিত্যক্ত হয়েছে। সাত মাইল দূরের রানো রারাকু থেকে দানবিক এই মূর্তিকে বহন করে আনার দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলেন থরসাহেব।

প্রাগৈতিহাসিক পথ ছেড়ে পাথুরে প্রান্তরে পা দিলেন। পথ ক্রমশঃ দুর্গম হচ্ছে—পাশে সমুদ্র ততোধিক উত্তাল।

ঠিক এই সময়ে ঝাঁকুনির চোটে ঘোড়ার স্টিরাপ ছিঁড়ে গেল খরসাহেবের। কিন্তু ল্যাজারাসকে দেখতে দিলেন না—পাছে অমঙ্গলের কল্পনায় আর না এগোয়।

গুপ্ত গুহার কাছাকাছি আসতেই অস্থিরতা বৃদ্ধি পেল ল্যাজারাসের। অন্যের আগে পৌঁছোনোর জন্যে সেকি ছটফটানি। মেজাজও সপ্তমে উঠেছে। নার্ভাস হয়ে গেলে মানুষ মাত্রেরই যা হয়।

প্রায় দু-শ গজ প্রায় ছুটে চলার পর পেল্লায় চ্যাটালো লাভা টাইয়ের সামনে এসে দাঁড়াল ল্যাজারাস। ঘোড়া বাঁধল পাথরে। ঝড়ের বেগে জামাপ্যান্ট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। পরনে রইল কেবল খাটো শর্ট।

খেঁকিয়ে বললে, খরসাহেবকেও প্রায় নগ্ন হতে হবে এইভাবে।

পড়েছ মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে—এই প্রবাদ বাক্য স্মরণ করে মুখ বুঁজে আদেশ পালন করলেন খরসাহেব।

এক গোছা দড়ি নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে ল্যাজারাস হুকুম ছাড়ল আবার—'মুরগীটা আনুন।'

কিন্তু মুরগী কোথায়? সঙ্গে তো মুরগী আসেনি।

জিজ্ঞেস করতে গেলেন ল্যাজারাসকে। অস্পষ্ট দাবড়ানি দিয়ে সে উধাও হল সামনে।

বিমূঢ় খরসাহেবের চোখে পড়ল ল্যাজারাসের ঘোড়ার পিঠে একটা থলি ঝুলছে। হাতে নিয়ে দেখলেন ভেতরে কলাপাতায় মোড়া একটা ছাল ছাড়ানো রান্না করা মুরগী।

থলি নিয়ে দৌড়োলেন খরসাহেব। খাড়াই পাহাড়ের কোণ ঘুরে অদৃশ্য হওয়ার আগে তিরিক্ষে মেজাজে আবার হুকুম ছেড়ে গেল ল্যাজারাস—মুরগীর ল্যাজ থেকে এক খাবলা যেন খেয়ে নেওয়া হয়।

অদৃশ্য হয়ে গেল গুপ্ত গুহার মালিক। নিরুপায় খরসাহেব সুবোধ বালকের মত ল্যাজের দিকের এক খাবলা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে সবে চিবোতে আরম্ভ করেছেন, এমন সময়ে ঝড়ের বেগে ফিরে এসে পেটের মাংস ছিঁড়ে নিয়ে কোঁৎ-কোঁৎ করে গিলে নিল ল্যাজারাস। কয়েকটা টুকরো রেখে দিল পাথরের ওপর।

হুটোপাটি কিন্তু কমল না ল্যাজারাসের। দ্রুত হাতে দড়ি বাঁধল এমন একটা পাথরে যা আলগা ভাবে ঝুলে রয়েছে একটা গাছের শেকড়ে।

দড়ির অপর প্রান্ত খাড়াই পাহাড় বেয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে ছাড়ল নয়া হুকুম—'দড়ি ধরে চলে আসুন।'

এই দড়ি ধরে কি যমালয়ে যাবেন থরসাহেব? এক হ্যাঁচকা টানেই তো আলগা পাথর ছিটকে যাবে—আছড়ে পড়বেন দেড়শ ফুট নিচে ফেনিল নীল সমুদ্রের লাভাস্তূপে।

প্রতিবাদ করতে গিয়ে ধমক খাওয়াই সার হল। দড়িটা ঝোলানো হয়েছে থরসাহেবের সুবিধের জন্যে—ল্যাজারাসের কস্মিনকালেও দড়ির দরকার হয় না।

সত্যিই দরকার হয় না। মানুষ টিকটিকির দড়ির দরকার হবে কেন? পাথরের গায়ে খাঁজ যা আছে, তাতে কোনোরকমে বুড়ো আঙুলের ডগা টিপে ধরে রাখা যায়—তেলতেলে পাহাড়ের গা হাতের চাপে ধরে রাখতে হয় কোনমতে। এহেন পাহাড়ি দেওয়াল দিয়ে সরসর করে দ্রুত-বেগে এঁকে বেঁকে নেমে যেতে লাগল ল্যাজারাস।

কিন্তু ঘেমে গেলেন থরসাহেব। পর্বতারোহী তিনি নন। বিশেষ করে এই পাহাড়ে এই ভাবে যাওয়ার কল্পনা কেবল দুঃস্বপ্নেই সম্ভব। ধারালো পাথরের ঘসায় গা হাত পা কেটে গেল, খাটো শর্ট ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই হল। এঁকেবেঁকে আচ্ছন্নের মত কিছুদূর নেমে ইষ্ট দেবতার নাম জপতে লাগলেন থরসাহেব। কি ভুলই করেছেন এসে। কিন্তু একা ফিরবেন কি করে? চুপচাপ দেওয়াল ধরে ঝুলে থাকাও তো সম্ভব নয়। হাওয়ার ঝাপটায় যে কোনো মুহূর্তে ঠিকরে পড়বেন বহু নিচের পর্বত আর সমুদ্রে।

দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ল্যাজারাস। প্রাণটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে থর-সাহেবও এগোলেন। ফুটখানেক চওড়া একটা চাতালের ওপর পিঠ দিয়ে দু হাত দু-পাশে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে ল্যাজারাস।

অদ্ভুত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল থরসাহেবের দিকে। তারপর একহাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—'হাতে হাত দিন।'

হাতে হাত দেবেন! সরু ঐ পাথরের খাঁজে কোনোমতে এসে তখন দাঁড়িয়েছেন থরসাহেব। দুজনেরই জায়গা হয়। ধারালো লাভাপাথরে পিঠ কেটে যাচ্ছে। দু হাত দু-পাশে ছড়ানো। দাঁতের ফাঁকে কাঁচি—যে কাঁচি ভেট দিয়ে তুষ্ট করতেই হবে গুহার আকু-আকুকে। হাত কি বাড়ানো যায়?

কিন্তু ল্যাজারাসের অদ্ভুত চাহনির সামনে ভয় পেয়ে গেলেন থরসাহেব। যা থাকে কপালে বলে ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন।

হাতখানা চেপে ধরল ল্যাজারাস। বললে আবেগরুদ্ধ গলায়—'কথা দিন

যা দেখবেন, তা দ্বীপের কাউকে বলবেন না।'

'কথা দিলাম।'

ল্যাজারাস হাত ধরেই রইল। হাত ধরে ধরে থরসাহেবকে নিয়ে চলল আরো বিপদসংকুল পাহাড়ের গা দিয়ে।

এই খানেই এক জায়গায় দড়ির প্রান্ত ঝুলছিল। সেদিকে তাকাবার মতও মানসিক অবস্থা তখন নেই থরসাহেবের।

এই খানে এসে পাহাড়ের গায়ে পিঠ চেপে ধরে সোল্লাসে বললে—'দেখতে পাচ্ছেন ?'

কিছুই দেখতে পেলেন না থরসাহেব। এক মানুষ নিচে অতি সংকীর্ণ একটা চাতাল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

খেঁকিয়ে উঠল ল্যাজারাস। বলল—'এইভাবে নামবেন।'

বলে যা দেখাল, সে প্রক্রিয়া নাচের স্কুলেই কেবল সম্ভব। প্রথমে একটা পা ঝুলিয়ে তারপর শরীরটাকে আস্তে মোচড় দিয়ে বুকটাকে পাহাড়ের গায়ে লাগিয়ে, শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় হাঁটু মুড়ে বসল নিচের চাতালে। পরক্ষণেই আর তাকে দেখা গেল না।

হাওয়ার ঝাপ্টায় শিউরে উঠলেন থরসাহেব।

একটু পরেই নিচের চাতালে একটা হাত দেখা গেল। একটা পাথরের মুণ্ড ধরে রয়েছে হাতটা। তার পাশেই বেরিয়ে এল ল্যাজারাসের মুণ্ড। বললে দাঁত খিঁচিয়ে—'দেখছেন কী ? নেমে আসুন।'

খৃষ্টের নাম স্মরণ করলেন থরসাহেব। একই প্রক্রিয়ায় কি করে যে নিচের চাতালে নামলেন, তা নিজেই জানেন না। এভাবে ছাড়া নামবার উপায়ও নেই।

তখনো গুহামুখ চোখে পড়ল না। চাতাল নেমে গেছে নিচের দিকে। ওপর থেকে দেখা যায় না। এইখানে গড়িয়ে যেতেই দেখলেন হাঁ হয়ে রয়েছে একটা রন্ধ্রমুখ।

মুণ্ডটা বাড়িয়ে ল্যাজারাস বললে—'এই নিন চাবি। নেমে যান।'

বিকটবদন মুণ্ডটা ছাগলে দাড়ি, ভাঁটা চক্ষু আর জন্তুর মত লম্বা ঘাড় আড়ষ্ট করে যেন নিঃশব্দে ব্যঙ্গ করে উঠল থরসাহেবকে।

প্রথমে হাত পরে মুণ্ড বাড়িয়ে দিতে হল মাঝের একটা শূন্য স্থান দিয়ে—বহু নিচে সমুদ্র। পা রইল চাতালে—হাত আর বুক অন্য একটা খাঁজে। ধড়টা শূন্যে।

এইভাবেই কিলবিল করে কোনমতে মাথা ঢোকালেন গুহায়। পা বেরিয়ে

রইল বাইরে।

অন্ধকারে চোখ সয়ে যাওয়ার পর টেনে আনলেন বাকী দেহটা।

শুকনো খটখটে গুহার কোথাও শ্যাওলার চিহ্ন নেই। মেঝেতে খড় বা নলখাগড়াও নেই। সামনেই দু-হাত মাথার ওপর তুলে মারমুখো ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে একটা প্রস্তর মূর্তি। পেছনের নিচু গহ্বরে পাশাপাশি শোয়ানো দুটো নর কংকাল। জীর্ণ হয়ে এসেছে অস্থি—কিন্তু শ্যাওলা ধরেনি।

পেছনের ফুটো দিয়ে আসা ম্লান আলোয় এর বেশী কিছু দেখতে পেলেন না থরসাহেব।

হঠাৎ ঠিক পাশেই শুনলেন কে যেন ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে।

প্রথমে চমকে উঠলেও পরক্ষণেই অবাক হলেন গুহার মধ্যে শব্দের খেলা লক্ষ্য করে। ল্যাজারাস গুহায় ঢুকছে। তার নিঃশ্বাসের শব্দ এত জোর হয়ে ধ্বনিত হচ্ছে ঠিক পাশে। পাথরের গায়ে তার চামড়া ঘসটে যাওয়ার আওয়াজও অদ্ভুতভাবে শোনা যাচ্ছে ঠিক পাশে। বিচিত্র এই গুহার ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির মত রোমাঞ্চকর খেলা দেখা যায় ভারতবর্ষের বিজাপুরের গোলগম্বুজেও।

ল্যাজারাস এসে দাঁড়াল পাশে। থরসাহেবের হাত থেকে চাবি নামক মুণ্ডটা নামিয়ে রাখল উদ্যতহস্ত মার মুখো স্ট্যাচুর পায়ের কাছে। এই মূর্তিই এই গুহার রক্ষক—এককালে রাজা ছিল এই দ্বীপের। এই গুহার নাম মোতু ভাভাকে; মানে পাখী-পাহাড়। জায়গাটার নাম ওমোহি।

হাড়ে হাড়ে বুঝলেন থরসাহেব, এ-গুহা প্রথম যে আবিষ্কার করে, পাখীর মতই একদা সে বিচরণ করছে পাহাড়ের গা বেয়ে। নাম তার হাতুই—ল্যাজারাসের মায়ের ঠাকুর্দা।

গুহার ভেতরে থাকে থাকে সাজানো অজস্র মূর্তি। বিদঘুটে, বিকট—ভয়াল সুন্দর। উদ্দাম কল্পনা রূপ পরিগ্রহ করেছে কুশলী ভাস্করের হাতে। কোনো মূর্তিটাই ধোয়ামোছা হয়নি। কারণ, এখানে ছত্রাক জন্মায় না—শুকনো বলে।

নৃপতি মূর্তি ছাড়া আর কোনো মূর্তিরই খবর রাখে না ল্যাজারাস।

একটু পরেই বেরিয়ে গেল সে, নিয়ে এল ফটোগ্রাফারকে। সে বেচারী ভেতরে ঢুকে নিঝুম হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর ঘোর কাটতেই লাফিয়ে উঠল সারি সারি গুহাসম্পদ দেখে।

আবার বেরিয়ে গেল ল্যাজারাস। এবার নিয়ে এল কাপড়ের থান দুটো। রাখল গুহার মধ্যে।

এবার ফেরার পালা। বাইরে তখন চাঁদ উঠছে। গা-ছমছমে পরিবেশে

রক্ত হিম হয়ে এল থরসাহেবের। রাতের পর রাত এই পাহাড়ের গা বেয়ে ভারী ভারী পাথর বার করে নিয়ে গেছে ল্যাজারাস। কিন্তু মাত্র কয়েক খানা মূর্তি আনতেই কালঘাম ছুটে গেল থরসাহেবের—ল্যাজারাস সাহায্য না করলে সম্ভবই হত না।

একে-একে সবাই উঠে এলেন। সারা গা হাত পা কেটে ফুটে রক্ত ঝরছে। শার্ট ফর্দা ফাঁই।

ল্যাজারাস কিন্তু স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এবার আগের মতই প্রশান্ত।

থরসাহেব জিজ্ঞেস করলেন—'কই হে, আকু আকু তোমার ঘাড় মটকে দিল না?'

'কেন দেবে? আমি যে আগে থেকে বলে এসেছিলাম।'

কি বলে এসেছিল ল্যাজারাস, তা আর বলল না।

কিন্তু ফেরবার পথে শুরু হল কাশি। অমঙ্গলের চিহ্ন।

'কোকোঙ্গো' ইনফ্লুয়েঞ্জা ছড়িয়ে পড়েছে দ্বীপে।

৯। পাতালপুরীর দেবতা ও দানবদের মাঝে

প্রেতচ্ছায়ার মতই কোকোঙ্গো' হানা দিল ঈস্টার দ্বীপের ঘরে ঘরে। আকু-আকুর চেয়েও সর্বত্রগামী এই প্রেতচ্ছায়া সম ব্যাধি দরজা বন্ধ করেও কেউ আটকে রাখতে পারল না। সে এসেছিল চুপি চুপি শিপ্টো জাহাজ থেকে—কিন্তু সাড়ম্বরে বিজয় কেতন উড়িয়ে গেল ঈস্টার দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। কোকোঙ্গো, কোকোঙ্গো, কোকোঙ্গো!

মেয়রকে পর্যন্ত রেহাই দিতে পারল না তার আকু-আকু। প্রথমদিন বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেরিয়ে ছিল বটে, তারপর খবর এল সে হাসপাতালে।

থরসাহেব গেলেন মেয়র সন্দর্শনে। হলঘর ভর্তি কোকোঙ্গো আক্রান্তদের কাৎরাতে শুনলেন এবং দেখলেন—কিন্তু মেয়রের টিকি দেখতে পেলেন না।

এমন সময়ে এক প্রান্ত থেকে হেঁকে উঠল এক বুড়ো—'হেই সিনর! এই যে আমি!'

মেয়রই বটে। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে! কোকোঙ্গো প্রেতের আক্রমণে গাল তুবড়ে গেছে, শরীর কংকালসার হয়েছে—চেনা দায়।

ডাক্তার বললে—'নিউমোনিয়া হয়েছিল। এখন বিপদমুক্ত।'

মেয়র বলে উঠল—'অনেক কাজ এখনো বাকী রয়েছে, সিনর। আপনি আমি দুজনে করব। কাল আমার নাতনি মারা গেল কোকোঙ্গোয় ভুগে। স্বর্গের পথ সে আমাকেই দেখিয়ে দেবে। কিন্তু এখনো অনেক কাজ বাকী, সিনর—অনেক বিরাট কাজ করব আমরা দুজনে।'

রোগে ভুগেই কি মেয়র এরকম অদ্ভুত কথাবার্তা শুরু করল? হাসিটাও কিরকম খাপছাড়া!

দিন কয়েক পরে কোকোঙ্গো পাততাড়ি গুটোলো দ্বীপ থেকে। মারা গেল কেবল ঐ একজনই—মেয়রের নাতনি।

কোকোঙ্গো কিন্তু কেশাগ্র স্পর্শ করল না মেয়রের ছোট ভাই আতানের। সুস্থ সবল দেহে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াল সে দ্বীপময়। থরসাহেবের কাছ থেকে পাওয়া বস্ত্র আর অর্থ গুপ্ত গুহায় লুকিয়ে রেখে সে তো এখন দ্বীপের সবচেয়ে ধনবান বললেই চলে।

মেয়র যে লুকিয়ে চুরিয়ে অনেক খোদাই পাথর এনে দিয়েছে থরসাহেবকে এ খবর কিন্তু জানা ছিল না আতানের। তাই ক্রমাগত উপদেশ দিয়ে গেল তাঁকে এবার বাদার গুহা থেকে জিনিসপত্র বার করার জন্যে। ল্যাজারা-সকেও কোকোঙ্গো ধরেছিল কিন্তু শোয়াতে পারেনি। তাঁবু থেকে ওষুধ খেয়ে দিন দু-তিন ঘুরে বেড়িয়ে ঝেড়ে ফেলল তা সুখ।

কোকোঙ্গো বিদেয় হওয়ার আগে থেকেই গ্রামে সাড়া পড়ে গেল অন্য একটা বিষয় নিয়ে।

মেয়রের তখনো কোকোঙ্গো হয়নি! একদিন নিজের ঘরে বসে রয়েছে খোদাই পাথর পরিবৃত অবস্থায়, দরজার সামনে হাজির হল গঞ্জালো—থর-সাহেবের দলের লোক, চিলি সরকারের মুখ্য প্রতিনিধি।

গঞ্জালোকে দেখেই একটা পাথরের গলদা চিংড়ি তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলেছিল মেয়র।

সন্দেহ হয় গঞ্জালোর—'পুরোনো মূর্তি মনে হচ্ছে?'

ঘোর প্রতিবাদ জানায় মেয়র—'মোটেই না। আমার হাতে তৈরী। একদম আনকোরা।'

গুহা থেকে পাথর বার করে এনে রেখেছে মেয়র, কিন্তু তা কাকপক্ষীকে জানতে দিতে চায় না বলেই অবতারণা করল মিথ্যার। সেই হল তার কাল। এক মিথ্যে থেকেই তো হাজার মিথ্যে আসে।

গঞ্জালো বেরিয়ে যেতেই মেয়র চলে এল থরসাহেবের কাছে। সব কথা খুলে বলার পর বললে—'সিনর, গঞ্জালো কিন্তু ভুল বুঝেছে। বুঝ্কেগে—

আপনি কিন্তু ভুল বুঝবেন না।'

মেয়র যেতে না যেতেই এসে হাজির হল গঞ্জালো। থরসাহেব কি জানেন মেয়রটা পয়লা নম্বরের জোচ্চোর? আনকোরা মূর্তিগুলোকে পুরোনো মূর্তি বলে চালাচ্ছে?

থরসাহেব বুঝিয়ে বললেন মেয়র কেন মিথ্যে বলেছে। বিষয়টা যেন চাপা থাকে।

মেয়র কিন্তু হুঁশিয়ার হয়ে গেল সেই থেকে। নিজে থেকেই সবাইকে বলে বেড়াতে লাগল, অদ্ভুত মূর্তি বানাচ্ছে সে নিজেই।

এরপরেই কোকোজ্বরে ধরল মেয়রকে। তখনো হাসপাতালে যায় নি—বাড়ীতে শয্যাশায়ী। গঞ্জালো একদিন গেল তাকে দেখতে। বাগানের ফটকের কাছে দেখা হল মেয়রের সম্বন্ধী রাইরোরোকো-র সঙ্গে। গায়ে পড়ে লোকটা হঠাৎ বড়াই করতে শুরু করে দিলে মেয়রের পাথর খোদাইয়ের আশ্চর্য ক্ষমতার। গলদা চিংড়ি, জন্তু জানোয়ার আর জাহাজ খোদাইয়ের বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি আছে নাকি তার ভগ্নীপতির কাছে। খোদাই করা পাথর জলে ধুয়ে মুছে কলাপাতায় মুড়ে অবিকল প্রাচীন পাথরের মত হাজির করতে পারে!

শুনে থ হয়ে গেল গঞ্জালো!

এরপর থেকেই গোয়েন্দাগিরি শুরু করল সে। কান খাড়া করে ঘুরতে লাগল দ্বীপবাসীদের আড্ডায়।

এইভাবেই একদিন এসতেভানের বাড়ীর সামনে দেখতে পেল একগাদা সদ্য কাটাই লাভাপাথরের চাঁই পড়ে রয়েছে। নিশ্চয় পাথর খোদাইয়ের উপাদান।

এর কিছু দিন আগেই এসতেভানের বউ গুহা থেকে খোদাই করা পাথর আনা বন্ধ করে দিয়েছিল আকু-আকুর ভয়ে।

গঞ্জালো এক হাত নিল এসতেভানের বাড়ীতে ঢুকে। এত বড় স্পর্ধা, থরসাহেবকে প্রবঞ্চনা করা হচ্ছে পুরোনো মূর্তির নাম করে নতুন মূর্তি চালান করে। ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!

এসতেভান আর তার বউ দু-দিন কিছু খেল না। শুয়ে শুয়ে কেঁদে সারা হল এতবড় অপবাদ শুনে!

খবরটা থরসাহেবের কাছে নিয়ে এল এনলিক।

থরসাহেব দৌড়ে গেলেন এসতেভানের কাছে। কাঁদতে কাঁদতে সস্ত্রীক এসতেভান বললে—'গঞ্জালো সাহেব যা নয় তাই বলে গেলেন। কিন্তু একটু

চোখ খুলে দেখলেই দেখতে পেতেন আমাদের প্রতিবেশী তার বাড়ীটাকে আরো বড় করে বানানোর জন্যে লাভা পাথর এনে রেখেছে—আমরা আনিনি মূর্তি গড়ার জন্যে।'

থরসাহেব বুঝিয়ে বুঝিয়ে স্বামীস্ত্রী'কে খেতে রাজী করালেন।

সেখান থেকে গেলেন মেয়রের বাড়ী। মুখ চুন করে সে বসে রয়েছে বিছানায়। পিসী তাহু তাহু ভীষণ রেগেছে। একটু আগেই এসেছিল। যা নয় ত'াই বলে গেল সিনর কোনটাইকিকে ঠকানোর জন্যে। গাঁশুদ্ধ লোক জেনে গেছে তার কীর্তি। সিনর কোনটাইকির মত উত্তম ব্যক্তি, যিনি কিনা তাহু-তাহুকে সিগারেট খাইয়েছেন, কালো কাপড় দিয়েছেন পোশাক তৈরীর জন্যে—তাঁকে ঠকানো? ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!

মেয়র বেচারীর হয়েছে তখন শাঁখের করাতের অবস্থা। তাহু-তাহুর অনুমতি না নিয়ে ও-বারোইনোর গুহা থেকে পাথর করে এনে দিয়েছে থর-সাহেবকে—সুতরাং সত্যি কথা বলা আর যায় না। মিথ্যে বলারও ক্ষমতা নেই। কিল খেয়ে তাই কিল হজম করতে হয়েছে এতক্ষণ। ঠাণ্ডা করার জন্য এক প্যাকেট সিগারেট দিতে গেছিল—ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল মাটিতে। তারপর অবশ্য নিয়ে গেছে উপহারটা সরাসরি সিনর কোনটাইকির কাছ থেকে তার জন্যেই এসেছে শোনবার পর।

মেয়র কিন্তু ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। পিসীবুড়ি রাগলে আর রক্ষে নেই। মুরগীর মাথা মাটিতে পুঁতে প্রাণটা বার করে দিতে পারে যে কোনো মুহূর্তে।

সারা গ্রামে হৈ-চৈ আরম্ভ হয়ে গেল পর-পর এতগুলো প্রবঞ্চনা কাহিনী অতিরঞ্জিতে হয়ে ছড়িয়ে পড়ায়। অনেকেই ছুটে এল থরসাহেবের কাছে। সান্ত্বনা দিল নানা ভাবে। দূর! দূর! দ্বীপে গুপ্ত গুহা কিস্সু নেই। যারা বলছে, সব মিথ্যুক। নতুন পাথর খোদাই করে পুরোনো বলে চালাচ্ছে। ভেড়া আর স্ট্যাচু ছাড়া ঈস্টার দ্বীপে আর কিছু আছে নাকি?

কেউ বললে, আছে বৈকি। কিন্তু তা ফাঁস করার নয়।

পরস্পর বিরোধী এই ধরনের বিস্তর কথাবার্তার পর উত্তেজনা থিতিয়ে এল দিন কয়েক পরে।

এরপরেই ফের এল গঞ্জালো নতুন খবর নিয়ে। তার জন্যেই গ্রাম এত গরম হয়েছে বলে সে দুঃখিত। প্রথম দিকে তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, জাল জোচ্চুরি পুরোদমে চলছে পাথর খোদাই নিয়ে। এখন কিন্তু ধারণা পাল-টেছে। গুপ্ত গুহা এ দ্বীপে আছে, লুকানো মূর্তিও সেখানে আছে।

এ বিশ্বাস জাগিয়েছে একটা বাচ্চা ছেলে। সিনর কোনটাইকির জন্যে হাদা-হেমু থেকে কিছু মূর্তি আনতে তাকে পাঠিয়েছিল এক বুড়ি। গুহায় ঢুকে সে একটা পাথরের মুরগী পায়—নিশ্চয় গুপ্ত গুহার চাবি। কিন্তু গুহার যেখানে নাকি তোতোরা দিয়ে প্যাক করা বেশ কিছু মূর্তি আছে, সেখানে সে ঢুকতে পারেনি গুহা ভেঙে পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়।

শুনেই কৌতূহল জাগ্রত হয় গঞ্জালো গোয়েন্দার। ছেলেটিকে নিয়ে সে যায় সেই গুহায়। গিয়ে দেখে তার আগেই চোরের ওপর বাটপারি করে গেছে আর একজন। ভাঙা গুহার ওপর দিকে একটা সংকীর্ণ খাঁজের মধ্যে দিয়ে গর্ত খুঁড়ে ভেতর দিকে ঢুকে তোতোরা দিয়ে প্যাকেট করা মূর্তি নিয়ে চম্পট দিয়েছে। গুহা এখন বিলকুল সাফ।

বুড়িটির মেয়ের নাম আনালোলা।

শুনেই মনে পড়ে গেল থরসাহেবের। গ্রামের বাইরে চারটে উল্টে পড়ে থাকা দাঁত আর থাবাওলা মুণ্ড নিয়ে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করেছিল তো এই বুড়িই। সঙ্গে ছিল তার বোন। মুণ্ডগুলো নাকি তাদের সম্পত্তি—নব-দম্পতির নয়। থরসাহেব মূর্তি সিধে করে চেহারাগুলো কেবল দেখে নিয়ে আবার উল্টো করে রেখে চলে এসেছিলেন। থ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছিল ঝগড়াটে বুড়ি।

আনালোলার সেই মা-য়ের নিজস্ব গুহা আছে। তোবা! তোবা! খবরটা অতীব মূল্যবান—কাজে লাগবে।

আনালোলা মেয়েটাকে ভালভাবেই চেনেন থরসাহেব। ভাইকিংয়ার ভেড়ার খোঁয়াড়ের তদারকির ভার তার হাতে। মেয়েটা এ যুগের মেয়ে। চুল কালো, চোখ বাদামী, নাক থ্যাবড়া, ঠোঁট মোটা। কিন্তু লেখাপড়া জানে। এ কালের হাওয়ায় সেকালের কুসংস্কার কেটে গেছে।

স্কীপার রোজ জল আনতে যায় জীপ নিয়ে। রোজই সে তাকে বলে—'মেয়র একটা পয়লা নম্বরের ঠগ, ক্যাপিতানো। সিনর কোনটাইকিকে বলবেন, ঈস্টার দ্বীপে গুপ্ত গুহা নেই—লুকোনো পাথরও নেই।'

এই আনালোলার সাথেই এক সন্ধ্যায় দেখা করতে গেলেন থরসাহেব জল আনবার অছিলায়। একটা ইউক্যালিপটাসের তলায় হাত ধরে নিয়ে গিয়ে কানে কানে বললেন—'মা কোথায়?'

'ঘুমোচ্ছে। আজকেই এসেছে আমাকে দেখতে।'

'মাকে বলবে, মুরগী ভাল জিনিস,তার চাইতেও ভাল হল কুকুর।'

হাঁ করে চেয়ে রইল আনালোলা।

চলে এলেন থরসাহেব।

পরের দিন নতুন খবর দিল আনালোলা। ড্যানিয়েল এসেছিল বাড়ীতে। মা-কে নিয়ে অন্য ঘরে বসে শলা পরামর্শ করছিল। আড়ি পেতে শুনেছে আনালোলা। ভাই-তারা-কাই-উয়া'তে একটা গুহায় যাবে দুজনে। কিন্তু আনালোলাকে সঙ্গে নিল সব ভেস্তে যাবে—পোড়াকপালে মেয়েটা তাই বাদ থাকবে নৈশ অভিযানে।

আরও দু রাত পরে খবর এল, মুখ চুন করে পর-পর দুরাত ফিরে এসেছে দুজনে। 'উমু' খুঁড়ে মুরগী সেকা পযন্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক ঐখানে অন্য লোক রয়েছে। হয় নিজের গুহায় গেছে, অথবা তাদের ওপর নজর রেখেছে। আর একটা রাত চেষ্টা করবে মা—যদি বাগড়া পড়ে, আর যাবে না।

অন্য লোকটা কে, দেখেছে কি মা?

দেখেছে বই কি। দ্বিতীয় রাতে স্পষ্ট দেখেছে রহস্যজনক লোকটাকে। তিমোতিও বুড়ো। নিশ্চয় আঁচ করছে আনালোলার মা গুহায় ঢুকে পাথর খোদাই পাচার করতে চায় সিনর কোনটাইকিকে—তাই পাহারা দিচ্ছে রাত জেগে।

খোঁজ নিলেন থরসাহেব। সত্যিই গত দু-রাত ভাই-তারা-কাই-উয়ার দিকে ধোঁয়া আর আগুনের চিহ্ন দেখা গেছে।

চালাকির জবাব চালাকি দিয়েই দেবেন ঠিক করলেন থরসাহেব।

জাহাজে সেদিন তোফা গলদা চিংড়ি রান্না হয়েছে। তিমোতিও-কে ডেকে আনলেন অন্য কাজের ছুতোয়। খেতে ডাকলেন কাজ শেষ হতেই। খাওয়ার পর যেই বিদায় নিতে যাচ্ছে, অমনি থরসাহেব তাকে বসিয়ে দিলেন ব্যারোমিটারের সামনে। পারার ওঠানামা যেন লক্ষ্য রাখে—আবহাওয়ার বেচাল দেখলেই যেন খবর দেয়। বলে, নিজে নেমে গেলেন জাহাজ থেকে। দেখে গেলেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যারোমিটারের দিকে চোখ রেখে বসে রয়েছে তিমোতিও।

পরের দিন সকালে জাহাজে এলেন। বিদায় নেওয়ার আগে তিমোতিও বললে, এখুনি তাকে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

'কোথায় আছে তোমার স্ত্রী?'

'গ্রামে.' বলে অদ্ভুতভাবে থরসাহেবের চোখ চোখে রেখে বললে—'গ্রামেই থাকে. কিন্তু কাল রাতে হয়ত ভাই-তারা-কাই-উয়া'তে রাত কাটিয়েছে।'

অদ্ভুত মন্তব্য।

'নাম কি তোমার স্ত্রী-র ?'

'ভিক্টোরিয়া আতান। নিজেকে যদিও তাহু-তাহু বলে জাহির করে। সত্যিই সে তাহু-তাহু—জাদুকরী।'

এরপরেই জল আনতে গিয়ে আনালোলার কাছ থেকে আশ্চর্য খবরটা নিয়ে এল স্কীপার।

গুহায় ঢোকবার আশা ত্যাগ করেছে তার মা। গত রাতেও গেছিল। তিমোতিও ছিল না—তার বদলে পাহারা দিয়েছে তার বুড়ি বউ।

কি কৌশলে যে তিমোতিও বউকে খবর পাঠিয়েছিল, এ রহস্য আর উদ্ধার করতে পারেন নি থরসাহেব। ঐ একটা রাতই বউ গিয়ে ঘাঁটি আগলেছে— বাকী সব কটা রাত তিমোতিও নিজে থেকেছে—থরসাহেবরা দ্বীপ ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত। ও অঞ্চলের ছুটো গুহা তাই অনাবিষ্কৃতই থেকে গেল—তিমোতিও আর আনালোলার মা উত্তরসূরী যদি না পায়— দু-দুটো গুপ্তগুহার প্রবেশ মুখের সন্ধান হারিয়ে যাবে চিরতরে।

ড্যানিয়েলের যমজ ভাইয়ের নাম অ্যালবার্তো। এই অ্যালবার্তোই দুটো রোঙ্গো-রোঙ্গো ফলক গ্রামে দেখিয়েই গুহায় রেখে এসেছিল সারারাত আকু-আকুর চিমটি সহ্য করতে না পেরে।

ড্যানিয়েলের সৎ-ভাইয়ের নাম এনলিক আইকা। তার ধমনীতে নাকি রাজরক্ত আছে। চোখমুখ চেহারায় সততা আর আভিজাত্য ঠিকরে পড়ে। মিথ্যে সে বলে না। এই জন্যেই তাঁবুর সবাই তাকে সমীহ করে।

এই রাজন্যটি একদিন তাঁবুতে এসে একটা বিনিময় প্রস্তাব পেশ করল। মূর্তি খাড়া করার জন্যে কয়েকটা পাইনের বরগা ছিল শিবিরে। তিনটে বরগা পিছু একটা বলদ সে দিতে চাইল। বাড়ী করবে এই বরগা দিয়ে।

থরসাহেব চাইলেন অন্য জিনিস। গুহার মূর্তি।

থতমত খেয়ে গেল রাজন্য। ধমনীতে যার রাজরক্ত বইছে, তার নিজস্ব গুহা আছে আঁচ করেই আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিলেন থরসাহেব। ঠিক লেগেছে।

আমতা আমতা করে সে বলে গেল—দাদাদের জিজ্ঞেস না করে কিছু বলা যাবে না।

এনলিককে কিন্তু গুহার প্রবেশপথ পর্যন্ত দেখায়নি তার কাকা সান্তিয়াগো। সতেরো বছর বয়সে একবারই গুহায় ঢোকে সে। এক বুড়ি তাকে দেখিয়ে দিয়েই মারা যায়—সান্তিয়াগোও আর ওদিক মাড়ায়নি। কাউকে নিয়েও যায়নি।

বাড়ীতে বসে কেবল নির্দেশ দিয়েছে নিজে যায়নি।

গুহার অংশীদার এই সান্তিয়াগো। তাকেও অনেক ভজিয়ে রাজী করালো এনলিকের বউ। বরগাগুলো যে তার চাই। নতুন বাড়ী করতে হবে না!

তিতিবিরক্ত হয়ে রাজী হল সান্তিয়াগো।

কিন্তু যে রাতে যাওয়ার কথা, সেই রাতে এল তার ছেলে। বাবার নাকি শরীর খারাপ।

খরসাহেব নিজে গেলেন তাকে আনতে। তাঁকে দেখেই জোর করে কাশতে লাগল সান্তিয়াগো—জ্বরের চিহ্নমাত্র নেই—অথচ গা গতরে নাকি ভীষণ ব্যথা।

কিন্তু নাছোড়বান্দা খরসাহেবের জেদে শেষ পর্যন্ত মুখ কালো করে জীপে এসে বসল সান্তিয়াগো। জীপ এল ভাইহু-তে। চাঁদের আলোয় হেঁটে যাওয়া হল কিছুটা পথ। খাড়াই পাহাড়ের ডগায় পৌঁছে দড়ির মই বার করল সান্তিয়াগো। অনেক নিচে রুপোলী ঢেউভঙ্গ দেখে মাথা ঘুরে গেল খরসাহেবের। দড়ির মইয়ের অবস্থাও শোচনীয়—ধাপগুলোতে বেশ ফাঁক-ফাঁক। এই চাঁদনি রাতে ঐ দড়ির মই বয়ে আবার নামতে হবে খাড়াই দেয়ালের মত পাহাড়ের গা বেয়ে।

সান্তিয়াগো ততক্ষণে দড়ির মই ঝুলিয়ে দিয়েছে। ছেলেকে বললে শুধু প্যান্ট পরে নেমে যেতে। তরতর করে নেমে গেল সে। মই আলগা হয়ে যেতেই হেঁট হয়ে খরসাহেব তাকে আর দেখতে পেলেন না। গুপ্ত গুহায় প্রবেশ করেছে নিশ্চয়।

তারপর নামতে গেলেন খরসাহেব। অমনি দেখলেন হন্তদন্ত হয়ে মই বেয়ে উঠে আসছে এনলিক—ধমনীতে যার বইছে রাজরক্ত।

ওপরে আসতেই শুধোলেন খরসাহেব—'কি দেখলে?'

'একটি সুড়ঙ্গ।'

'আর কি দেখলে?'

'দেখবার সময় পেলাম কোথায়? গুহা-ফুহা আমার পোষায় না।'

টিটকিরি দিল সান্তিয়াগো—'আকু-আকুর ভয়ে পালিয়ে এসেছিস বল না।'

ভয় পেয়ে গেল এনলিকের বউ। বিধবা হওয়ার সখ কোনো সধবারই থাকে না।

দড়ির মই বেয়ে অতিকষ্টে সার্কাস দেখাতে দেখাতে বারো ফুট নামলেন খরসাহেব। তারপর পা ঝুলতে লাগল শুন্যে—মই তলা পর্যন্ত পৌঁছায়নি।

দোল খেতে খেতে ঠিকরে গেলেন একটা গুহা মুখে।

মোমবাতি জালিয়ে বসেছিল সান্তিয়াগোর ছেলে। গুহা ভর্তি কেবল নরকঙ্কাল—তোতোরা দিয়ে প্যাক করা। ঝুরঝুরে হয়ে গেছে তোতোরা। পাশে পাশে রয়েছে কয়েকটা খোদাই পাথর ভর্তি তোতোরা প্যাকেট।

মোট দশটা পাথর পেলেন থরসাহেব।

আসবার সময়ে অবশ্য সান্তিয়াগো বলেছিল, এ গুহায় জিনিস লুকোয় না কেউ—মরতে আসে। মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে গুটি-গুটি ঢুকে বসে স্বেচ্ছা-মৃত্যু বরণ করে।

কিন্তু তাই যদি হবে তো তোতোরা দিয়ে প্যাক করা নরকংকাল রয়েছে কেন? নিশ্চয় মৃতদেহ দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে খাড়াই পাহাড়ের গা দিয়ে।

কিন্তু সে তো ভয়নাক ব্যাপার। থরসাহেবের একজন অনুচর পাঁজরার হাড় ভেঙে ফেলল সার্কাসের খেলা দেখাতে গিয়ে—ঘট করে হাড় ভেঙে এসে পড়ল গুহার মধ্যে।

তার পরেও এল অনেকে। ফটো তোলা হল। পাথরগুলো নেওয়া হল—শুধু একটা বাদে। সান্তিয়াগো পই-পই করে বলে দিয়েছিল—'খবরদার। গুহা একদম খালি করবেন না। যা হয় একটা মূর্তি রেখে আসবেন।'

তাই রইল শুধু একটা মূর্তি।

ফেরার পথে দ্বীপে বসে এনলিকের বউ যখন শুনল, গুহার আকু-আকু কারও ঘাড় মটকায়নি-- খামোকা ভয় পেয়ে ল্যাজ তুলে পালিয়ে এসেছে তার 'রাজন্য' সোয়ামী তখন চাঁচাছোলা গলায় এমন টিটিকিরি আরম্ভ করল যে এনলিক আর সইতে পারল না। কথা দিল জীবনে আর ভূতপ্রেতকে ডরাবে না। বাড়ী ফিরেই কাঠের বরগা দিয়ে নতুন বাড়ী তৈরী আরম্ভ করে দেবে।

প্রেত পিশাচদের সঙ্গে নাকি বেশী দহরম মহরম ছিল মেয়রের ছোট ভাই আতানের। সরল সাদাসিধে মানুষ। নিজের গুপ্ত-গুহা উজাড় করে দিয়েছিল সে থরসাহেবকে। দেওয়ার পর তার কপাল মন্দ তো হয়নি—বরং কপাল খুলে গেছিল বলেই তার বিশ্বাস। পাতালপুরীর কারবার শিকেয় তুলে দিয়ে সব ঝঞ্ঝাট ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে তার ফুর্তি এখন দেখে কে। আতানকে দ্বীপের প্রত্যেকেই ভালবাসে। বন্ধুর সংখ্যাও তার

অনেক। কার কোথায় গুহা আছে, এই খবর আদায় করা যেন তার জীবনের ব্রত হয়ে দাঁড়াল। এই করতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে থরসাহেবকে নিয়ে গিয়ে ফেলল ভিমরুলের চাকে।

আতানের শ্যালক অ্যানড্রেজ হাওয়া যে একটা গুহার স্বত্বাধিকারী, এ-সন্দেহ অনেকদিন ধরেই ছিল আতানের। সম্প্রতি সন্দেহটা দৃঢ়মূল হয়েছে।

থরসাহেবকে জীপের মধ্যে একদিন বললে—'মনে আছে আনড্রেজ হাওয়াকে? ভাঙা জারের টুকরো এনে দেখিয়েছিল আপনাকে? আস্ত জার-গুলো কিন্তু দেখিয়েছিল ফাদার সিবাসটিয়ানকে। গুহায় লুকিয়ে রেখেছে এই সব জার।'

তবে তো মুস্কিল! অ্যানড্রেজকে চটিয়ে দিয়েছেন তো থরসাহেব ভাঙা টুকরোগুলো জাল বলে। চালাকি করার জন্যে পুরস্কারও দেন নি। আহু মন্দির চত্বরে মাটি খোঁড়ার জায়গায় টুকরোগুলো এনে দেখিয়েছিল এই অ্যানড্রেজ। সেই থেকে মর্মান্তিক চটে রয়েছে থরসাহেবের ওপর।

এখন উপায়?

উপায় আছে বইকি। খোসামুদে চিঁড়ে ভেজে। অ্যানড্রেজকে কয়েক প্যাকেট সিগারেট আর কয়েকটা ডলার দেওয়া হোক। তাছাড়া আতান নিজে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাবে। আজ রাতেই থরসাহেব যদি আসেন সামনাসামনি কথাও বলিয়ে দেবে।

তাই করলেন থরসাহেব। সিগারেট আর ডলার দিলেন।

রাত্রে ডিনার পার্টি ছিল গভর্ণরের বাড়ী। খাওয়াদাওয়ার পর তাঁকে থরসাহেব জানিয়ে রাখলেন সেই রাতেই একটা গুপ্ত অভিযানে রওনা হতে হচ্ছে তাঁকে। কাজ হাসিল না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না—পরে বলবেন।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন গভর্ণর। হাঙ্গারোয়া গ্রামে অনেক অদ্ভুত গুজব শোনা যাচ্ছে। থরসাহেব যদি তার অবসান ঘটান, তাহলে উনি বেঁচে যান।

ঠিক রাত দুপুরে থরসাহেব প্রবেশ করলেন অ্যানড্রেজের ছোট্ট কুঁড়ে-ঘরে। আরক্ত চোখে উস্কখুস্ক চুল আর খোঁচাখোঁচা দাড়ি নিয়ে লাফিয়ে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করে 'ভাই' সম্বোধন করল আনড্রেজ। বুক বাজিয়ে সগর্বে আতান জানাল, বন্ধুত্ব অটুট রাখার জন্যে বাহবা দিতে হবে কিন্তু তার 'মানা' শক্তিকে।

এতদিনের শত্রু তো শেষকালে বন্ধু হয়ে গেল!

থরসাহেবের উপহার পেয়ে আনন্দের চোটে নাকি কেঁদে ফেলেছিল অ্যানড্রেুজ। জারের ভাঙা টুকরো নিয়ে মাথা গরম করে ফেলার পর থেকে তারও মন খারাপ ছিল অ্যাদ্দিন।

থরসাহেবকে আসল জার দেখাতে গেলেই গুপ্ত গুহার সন্ধান দিতে হবে বলে সে কিছু ভাঙা টুকরো খোঁড়াখুঁড়ির জায়গায় রেখে এসেছিল।

গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হল থরসাহেবের।

কিন্তু অ্যানড্রেুজ ফ্যাসাদে পড়েছে তার ছোট ভাইকে নিয়ে। বয়েসে ছোট হলেও গুহার প্রধান মালিক সে। আজ সন্ধ্যা'তেই তাকে বলতে গেছিল—থরসাহেবকে নিয়ে যাওয়া হোক গোপন গুহায়। কিন্তু রেগে আগুন হয়েছে কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ভয়ানক জেদী। গুহার 'চাবি' তার কাছেই থাকে। বাবা তাকেই রাখতে দিয়েছে। আবু-আকু তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। তাকে রাজী না করালে তো গুহায় নিয়ে যাওয়া যাবে না থরসাহেবকে।

আতান বললে—'তাহলে চলো দল বেঁধে যাই তোমার ভায়ার কাছে। সবার 'মানা' একসঙ্গে খাটিয়ে তাকে রাজী করাবোই।'

পার্টির পোশাক পালটে গাঢ় রঙের শার্ট আর শর্টস্ পরে নিলেন থর-সাহেব। সঙ্গেই এনেছিলেন। তারপর তিনজনে হেঁটে চললেন চাঁদের আলোয় দ্বীপের উত্তর দিকে। যেতে যেতে আতান আর অ্যানড্রেুজ বললে অ্যানড্রেুজের ছোট ভাই জুয়ান হাওয়া গুহার 'চাবি' থরসাহেবের হাতে দিয়ে ফাঁদে ফেলতে পারে তাঁকে। তিনি যেন না নেন। কিন্তু 'চাবি' যদি অ্যান-ড্রেুজের হাত মারফৎ আসে নিশ্চিন্ত মনে নিতে পারেন।

ঘোরপ্যাঁচের কি আর শেষ নেই? মনে মনে বললেন থরসাহেব।

গ্রামের বাইরে একটা বিজন অঞ্চলে পৌঁছোলেন তিন মূর্তি। দাঁড়ালেন একটা উঁচু প্রস্তর প্রাচীরের সামনে। প্রাচীরের পেছনে চন্দ্রালোকে আড়ষ্ট দেহে দাঁড়িয়ে সুউন্নত কয়েকটা কদলীবৃক্ষ—আড়ালে একটা প্রস্তর কুটির। জানলার বালাই নেই। জায়গাটাও থমথমে—মানুষজন কেউ থাকে বলে মনে হয় না। একটা পচা দড়ির মই উঠে গেছে প্রাচীরের গা বেয়ে কুটির পর্যন্ত—ধাপগুলো ভাঙা।

প্রথমে মই বেয়ে উঠে গেল আতান। দরজায় টোকা মারতেই পাল্লার ফাঁকে দেখা গেল টিমটিমে আলোর আভা।

মিনিট পাঁচেক পরে মুখ চুন করে নেমে এল সে। অ্যানড্রেজের ভাই বড় কঠিন ঠাঁই। একা সুবিধে করতে পারেনি—সম্মিলিত 'মানা' শক্তি প্রয়োগ

করতে হবে।

তিনজনে গেলেন কুটিরে। ছোট্ট ঘর। মাঝখানে সাদা রঙ করা একটা টেবিল ছাড়া কিছু নেই। পাশে দাঁড়িয়ে কঠোর প্রকৃতি মস্তান টাইপের দুই ব্যক্তি—চোখে মুখে বন্ধুত্বের লেশমাত্র নেই। একজনের বয়স তিরিশ—আরেকজনের চল্লিশের ধাপে কাছে।

গুড ইভনিং' বললেন থরসাহেব। কিন্তু পাল্টা শুভেচ্ছা এল না দুই মূর্তির তরফ থেকে। অ্যানড্রেজের ছোট ভাই সম্মোহনের ঘোরে অর্ধনিমীলিত চোখে চেয়ে রইল থরসাহেবের দিকে। চিবুকে তার কালো শক্ত দাড়ি—চোখ কালো পুঁতির মত কঠোর এবং মর্মভেদী।

সহসা বললে জড়িত গলায়—'সামাল আমার আকু-আকুকে। এ ঘর আকু আকুর ঘর।'

ঠাণ্ডা মাথায় বললেন থরসাহেব—'জানি। আমার আকু-আকু বলেছে।'

যেন শুনল না জুয়ান হাওয়া। এক পা এগিয়ে এসে থরসাহেবের সামনা সামনি দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে বললে সাপের মত হিসহিসিয়ে—'তাহলে দেখান আপনার আকু-আকুর শক্তি।'

রাগে গলা কাঁপছে জুয়ানের। কণ্ঠস্বরে ঠিকরে পড়ছে ঘৃণা, অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য। থরসাহেবের আকু আকুর মহিমা নিয়ে নিশ্চয় ফলাও করে বলেছে আতান আর অ্যানড্রেজ। আত্ম-সম্মোহনের ঘোরে জুয়ান তাই যেন অপ্রকৃতিস্থ।

থরসাহেবের জীবনে এ-এক ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ।

দু-পা এগিয়ে জুয়ানের বুকে বুক ঠেকিয়ে চোখে চোখ রাখলেন।

তারপর বললেন একই রকম চাপা নির্ঘোষে অপরিসীম অবজ্ঞায় স্বর বিকৃত করে—'শক্তি কি এখনো দেখাতে হবে? কি ছিল দ্বীপের চেহারা—কি হয়েছে এখন? কিভাবে ছিল দ্বীপের মানুষ—কিভাবে আছে এখন? তোমার আকু-আকুকে দাও না পাঠিয়ে ওরোঙ্গোর চূড়ায়, রানো রারাকুর তলায়, ভিনাকুর মাঠে, পাথর খাদের মাঝে, ঘুরে দেখে আসুক আনাকেনা আর হাঙ্গারোয়ার চেহারা। আগের চেয়ে কি এখন ভাল অবস্থা নয়? মাটির তলা থেকে অজানা মূর্তি আর স্থাপত্য কি উঠে আসেনি চোখের সামনে? কার শক্তিতে হচ্ছে এসব? আমার আকু-আকুর শক্তির প্রমাণ আর কত দিতে হবে?'

জবাব নেই স্তিমিত চোখের স্ফুলিঙ্গ যেন একটু নিভে এল। আকু-আকুর মহিমা স্পর্শ করেছে তার আচ্ছন্ন চেতনাকে। থরসাহেবকে আহ্বান

জানালো বেঞ্চিতে বসার জন্যে।

আত্মপ্রত্যয় ফের ফিরে এল আতানের। আবার বোঝাতে লাগল জুয়ানকে। গুহার 'চাবি' এবার দেওয়া হোক থরসাহেবকে। কিন্তু মুখের একটা পেশীও না কাঁপিয়ে লোহার পুতুলের মত বুকের ওপর দু-হাত ভাঁজ করে থরসাহেবের পাশে বসে রইল জুয়ান হাওয়া। সামনে দাঁড়িয়ে অন্য তিনজন কাকুতি মিনতি করল, একজন তো নতজানু হয়ে সামনে বসেই পড়ল। কিন্তু বেঞ্চি-সিংহাসনে অটল রইল মহারাজা। অটল তো থাকবেই! এ যে আকু-আকুর নিজের ঘর। সামনেই জাদুকরী তাহু-তাহুর নিবাস। পেছনে ঈস্টার দ্বীপের সবচেয়ে শক্তিশালী আহু মন্দিরের চত্বর। তার 'মানা' শক্তি কি কম?

অবশেষে মুখ খুললেন থরসাহেব। উন্মত্ত গোঁড়ামির জবাব তিনি জানেন। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ নীতি অনুসরণ করলেন।

বললেন, তাহিতির বিখ্যাত সর্দার তেরিরু তাঁর পালক-পিতা—অসাধারণ 'মানা' শক্তি তিনি পেয়েছেন তার কাছ থেকে। মারা যাওয়ার আগে পালক-পিতা তাঁকে দিয়ে গেছে রাজ উপাধি—তেরাই মাতিয়াতা, মানে, নীল আকাশ। দশবছর পরে রারোইয়া দ্বীপে জেলা থেকে অর্জন করেছেন আরো প্রবল 'মানা' ক্ষমতা—দ্বীপের রাজা তাঁকে ধর্ম পুত্র জ্ঞানে তারোয়া তিকারোয়া উপাধি দিয়েছে, মানে—তিকারোয়ার প্রেতাত্মা।

আর দরকার হল না। আত্মম্ভরিতার জবাব আত্মম্ভরিতা। উঠে দাঁড়াল অর্ধোন্মাদ জুয়ান। বন্ধুর দিকে ফিরে বললে—'তুমু! সাক্ষী থাকো।'

তুমু কোনো নাম নয়—উপাধি। এ উপাধির মানে এ যুগের ঈস্টার দ্বীপবাসীরা জানে না—থরসাহেব কিন্তু খবর রাখতেন। অলৌকিক অর্থ বহন করে এই শব্দ। ঈস্টার দ্বীপের প্রাচীন সমাজে সুপ্রচলিত ছিল শব্দটা—এখন অবলুপ্ত।

সেই তুমু রক্ত মাংসের চেহারা নিয়ে দাঁড়াল থরসাহেবের সামনে—হোয়া ফ্যামিলির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সে—প্রধান বিচারক।

এইবার শুরু হল প্রাণ নিয়ে টানাটানির প্রহসন পরীক্ষা।

আচমকা বুক টানটান করে হেঁকে উঠল জুয়ান—'গুহার চাবি দিলাম আপনাকে।' বলেই এমন বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে যে বেশ খানিকটা হেলে পড়ল পেছন দিকে।

নিশ্চুপ হয়ে চারজনে দাঁড়িয়ে রইলেন ঘরের মধ্যে।

ক্ষণপরেই ফিরে এল জুয়ান। বগলে একটা চ্যাপ্টা প্যাকেট, হাতে

একটা ভারী ঝুড়ি। ছটোই তোতোরা দিয়ে প্যাকেট করা।

চ্যাপ্টা প্যাকেট দিল দাদার হাতে—দাদা রাখল টেবিলে।

ড্রয়ান ঝুড়ি হাতে কটমট করে চেয়ে রইল থরসাহেবের পানে। তারপর ঝুড়িটাও দিল দাদার হাতে—দাদা দিল থরসাহেবের হাতে।

'নচ্ছ হাতে 'চাবি' না দিয়ে দাদার হাত দিয়ে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানালেন থরসাহেব।

কিন্তু মুখের বেয়াড়াভাব কমল না ড্রয়ানের। উদ্ধত ভঙ্গিমায় হাত রাখল টেবিলের প্যাকেটের ওপর।

বললে কড়া গলায়—'বলুন কি আছে প্যাকেটে—দেখান আপনার আকু-আকুর শক্তি।'

বাকী চারজন নিমেষহীন নয়নে চেয়ে রইল থরসাহেবের পানে।

আবার পরীক্ষা। আবার উৎকণ্ঠা।

উন্মাদের মত ভাবতে লাগলেন থরসাহেব। কি থাকতে পারে চ্যাপ্টা প্যাকেটে? টেবিলে রাখবার সময়েই লক্ষ্য করেছিলেন খুব ভারী নয় প্যাকেটটা—হাতের ঝুড়িটা কিন্তু বেশ ভারী। নিশ্চয় গুহার 'চাবি' পাথর আছে ঝুড়িতে। প্যাকেটে তাহলে কি আছে। ছটো জিনিসই এসেছে গুহা থেকে—তোতোরা প্যাকেট দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ওজনে হাল্কা চ্যাপ্টা প্যাকেট। ঈস্টার দ্বীপের রাজন্যবর্গ পালকের শিরস্ত্রাণ পড়ত। নাচের সময়ে মাথায় দিত। সেই জিনিস নয় তো?

আন্দাজে ঢিল ছুড়লেন থরসাহেব—'কন প্লুমা।' মানে পালক দিয়ে তৈরী—ইচ্ছে করেই সঠিক কিছু বললেন না।

'না।' চেঁচিয়ে উঠল ড্রয়ান। 'কিচ্ছু জানে না আপনার আকু-আকু। আবার জিজ্ঞেস করুন।'

শিকারী বেড়ালের মত গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এল ড্রয়ান। যে কোনো মুহূর্তে যেন টুঁটি লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সন্দেহ ঘনীভূত হল আতঙ্ক আর ক্রুর চোখে—কালো কুটিল সেই চাহনি দেখে রক্ত হিম হয়ে এল থরসাহেবের। বিজন এই অঞ্চলে তিনি নিহত হলে কাকপক্ষীও টের পাবে না। অথচ যদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলো দ্বীপের অসংখ্য অজানা গুহায় লুকিয়ে ফেলবে তাঁর লাশ—সবাই জানবে দুর্ঘটনায় হারিয়ে গেছেন তিনি।

একমাত্র আতান করুণ মিনতি মাখানো চোখে চেয়ে রইল তাঁর পানে। ঘেমে উঠেছে বেচারী।

আকু-আকুকে দিয়ে সঠিক জবাব দেওয়ার জন্যে নীরব মিনতি করছে থরসাহেবকে।

কি জবাব দেবেন থরসাহেব? কি আছে প্যাকেটে? পরিধানের কিছু নয় তো? বাকল বস্ত্র?

বললে—'পরবার জিনিস।'

'না। আবার জিজ্ঞেস করুন আকু আকুকে।'

তিনজনে ঘিরে দাঁড়াল থরসাহেবকে। ভাবভঙ্গী মোটেই সুবিধের নয়। পাগলের মত ছটো চিন্তা নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলেন থরসাহেব। আক্রান্ত হলে প্রাণ বাঁচানোর চিন্তা আর প্যাকেটের মধ্যে কি বস্তু আছে সেই চিন্তা।

'জিনিস। বললেন অবশেষে।

ঘোঁৎ করে অর্থহীন সম্মতি দিল জুয়ান। তিনজনেই কিন্তু বজ্রগর্ভ মেঘের মত ঘিরে রইল তাঁকে। হুকুম হোল — 'খুলুন প্যাকেট।'

প্যাকেট খুললেন তিনি। ভেতর থেকে বেরুলো খা বাঁধা একটা রোঙ্গো-রোঙ্গো পুস্তক। সাংকেতিক হাইরোগ্লাইফিক ছবি-কথাগুলো আঁকা কালো কালি দিয়ে। বয়সের ভারে আবছা। বইটা অমূল্য নিঃসন্দেহ।

হঠাৎ একটা কথা খেলে গেল থরসাহেবের মাথায়। স্প্যানিশ ভাষায় পালককে Pen বলা হয়। দমাস করে বইটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন বিষম অপমানাহত কণ্ঠে—'ঠিকই বলেছিল আমার আকু-আকু। কলম দিয়েই তো লেখা হয়েছে এই বই।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল তিন মূর্তির। এ দিকটা তো কেউ ভাবেনি। পিছু হটে গেল তিনজনেই।

সোল্লাসে ঝলমল করে উঠল আতান—'উফ্। কি অসীম শক্তি আপনার আকু আকুর।'

জুয়ানের চোখে ঘনীভূত হল এবার ঈর্ষা।

বললে—'দেখুন তবে, আমরা আকু-আকুকে দেখুন বইয়ের পাতায়।'

নিছক বই তো নয়, যেন একটা অত্যাশ্চর্য ছবির কেতাব। দ্রুত উল্টে গেল পাতার পর পাতা। একটা পাতা খুলে ধরল সামনে। পাতার বাঁদিকে রহস্যময় ছবির পর ছবি—কোনো ব্যাখ্যা নেই। ডান দিকে কুড়িটা ছবি চিহ্ন বারবার এঁকে পাশে পাশে তার অনুবাদ দেওয়া হয়েছে দ্বীপবাসীদের মাতৃ-ভাষায় দুর্বোধ্য হরফে। একদম তলায় একটা পৃথক পংক্তি—ফিকে হয়ে এসেছে কালি।

পৃথক পংক্তিটা দেখিয়েই বললে জুয়ান—'এই আমার আকু-আকু।'

খরসাহেব পড়ে গেলেন লাইনটা :

'কোকাভা খারো, কোকাভা তুরা, তে ই ওয়া ও তে আকু-আকু, একুয়া।'

'মানে বুঝলেন ?' সদম্ভে বললে জুয়ান—'পেছনটা যখন জীর্ণ হবে, সামনেটাও যখন জীর্ণ হবে—নতুন একটা বানিয়ে নিও—বইতে এই হল আমার আকু-আকুর নাম।'

গ্রন্থকারের বুদ্ধির তারিফ না করে পারলেন না খরসাহেব। ভারী সেয়ানা তো! বই জীর্ণ হয়ে নষ্ট হওয়ার আগেই যাতে আর একটা বানিয়ে নেওয়া হয় এই উপদেশটাকেই আকু আকু নামে চালান করেছে। ফলে নির্দেশটাকে অসম্মান করার সাহস কারো হবে না।

সায় দিলেন খরসাহেব—'খুবই শক্তিশালী বই।' ভেবে চিন্তেই 'শক্তিশালী' বিশেষণটা প্রয়োগ করলেন—কৌতূহলোদ্দীপক, চমৎকার, সুন্দর বলার চাইতে শক্তিশালী বললে জুয়ানের আকু-আকুকে সম্মান জানানোও হবে, জুয়ানও বিলক্ষণ খুশী হবে। বইয়ের অর্থ বোঝবার ক্ষমতা যার নেই, পুরো বইটাকে যে জাদু শক্তি বলে ধরে নিয়েছে, শক্তিশালী বই বললে বুক তার দশ হাত হবেই।

হলও তাই। রাগ জল হয়ে গেল জুয়ানের। সেই মুহূর্ত থেকে পরম বন্ধু হয়ে গেল খরসাহেবের। এমনকি ভাই সম্বোধনেও আপ্যায়িত হলেন তিনি।

কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করলেন না নিজেকে।

খরসাহেবের কাঁধে হাত রেখে হঠাৎ বললে জুয়ান—'আসুন এবার পরস্পরের রক্ত পান করা যাক।

আঁৎকে উঠলেন খরসাহেব। বলে কি উন্মাদটা। ভ্রাতৃসংঘে দীক্ষা নেওয়ার জন্য ঐ অর্ধ-বর্বরদের রুধির পান করতে হবে।

একটা বোতল কোত্থেকে নিয়ে এল জুয়ান। লাল তরল পদার্থ ঢালল পাঁচটা গেলাসে একটা গেলাসেই রইল বেশী পরিমাণে—বাকী গুলোতে সামান্য। বেশী যেটাতে, সেটাই এগিয়ে দেওয়া হল খরসাহেবকে।

নাকের কাছে এনে অলক্ষিতে ঘ্রাণ নিলেন খরসাহেব।

ও হরি! এ যে স্পিটো জাহাজের উৎকৃষ্ট সুরা।

নিঃশেষে পান করলেন খরসাহেব। স্নায়ু বিপর্যস্ত ছিল বলে সুরাপানে বেশ চাঙা বোধ করলেন।

'এবার আসুন সবার রক্ত মিশিয়ে পান করা যাক।'

আবার সুরা ঢালা হল গেলাসে। এবারেও সিংহের বখরা পেলেন খরসাহেব।

'আজ থেকে আপনি আমাদের বড্ড ই হয়ে গেলেন।' বলেই চোঁ-চোঁ করে গেলাস শেষ করল জুয়ান।

অর্থাৎ সেই মুহূর্তে গুহার চাবিতে সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে গেল খর-সাহেবের।

বোতল শূন্য করে উঠে পড়লেন খরসাহেব। তখন রাত তিনটে। রোঙ্গো-রোঙ্গো পুস্তক আর রূ,ডিটা নিয়ে এলেন নিচে। ঠিক হল পরের দিন তাঁর ক্যাম্পে খানা খেতে খেতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করবে নতুন ভাইরা।

পরের দিন নতুন ভাইরা এল তাঁবুতে। প্রথমে যাওয়া হল একটা টিলার মাথায়—রোঙ্গো রোঙ্গো পুস্তক বগলে করে সদর্প পদক্ষেপে টিলায় উঠে ফিসফিস করে পলিনেশিয়ান ভাষায় পূর্বপুরুষদের আহ্বান করল জুয়ান। তারপর ক্লিপের মত পাতা উল্টে গিয়ে আঙুল রাখল ওর আবু-আকু লাইনে। বললে খরসাহেবকে—'জোরে জোরে পড়ুন।'

পড়লেন খরসাহেব। শুনল পূর্বপুরুষরা। সাক্ষী রইল তিন নেটিভ। আইনসঙ্গত ভাবে গুহায় অধিকার জন্মাল তাঁর।

টিলা থেকে নেমে এসে তাঁবুতে খানা খাওয়ার আগে যেতে হল আতানের কুটিরে। তারপর তাঁবুতে এসে শুরু হল দ্বিপ্রাহরিক ভোজ।

খেতে খেতে ওদের মতই গাঢ় চাপা স্বরে আবু-আকু আলোচনা করলেন খরসাহেব। পরে তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন—'হ্যাগো, তুমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছো?'

টেবিলের ওপর ছিল নরওয়ের পতাকা। আচমকা সেটা খামচে ধরে জুয়ান বললে—'নিলাম এটা। এই তো আপনার আকু-আকুর শক্তি।'

সঙ্গে সঙ্গে পতাকাটা দান করলেন খরসাহেব। সেই সঙ্গে ফাউ দিলেন টেলিফোনে মোড়া কোনটাইকি ভেলার একটা মডেল—সেদিকেও নজর পড়েছিল জুয়ানের।

সুদৃঢ় হল ভ্রাতৃত্ব। সগর্বে কুচকাওয়াজ করে নতুন ভাইরা প্রস্থান করল যে-যার আবাসে।

মধ্য রাত পর্যন্ত ঘন্টা কয়েক ঘুমিয়ে নিলেন খরসাহেব। আবার বেরুলেন আর একটা গুহা পরিদর্শনে। এ-গুহা সুকৌশলে গুপ্ত রাখা হয়েছে পশ্চিম উপকূলের গিরি গাত্রে—কিন্তু পাহাড়ের তলা দিয়ে যাওয়ার পথটা দুর্গম নয় মোটেই। আবার মুরগীর পশ্চাৎ প্রদেশ থেকে মাংস

আহার করতে হল খরসাহেবকে, আবার হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হল সঙীন গুপ্ত গুহায়। এ-গুহার হদিশ দিয়েছে এনরিক। দেখবার মত সম্পদ রয়েছে সেখানে। সামনেই দুটো নরকরোটি। পেছনে নলখাগড়ার মাদুর সাজানো ফ্যানটাসটিক ভাস্কর্য। কুসংস্কার-উন্মত্ত জুয়ানের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে এই গুহাটায় কিন্তু অনেক নিশ্চিন্ত বোধ করলেন খরসাহেব।

পরের দিন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল রক্তসংগ্রহ পর্ব। দ্বীপবাসীদের কানের লতি থেকে রক্তের নমুনা নিয়ে, তাতে কেমিক্যাল মিশিয়ে টেস্ট টিউবে রেখে সংরক্ষিত হল রেফ্রিজারেটরে। এলাহি কাণ্ড দেখে ঘোর সন্দেহ হল মেয়রের. না জানি কি লাখটাকার জিনিস নিয়ে গিয়ে দ্বীপবাসীদের ঠকিয়ে যাচ্ছেন খরসাহেব।

এই সময়ে আবির্ভূত হল একজন বৃদ্ধ ঘোড়সওয়ার। 'সিনর, পিশাচ গুরু এল নুবো দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে। আপনার কপাল খুলে যাবে তাঁর কুটিরে গেলে। মনে রাখবেন রোববার মাঝ রাতে।'

আর কোনো কথা না বলে ঘোড়া ছুটিয়ে মিলিয়ে গেল রহস্যময় অশ্বারোহী।

পিশাচগুরুটি আবার কে? জুয়ান নয় তো? হ্যাঁ, সে। নিজেকে সে পিশাচসিদ্ধ বলেই মনে করে—থাকে জাদুকরী তাও-তাহুর বাড়ীর পাশে আকু আকুর সঙ্গে একঘরে। রোগ সারানোর তন্ত্রমন্ত্র নাকি তার কণ্ঠস্থ—অন্ততঃ ভাবসাব দেখে তাই মনে হয়।

রোববার নিজেই গেলেন খরসাহেব। গ্রামের আর কেউ এখন অচেনা নয়। সবাই তাঁকে চেনে—সবার অন্তর জয় করেছেন—ভালবাসা, পরিধেয় আর খাদ্য সামগ্রী দিয়ে।

মেয়রের বড় আনন্দ সেদিন। নাতি হয়েছে যে! এক মাথা লাল চুলো খোকার কি নাম দেবে ভেবেছ কি মেয়র?—জিজ্ঞেস করলেন পাদ্রী-সাহেব।

খর হেইয়ারডাল কোনটাইকি এল স্যালভাডর দু নিনোস আতান।'

হাল ছেড়ে দিলেন ফাদার। ছোট নাম কি হয় না?

শেষ পর্যন্ত ছোট নামই দেওয়া হল—স্যালভাডর আতান।

রাত নামল। মেয়রের বাড়ীর সামনে আলো নিভিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জীপে এসে উঠল দুটি ছায়া মূর্তি—পুরাতত্ত্ববিদ এড আর খরসাহেব। মেয়রের বাড়ীতেই ঘুমিয়ে নিয়েছেন দুজনে।

জীপ এল গ্রামের বাইরে। পা টিপে টিপে আতান সহ সবাই পৌঁছোলেন জীর্ণ দড়ির মই আর প্রাচীরের সামনে।

একা থরসাহেব গেলেন ওপরে। আতানের শেখানো মন্ত্রটা আউড়ে গেলেন বন্ধ দরজার সামনে—'পিশাচগুরু জুয়ান—খোলো দ্বার, এসেছে সৌভাগ্য।'

কিন্তু দরজা ফাঁক হল না। কোনো সাড়াও পাওয়া গেল না।

পর পর তিনবার একই কথা বললেন থরসাহেব।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল। জুয়ানের বউ মোমবাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে সামনে।

আরব সুন্দরীর মত মুখ। মেয়রের ছোট বোন সে।

ঘরে কেউ। টেবিল শূন্য।

নিশ্চয় গুহা অভিযানে বেরিয়েছে। জুয়ানের স্ত্রীর তাই ধারণা। মুরগী সেঁকা ছিল টেবিলে। এখন নেই। অতএব গুহা অভিযানেই গেছে স্বামী-দেবতা। এখন উপায়?

আতান দৌড়োলো অ্যানড্রেজকে ডেকে আনার জন্যে। চাঁদের আলোয় জুয়ানের বউয়ের সঙ্গে থানাই পানাই গল্প জুড়লেন থরসাহেব।

রাত বাড়তে থাকে—আতান আর ফেরে না।

রাত তিনটে নাগাদ উদভ্রান্তের মত ফিরল আতান। অ্যানড্রেজ আর জুয়ান গেছিল বোনের অনুমতি নিতে। কিন্তু চাবি দেওয়ার পর তার অনুমতি চাওয়া হচ্ছে বলে বোন মহাখাপ্পা হয়েছে। দুই ভাই তাকে বুঝিয়ে পারছে না। আতান সেখান থেকেই আসছে।

চারটে নাগাদ হাল ছেড়ে দিয়ে জীপ নিয়ে তাঁবুতে ফিরছেন থরসাহেব, আচমকা দেখা গেল উল্কা বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে জুয়ান। কিন্তু গ্রামের দিক থেকে নয়—উত্তর দিক থেকে।

জীপের সামনে এসেই হুকুম দিল—'জীপ নিয়ে পেছনে পেছনে আসুন।'

ছুটল জীপ ঘোড়ার পেছনে। হেডলাইট না জ্বালিয়ে চাঁদের আলোয় সেই নিশীথ অভিযানের অভিজ্ঞতা থরসাহেব কোনোদিন ভুলবেন না। কুষ্ঠকলোনী ছাড়িয়ে গিয়ে থামল ঘোড়া। জীপ থেকে নামলেন থরসাহেব।

বিশাল বিশাল লাভাপাথরের চাঁই পড়েছিল একদিকে। আচম্বিতে আড়াল থেকে ধেয়ে এল দুটি ছায়ামূর্তি—থরসাহেবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল চক্ষের নিমেষে!

কিছু বোঝবার আগেই থরসাহেব দেখলেন একটা পালকের শিরস্ত্রাণ পরানো হয়ে গেছে তাঁর মাথায়। ছায়ামূর্তি দুজন তুমু আর অ্যানড্রেজ।

হেঁকে বলল জুয়ান—'চলে আসুন বড়ভাই, ঐ ভাবেই আসুন—এইটাই নিয়ম।'

রেড ইণ্ডিয়ানদের পালক-মুকুটের মত বস্তু মাথায় চাপিয়ে চাঁদের আলোয় পিশাচ গুরুর পেছন পেছন ছুটে চললেন থরসাহেব! হাস্যকর দৃশ্য!

দাঁড়ালেন একটা লাভাস্তূপের সামনে। সরু সুড়ঙ্গ দিয়ে মাথা হেঁট করে ঢুকলেন ভেতরে। মেঝের পাথর সরিয়ে পেলেন গুহামুখ।

বেশ প্রশস্ত গুহা। সামনেই দুটো নর করোটি। একটা মানুষের মাথার—আর একটা পাথরের। পাথরের মূর্তির ঠোঁটটা বদখৎ ভাবে উঁচু—সেখানে গর্তের তৈলাধারে জ্বলছে প্রদীপ। শূন্যগর্ভ চাহনি মেলে প্রদীপের আলো দেখছে বিদঘুটে খুলিটা।

গুহার মাঝখানে একটা পাথরের মঞ্চ। গুহার দেওয়াল ঘিরেও পাথরের মঞ্চ। মাঝখানের মঞ্চে লাল নলখাগড়ার মাদুর পাতা। কিনারার মঞ্চে হলুদ নলখাগড়ার মাদুর পাতা। দুটো মঞ্চেই সারি সারি সাজানো বিস্ময়কর পাথর খোদাই। কিছু অলীক—স্বপ্নলোকের কল্পনায় সৃষ্টি। কিছু এই পৃথিবীরই বিভিন্ন প্রাণী এবং বস্তুর নকল। কিন্তু সবকিছুর মধ্যেই অসামান্য দক্ষতার ছাপ।

একটা নলখাগড়ার প্যাকেট সামনে রেখে দরাজ গলায় হুকুম দিল পিশাচ-গুরু—'খুলে দেখুন বড়ভাই।'

খুললেন থরসাহেব। চক্ষুস্থির হয়ে গেল।

অপূর্ব কারুকাজ সমন্বিত দুটো জার। যে জারের টুকরো নিয়ে অ্যানড্রেজের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য—এই সেই জার।

সগর্বে বললে ভুমু—'আরেকটা গুহায় এমনি জার আরো আছে। আপনি ফিরে এলে পাবেন। এ জার আমাদের পূর্বপুরুষদের জন্যে রেখে দেওয়া হয়েছে—তাঁরা জল খাবেন এ থেকে।'

জারের মধ্যে অবশ্য জলের চিহ্ন মাত্র নেই।

গুহার মধ্যে রোঙ্গো-রোঙ্গো পুস্তকটা নিয়ে এসেছিল পিশাচগুরু। আকু-আকু লাইনে থরসাহেবের আঙুল টিপে ধরে শপথ করিয়ে নিল অনেক রকমের।

জার দেখে কিন্তু হতভম্ব হয়ে গেলেন থরসাহেব। দুটো জারই কুমোরের চাকায় নির্মিত হয়নি—হাতে ঘুরিয়ে নির্মিত হয়েছে আমেরিকান ইণ্ডিয়ান কায়দায়। চিলিতে প্রাচীন মানুষরা এ ধরনের জার নির্মাণে পারদর্শী

ছিল। সেই জার ঈস্টার দ্বীপে এসেছে এবং সযত্নে লুকিয়ে রাখা হয়েছে গুহায় পূর্বপুরুষদের পুনর্ব্যবহারের জন্যে।

অন্য গুহার জার দেখবার সুযোগ আর হবে না। সে গুহার মালিক পিন্টো জাহাজে করে চিলি রওনা হয়েছে।

মুরগী ডাকল। ভোর হল। গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন থরসাহেব। ঘন্টা কয়েক ঘুমিয়ে নিলেন মেয়রের বাড়ী।

ঘুম ভাঙতেই এক গামলা জল নিয়ে এল মেয়র। থরসাহেব বললেন—'এবার আপনার পালা। ওয়োরোইনার গুহা কবে দেখাচ্ছেন?'

'মানিয়ে নিন, মানিয়ে নিন,' বিচিত্র হাসল মেয়র।

'কিন্তু আমি তো আর বেশীদিন থাকছি না এখানে।'

আবার সেই বিচিত্র হাসি। কোকোজ্বরে ভুগে ওঠার পর থেকে এমনি অদ্ভুত হাসি হাসতে আরম্ভ করেছে মেয়র। মাথাতেও ঘুরছে উদ্ভট প্ল্যান। বড়লোক হওয়ার বড় সখ তার। ঠাকুমাকে আর ডরায় না। গুহার সমস্ত সম্পদ বেচে দিয়ে কোটিপতি হবে। তারপর একটা স্টীমার কিনে মূল ভূখণ্ড থেকে টুরিস্ট এনে ইস্টার দ্বীপের চেহারা ফিরিয়ে দেবে। কিউরিও বেচে দ্বীপের সবাই বড়লোক হয়ে যাবে। ছেলেকে দিয়ে স্টীমারের ইঞ্জিন ঠিকঠাক রাখবে।

জীপ চালাতে যখন শিখে গেছে, আর ভাবনা কিসের।

বড় বড় কথাই সার হয়েছে। লম্বকর্ণর বিদঘুটে প্রস্তর মুণ্ডটা ছাড়া আর কিছুই এনে দেয়নি মেয়র—যে মুণ্ড রাখতে বলা হয়েছিল তাঁর বিছানার তলায়।

না, কোনোদিনই না। শুধু তাই নয়। হঠাৎ থরসাহেবের কাজকর্মও ছেড়ে দিয়েছিল সে। খুব নাকি ব্যস্ত—নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাচ্ছে না।

তার পরেই একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে বাগানের ফটকের কাছে দৌড়ে এসে থরসাহেবকে বলেছিল চাপা গলায়—কপাল ভাল তার। তাহু-তাহু বুড়ি গুহার চাবি তাকে দিতে চেয়েছে একটি সর্তে—তাহু-তাহুর ছেলে, মেয়র আর মেয়রের ছেলেকে সঙ্গে করে জাহাজে নিয়ে যেতে হবে।

স্কীপার ছিল সঙ্গে। কথা দিলেন থরসাহেব। আনন্দে লাফিয়ে উঠল মেয়র। ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে। তাহু-তাহুর ছেলে বসেছিল সেখানে। চোখ লাল—ষণ্ডামার্কা চেহারা। তার চেষ্টাতেই নাকি বুড়ি রাজী হয়েছে। গুহার চাবিও রাখা হল সামনে। একটা মজার শূওর ছানা। মাথার ফুটোয় নাকি মারাত্মক হাড়ের গুঁড়ো ছিল। বুড়ি তা সাফ করে

ফেলেছে। খরসাহেব যেন শূওর ছানাকে বিছানার তলায় রেখে দেন। মুরগী সেঁকে খবর দেবে মেয়র—তারপর যাওয়া যাবে গুপ্ত গুহায়।

গম্ভীর মুখে শূকর ছানা নিয়ে চলে এসেছিলেন খরসাহেব। বিছানার তলায় শূকর নন্দনকে রেখে দিয়েছিলেন দিনের পর দিন—হপ্তার পর হপ্তা, মেয়রের মুরগী সেঁকা আর শেষ হয়নি।

অন্য সব গুহা থেকে পাথর খোদাই এসে উঠেছিল জাহাজে, মেয়রের ছাড়া।

জলের গামলাটা তাই হাত থেকে নিয়ে বললেন খরসাহেব—'কিন্তু আর কদিন পরেই তো চলে যাচ্ছি জাহাজ নিয়ে এই হপ্তার শেষে।'

এত দিনে নিশ্চয় অনেক মুরগী সেঁকে ফেলেছিল মেয়র। তাই খরসাহেবের প্রস্থান সংবাদ শুনে ঠিক করে ফেললে, তার আগেই এক রাতে গুহায় ঢুকতে হবে। সঙ্গে যাবে ফটোগ্রাফার আর একজন পুরাতত্ত্ববিদ—আর কেউ না।

যে রাতে গুহায় ঢুকবার কথা, সেইদিন বিকেলে একটা ছেলে ছ-টা শ্যাওলায় ঢাকা মূর্তি বেচে গেল খরসাহেবকে। ঠাকুর্দার গুহা থেকে সরিয়ে এনেছে কাউকে না বলে—ঢোকবার পথ সে জানে। কাজেই খবরটা যেন পাঁচকান না হয়।

কিছুক্ষণ পরেই ঘোড়ায় করে এল পিশাচগুরু জুয়ান। মুখ গম্ভীর।

খরসাহেব যেন আর কারো মূর্তি না নেন। কেউ মূর্তি নিয়ে এলে যেন ফেরৎ দিয়ে দেন।

আকু-আকুর কাছে জুয়ান ঠিক টের পাবে এর অন্যথা হলে। সে ক্ষেত্রে অন্য গুহার জারগুলো আর দেখতে পাবেন না খরসাহেব। মন্দ ভাগ্যও অনিবার্য।

প্রায় মিনতির সুরে কথাগুলো বলে বিদায় হল জুয়ান। খরসাহেব বুঝলেন। জুয়ান এমন কিছু জেনে ফেলেছে যা ফাঁস করতে পারছে না। যাওয়ার সময়ে উপহার দিয়ে গেল দ্বিতীয় গুহা থেকে আনা একটা ভারী সুন্দর জাহাজের মডেল—গলুইতে বসে দুটি মূর্তি।

জুয়ান উধাও হতে না হতেই ঘোড়ায় করে এল এক তরুণ দম্পতি। সঙ্গে এনেছে থলি বোঝাই সতেরোটা ফ্যানটাসটিক মূর্তি।

জুয়ান যে বারণ করে গেছে আর কোনো মূর্তি নিতে! কে জানে বাইরে বসে নজর রেখেছে কিনা। জিনিসগুলো হাত ছাড়া করতেও রাজী নন

থরসাহেব। তাই বললেন—'আমার আকু-আকু নিষেধ করেছে দিন কয়েক যেন কারো মূর্তি না নিই। যে দিন জাহাজ ছাড়বে, সে দিন এসো।'

মুখ শুকিয়ে গেল তরুণ দম্পতির। কিন্তু কিছু উপহার হাতে পেতেই উজ্জ্বল মুখে বস্তা নিয়ে বিদায় হল ঘোড়ায় চেপে।

একি রহস্যের পর রহস্য সৃষ্টি হয়ে চলেছে ঈস্টার দ্বীপে? কোথাও যে একটা ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলেছে, তা আন্দাজ করতে পারলেন থরসাহেব—কিন্তু ধরতে পারলেন না ব্যাপারটা কী। মাথা চুলকে কিছুক্ষণ ভাববার চেষ্টা করে ফুঁ দিয়ে ল্যাম্প নিভিয়ে আশ্রয় নিলেন শয্যায়। রাত বারোটায় আবার তো যেতে হবে মেয়রের গুহায়।

শয্যায় গড়াতে না গড়াতেই এসে হাজির ক্যামেরাম্যান। জীপ দাঁড়িয়ে আছে—রওনা হওয়া যাক এবার।

জীপে একজন পুরাতত্ত্ববিদকে তুলে নিলেন থরসাহেব। তাকে নামিয়ে দিলেন জাহাজের মেটের আস্তানায়। একজন নেটিভ এসে খবর দিয়েছিল একটা লাল চুলো নরমুণ্ডের সন্ধান সে জানে। গুহায় আছে। কিন্তু হাত দিয়ে ছোঁবার সাহস তার কখনো হয়নি। সেখানে যেতে হলে সাঁতরে যেতে হবে—নৌকো গেলে হবে না।

সাঁতার কেটে গুহায় কেন, জাহান্নমে যেতেও প্রস্তুত ছিল মেট। পুরাতত্ত্ববিদকে নিয়ে সে যাবে মধ্যরাত্রে নরমুণ্ডের সন্ধানে। মামী মুণ্ড বলেই মনে হয়। নেটিভের বর্ণনা কিন্তু সেই রকমই।

সেই রাতেই সাঁতার কেটে একটা লাভা দ্বীপে উঠেছিল মেট। গুহার মধ্যে সন্ধান পেয়েছিল শুষ্ক শান্ত সেই নরমুণ্ডের। মামীমুণ্ডই বটে। চুলে হাত দিলে খসে পড়ে যায় এমনি অবস্থা। চামড়া সেঁটে বসে গেছে হাড়ের ওপর।

যাই হোক, মেটের আস্তানায় পুরাতত্ত্ববিদকে নামিয়ে দিয়ে তাহু-তাহুর কুটিরে পৌঁছোলেন থরসাহেব। মেয়রের দলবল এবং নিজের অনুচর নিয়ে মোট ছ-জন। যেতে না যেতেই গন্ধ পেলেন সেঁকামুরগীর। মাটির উনুনে তৈরীই ছিল। ল্যাজের দিক থেকে মাংস খেলেন থরসাহেব। নাটকীয় কায়দায় মুরগীর হাড় চারিদিকে আকু-আকুদের উদ্দেশে এমন ভাবে ছুঁড়তে লাগল মেয়র যেন কুকুর ভোজ করাচ্ছে। তারপর একপাশে সরে দাঁড়িয়ে সিগারেট শেষ করে এসে বললে—'এবার যাওয়া যাক।'

যেতে হল অনেকদূর। প্রায় মিনিট দশেকের পথ। উঁচু প্রাচীর পেরিয়ে আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করে পৌঁছোলো একটা প্রস্তর স্তূপের

সামনে। একটু ঠাহর করতেই বোঝা গেল মাঝখানের পাথর সম্প্রতি সরানো হয়েছে।

চাবি বার করতে হুকুম দিল মেয়র। থরসাহেব যেন নিজে 'চাবি' দিয়ে খুঁজে বার করেন গুহা মুখ। পথ পাওয়ার পর কিন্তু তিনবার হেঁকে বলতে হবে—'আমি নরওয়ের লম্বকর্ণ—খোলো দ্বার।'

অনেকটা 'চিচিং ফাঁক,' হাঁকের মত আর কি! পাথরের শূকর নন্দন হাতে নিয়ে নাটকীয় ভাবে সদ্য সরানো পাথরটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন থরসাহেব। তারপর যেন জাদুবলে পথ খুঁজে পেয়েছেন, এমন ভাব করে উল্টে দিলেন পাথরটা।

দেখলেন একটা খুব সরু রন্ধ্রপথ নেমে গেছে পাতালের দিকে। অতি কষ্টে ঘাড় হেঁট করে প্রথমে এগোলেন থরসাহেব। কিছুদূর যেতে না যেতেই খাঁই করে কে যেন ধাক্কা মারল তাঁকে।

কঠিন সংঘাতে ঠিকরে পড়লেন থরসাহেব। ধাক্কাটা লাগল এমন ভাবে যেন বদ্ধ গুহা থেকে বেগে কেউ তাঁকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে অন্ধকারে বিপত্তি ঘটিয়েছে।

পরক্ষণেই পপাতধরণীতল অবস্থাতেই দেখলেন কে তাঁকে ধাক্কা মেরেছে।

একটা শকুনি বা ঈগল জাতীয় শিকারী পক্ষী। প্রস্তরনির্মিত। বাঁকানো চঞ্চুতে আটকানো একটা নরমুণ্ড। গুহার ছাদ থেকে দড়ি বাঁধা অবস্থায় দোল খাচ্ছে প্রস্তর পক্ষী! অন্ধকারে যে আসবে তাকেই ধাক্কা মেরে ঠিকরে ফেলবে।

দড়িটা কিন্তু আনকোরা নতুন! প্রোরোরোইনার আমলের জীর্ণ দড়ি নয়!

টর্চের আলো ঘুরিয়ে মেঝেতে ফেললেন। নলখাগড়া মাদুরের ওপর চক্রাকারে সাজানো বিস্তর খোদাই করা পাথর। বৈচিত্র্যহীন। এরকম পাথর খোদাই এর আগেও ঢের হস্তগত করেছেন—শুধু একটা জাহাজের মডেল ছাড়া। হাইরোগ্লাইফিক ছবি-চিহ্ন খোদাই করা রয়েছে প্রতিটি পাথর খোদাইয়ে।

দৃষ্টি আকর্ষণ করল কেবল একটা গামলা। এগারোটা চুলের প্যাকেট রয়েছে তাতে। গাছের ছালের সরু সুতো দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে অগুন্তি গিঁট বাঁধা। লাল চুল থেকে আরম্ভ করে কালো চুল পর্যন্ত সবই আছে।

কিন্তু মানী চুলের মত শুষ্ক আর ন্যাড়মেড়ে নয় কোনোটাই। তাজা

সম্ভ কেটে আনা চুল।

নিমেষে চাপা সন্দেহটা সত্যে পরিণত হল। এই জন্যই গোড়া থেকে করেছেন খরসাহেব। প্রবঞ্চকের পাল্লায় পড়েছেন। মূর্তিগুলোও প্রাচীন নয়—নতুন তৈরী। শিকারী পক্ষীতে বাঁধা নতুন দড়ি দেখেই সন্দেহটা প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল।

আর দেরী করা যায় না। এই মুহূর্তে গুহা থেকে বেরিয়ে পড়া দরকার। প্রবঞ্চকের পাল্লায় পড়ে 'গুডলাক' খুইয়ে 'ব্যাডলাক' ডেকে আনবেন, এই ভয়েই পিশাচগুরু জুয়ান পই-পই করে তাঁকে পাথরের পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরতে মানা করে গিয়েছিল।

খরসাহেবের অনুচররা তখন অতি কষ্টে নামছে রন্ধ্রপথ বেয়ে। বেরোনোর পথ বন্ধ। চেঁচামেচি করে ঠেলা মেরে বার করতে গেলে ভয় পেয়ে বাইরের তিন নেটিভ পাথর গড়িয়ে এনে গুহামুখ বন্ধ করে দিতে পারে। দ্বীপের আর কেউ জানতেও পারবে না পাতাল পুরীর নিরন্ধ্র তমিস্রায় চিরতরে বন্দী হয়ে গেলেন সানুচর খরসাহেব।

তাই মুখ বুঁজে রইলেন তিনি। মেয়র নেমে এল সবশেষে। ঘামে ভিজে গেছে। বেশ নার্ভাস মনে হচ্ছে।

খরসাহেব বললেন—'বদ্ধ বাতাসে দম আটকে আসছে। চলুন, বেরিয়ে পড়ি।'

সাত তাড়াতাড়ি বললে মেয়র—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

আগে বেরোলো মেয়র। পেছনে খরসাহেব। একে-একে সবাই এসে দাঁড়াল জীপের সামনে। গম্ভীর মুখে একটি বাক্যব্যয়ও না করে জীপে উঠে বসলেন খরসাহেব। পাশে মেয়র—মুখে কথাটি নেই। গেটের সামনে তাকে সঙ্গীসহ নামিয়ে দিয়ে কিছুদূর এসে বললেন কি দেখে এসেছেন গুহায়। খেপে গেল পুরাতত্ত্ববিদ। সন্দেহটা তারও হয়েছে।

বললে—'তাহলে এখুনি গিয়ে পাকড়াও করুন। আজ রাতেই নিয়ে যাক আসল গুহায়। সময় দিলেই তো আবার একটা নকল গুহা সাজিয়ে ডেকে নিয়ে যাবে।'

যুক্তি মনে ধরল খরসাহেবের। ফিরে গেলেন মেয়রের বাড়ী। মেয়র তাঁকে দেখে কিরকম যেন হয়ে গেল। বসল টেবিলের পাশে—কিন্তু চেয়ে রইল দেয়ালের দিকে। কিছুতেই খরসাহেবের চোখে চোখ রাখতে পারল না।

সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন খরসাহেব, মেয়র ডন পেড্রো আতাবের

প্রবঞ্চনা তিনি ধরে ফেলেছেন।

কেঁদে ফেলল মেয়র। দৌড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল বিছানায়। ফের ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। ফের এসে আছাড় খেল বিছানায়। সে কী কান্না। তার অনামুখো ঐ খুড়তুতো ভাইটার কারসাজিতেই নাকি তাকে প্রবঞ্চক হতে হল আজকে।

থরসাহেব কান্নাকাটিতে ভুললেন না। আজ রাতেই তাঁকে ওরো-রোইনার আসল গুহায় নিয়ে যেতে হবে। যদি না নিয়ে যায় মেয়র, দুর্ভাগ্য এড়ানোর ক্ষমতা তার আকু-আকুরও নেই।

মেয়র কিন্তু তাতে রাজী নয়। ওরোরোইনার গুহার খোদাই পাথর এনে দেখাতে সে প্রস্তুত, কিন্তু গুহামুখ দেখাতে পারবেন না। অন্য গুপ্ত গুহাতেও নিয়ে যাবে আজ রাতেই—কিন্তু ওরোরোইনার গুপ্ত গুহায় নয়।

বেরিয়ে এলেন থরসাহেব।

সেই রাতেই মেয়র ছুটেছিল তার পুরাতত্ত্ববিদের কাছে। সেখানেও সুবিধে করতে না পেরে মুখ চুন করে ফিরে যায় বাড়ী ভোরের দিকে।

পরের দিন বিকেলের দিকে মেয়রের লালচুলো পুত্র এল থরসাহেবের কাছে। মুখ গম্ভীর। বাবা নাকি নাওয়া খাওয়া ছেড়ে কেঁদে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আসল গুপ্ত গুহার ঠিকানা এঁকে দেখিয়ে দিয়েছে ছেলেকে। থরসাহেব কি যাবেন ?

পুরাতত্ত্ববিদকে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন থরসাহেব।

কিন্তু সেখানেও মোতায়েন রয়েছে স্পাই। সেখানে সে যায়, দুজন নেটিভ ছায়ার মত লেগে থাকে পেছনে। অতিকষ্টে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছোলো সে। বাপের আঁকা ম্যাপ নিয়ে মেয়র-নন্দন হাজির ছিল আগে থেকেই। খাড়াই পাহাড়ের গা থেকে দড়ি ঝুলিয়ে নেমে গেল। তিন-তিনবার হন্যে হয়ে খোঁজবার পর পাহাড়ের গায়ে একটা ফাটল চোখে পড়ল বটে, কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারল না। সেখানে নামতে হলে দড়ি ধরে নামতে হবে ষাট ফুট—তিনশ ফুট নিচে লাভা পাথর সমাকীর্ণ সমুদ্র। পাথরের গায়ে ফাটলটা এত তফাতে যে পা দেওয়া যায় না—তবে দূর থেকে দেখে এল বেশ কিছু ধূলিধূসরিত মূর্তি সেখানে রয়েছে বটে। কোনো রকমে পা গলিয়ে একটা মূর্তি টেনে এনেছে এবং সেইটা নিয়েই উঠে এসেছে। মূর্তিটার নাক বাঁকানো। চিবুকে দাড়ি। নিঃসন্দেহে প্রাচীন মূর্তি।

পুরাতত্ত্ববিদও দেখে এল। তখন অন্ধকার হয়েছে। এর বেশী

সাহস হল না।

পরের দিন লাঠির মাথায় থলি বেঁধে লোক নামল দড়ি বেয়ে। কাটলের মধ্যে থেকে উদ্ধার করল একটার পর একটা মূর্তি। থলি বোঝাই হয়ে গেল খোদাই করা পাথরে। মোট ছাব্বিশটা। সবগুলোই প্রাচীন এবং ধুলোর পুরু স্তরে ঢাকা।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল কয়েকটা জলের জার। অনুপম শিল্প নিদর্শন। ওপরে দানবের মুখ আঁকা। পাথরের তৈরী—মাটির নয়. ঈস্টার দ্বীপের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট।

লড়াই লাগলে দ্বীপের মানুষ মূল্যবান সামগ্রী লুকিয়ে রেখেছিল ব্যাঙ্ক ভল্টের মত সুরক্ষিত এই গুহায়। কিন্তু—

মেয়রের ছেলেকে ডেকে বললেন থরসাহেব—জিনিসগুলো ভালই। কিন্তু বাবাকে বোলো. ওরোরোইনার গুহা এটা নয়।'

ফেরার পথে ফাদার সিবাসটিয়ানকে অভিযান বৃত্তান্ত বললেন থরসাহেব। গম্ভীর হয়ে গেলেন পাদ্রীসাহেব। মেয়র যে এত ধড়িবাজ, জানা ছিল না। :আরও একটা খবর দিলেন উনি। ঐ অঞ্চলেই এ রকম ব্যাঙ্ক-ভল্টের মত দুর্গম গুহা আরো আছে—খবর এনেছে দ্বীপবাসীরা।

খবরটা কিন্তু আগুনের মত ছড়িয়ে গেল। নেটিভরা দল বেঁধে মেয়রের বাড়ীর সামনে গিয়ে টিটকিরি দিল—স্লোগান ছাড়ল—'রিওরিও! রিওরিও! মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী।'

প্রতিক্রিয়া দেখা দিল আরও অনেক রকম। এতদিন যারা নিছক কাঠের মূর্তি বানিয়ে কম লাভ করেছে, তারা হঠাৎ রাতারাতি পাথরের মূর্তি বানাতে আরম্ভ করল—প্রাচীন মূর্তির অনুকরণ নয়—নিজস্ব কল্পনা ঢেলে নতুন ধরনের শিল্পসৃষ্টি। কলা পাতায় মুড়ে মূর্তিগুলো দাগী:করে নিয়ে এল দু-পয়সা লোটবার ফিকিরে। কেউ-কেউ আকু-আকু আতংক-মুক্ত হয়ে শ্যাওলা ধরা আসল পাথর গুহা থেকে বার করে এনে নতুন পাথর বলে চালান করতে চাইল—পাছে কেউ জেনে ফেলে এই ভয়ে। সিনর কোনটাইকিকে মেয়র যদি ধোঁকা দিতে পারে, তারা পারবে না কেন?

থরসাহেব এইটুকু বুঝলেন, আকু-আকু ভীতি কেটে যাচ্ছে—ঈস্টার দ্বীপবাসীরা অন্ধকার থেকে আলোয় আসছে। ভয় শুধু প্রতিবেশীদের ধারালো জিভকে—তাই এখনো এত লুকোচুরি।

নীরব রইল কেবল মেয়র। বাড়ী ছেড়ে আর সে বেরোয় নি। কালা-

মুখ কাউকে দেখায় নি। যেদিন তাঁবু গুটোনো হচ্ছে, সেইদিন ফের এল তার ছেলে। বাপ তার মিথ্যুক নয়। ওরোরোইনার গুহা আছে বৈকি। ফাদার সিবাসটিয়ানকে নিয়ে এলে হাতে হাতে প্রমাণ দেবে। সবাই মিলে যাবে ঐতিহাসিক সেই গুপ্ত গুহায়।

সেই রাতেই সদলবলে মেয়রের বাড়ী গেলেন সবাই। দু-হাত দু-পাশে ছড়িয়ে সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানালো মেয়র। ঘর বোঝাই চল্লিশটা পাথর খোদাই সাজিয়ে বসে আছে। এনেছে ওরোরোইনার গুহা থেকে। বিরাট গুহা কিনা- এত জিনিস আছে যে তাড়াতাড়িতে এর বেশী সে আনতে পারেনি।

কিন্তু কয়েকটা পাথর সদ্য নির্মিত।

থরসাহেব ভুরু কোঁচকালেন—'আবার কি চালাকি আরম্ভ করলেন? ওরোরোইনার গুহায় নিয়ে যাবেন কথা দিয়ে আমাদের ডাকিয়ে আনলেন কেন?'

'অনেক জিনিস রয়েছে যে সেখানে।'

'সেটা আগেই জানতেন। আপনিই তো বলেছেন। সব মূর্তি নিয়মিত ধোয়া মোছা করেন?'

'সব কি আর করতে পারি। এখন তো দেখলাম গুহার ভেতরে আরো জিনিস ঠাসা রয়েছে। আগে দেখিনি।'

'আপনিই কিন্তু বলেছিলেন। সমস্ত জিনিসের লিস্ট আপনার কাছে আছে।'

'আছে বই কি, কিন্তু জিনিসের নয়—গুহার।'

'তার মানে? কতগুলো গুহা আপনার আছে, তার ফর্দ?'

'হ্যাঁ। খুব ছোট্ট ফর্দ।'

'কত ছোট্ট।'

'এই এইটুকু.' বলে তর্জনী আর বুড়ো আঙুল তুলে মাপ দেখাল মেয়র। সাইজটা ডাকটিকিটের চেয়ে বড় নয়।

হাল ছেড়ে দিলেন থরসাহেব। চলে এলেন বিষণ্ণ মনে। দোর গোড়ায় মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে রইল মেয়র। সেই শেষবারের মত তাকে দেখলেন থরসাহেব। ঈস্টার দ্বীপের সবচেয়ে রহস্যময় ব্যক্তিত্ব—যার মাথায় এত গুপ্ত রহস্য যে বাস্তবের শেষ কোথায়, আর কল্পনার শুরু কোনখানে—সে মাত্রা বোধও হারিয়ে ফেলেছে। ঈস্টার দ্বীপ আজ হাজার রহস্যের দ্বীপ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই জাতীয় কিছু ব্যক্তির জন্য।

পরের দিন দ্বীপবাসীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং তাদের শুভেচ্ছা কুড়িয়ে জাহাজে উঠলেন থরসাহেব। লাইন দিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে রইল উপকূলে। অনেক দূর থেকেও একটা সাদা মূর্তিকে টিলার ওপর থেকে দেখতে পেলেন থরসাহেব।

ফাদার সিবাসটিয়ান। ঈস্টার দ্বীপের অজস্র অতিকায় মূর্তির মত তিনিও—শুধু যা রক্ত মাংসে নির্মিত।

লাল জীপটা এখন থেকে তাঁর। সারা দ্বীপে টহল দিয়ে জুতো ক্ষইয়ে সেবাশুশ্রূষা করেছেন অনেক দিন—এখন থেকে করবেন জীপে চেপে।

দিগন্তে হারিয়ে গেল হাজার রহস্যের দ্বীপ ঈস্টার আয়ল্যাণ্ড।

কাল্পনিক উপসংহার

অনস্তিত্ব আকু-আকু অপদেবতার সঙ্গে থরসাহেবের একটা কাল্পনিক কথোপকথনের সারাংশ দেওয়া যাক রোমাঞ্চকর এই বৈজ্ঞানিক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর উপসংহারে।

'আকু-আকু, আবার কেন চিমটি কাটছ বাপু? ঈস্টার দ্বীপ যখন ছেড়ে এসেছি, তোমার অস্তিত্ব ফুরিয়েছে।'

'না হে না, সিনর কোনটাইকি, যে আকু-আকুকে তুমি সৃষ্টি করেছো, সে কি আর তোমার সঙ্গছাড়া হয়? মেয়রের আকু-আকুর মতই পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যাবার ক্ষমতা যে পেয়েছি।'

'সর্বনাশ! মেয়রের আকু-আকু তো হাঁটু-সমান বেঁটে, পায়ে পায়ে ঘোরে—তুমিও কি তাই করছো?'

'দেখতে না পেলেও টের পাচ্ছ না?'

'উঁহু!'

'এই যে চিমটি কাটলাম তোমার পায়ের ডিমে—বেঁটে বলেই তো নাগাল পাচ্ছি না তোমার পিঠের।'

'আঃ লাগছে যে!'

'লাগবে, সিনর কোনটাইকি, লাগবে বইকি। যে কুসংস্কার সৃষ্টি করেছো, তার ফল ভোগ করবে না?'

'করেছি কি সাধে? আগুনকে যেমন আগুন দিয়ে নিভোতে হয়, কুসংস্কারকে তেমনি কুসংস্কার দিয়েই তাড়িয়েছি।'

'মস্ত কাজ করেছো। এবার বলো দিকি সিনর কোনটাইকি, ঈস্টার দ্বীপে

তুমি কি পেলে ?'

'অনেক কিছুই পেলাম। পেলাম ব্যাঙ্কভল্টের মত সুরক্ষিত বিস্তর গুপ্ত গুহা থেকে উদ্ধার করে আনা অগুন্তি পাথর খোদাই, আর, রোঙ্গো-রোঙ্গো বই আর দ্বীপবাসীদের রক্তের নমুনা। এই সব দিয়েই ঈস্টার দ্বীপের প্রাচীন মানুষদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য 'আবিষ্কার করবেন এথনলজিস্ট বিজ্ঞানীরা। সমাধান হয়ে যাবে অনেক রহস্যের—মেয়র নিজেই তো দুটো হেঁয়ালির সমাধান হাতে-নাতে দেখিয়ে দিল। বিরাট দানবমূর্তিগুলো যে পায়ে হেঁটে গিয়ে নিজে থেকে মন্দির বেদীতে দাঁড়ায়নি—এ-রহস্যের সমাধান তো হল। কিংবদন্তী কিংবদন্তীই থেকে গেল—সার্থক হল বৈজ্ঞানিক অভিযান।'

'অত বড়াই কোরো না হে সিনর কোনটাইকি। কিংবদন্তী তোমাকে সাহায্য না করলে পয়েক অন্তরীপের কাছে আইকো পরিখার সন্ধান তো পেতে না।'

'সে তো খুঁড়ে দেখার পর পেলাম।'

'কিন্তু কিংবদন্তী তো সত্যি হল। ওখানে যে একটা পরিখা আছে, এক-কালে যে বিরাট আগুন জ্বালানো হয়েছিল—কিংবদন্তীই তোমাকে তা জানিয়েছে, কেমন ?'

'তা ঠিক।'

'তবে আর কিংবদন্তীকে এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোরো না।'

'দেখো আকু-আকু, আমার কাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণা। বিজ্ঞান নিছক ঘটনা তুলে ধরে—সিদ্ধান্ত টানে না।'

'বটে! তাহলে বলো ঈস্টার দ্বীপের লম্বকর্ণরা এত কাণ্ডকারখানা করল ও দ্বীপে কিন্তু পলিনেশিয়ার অন্যান্য দ্বীপে দানবমূর্তি হল না কেন ?'

'তাহলে তো আবার বিজ্ঞানের কথা বলতে হয়।'

'বলোই না, শোনা যাক।'

'আধুনিক পণ্ডিতরা বলেন, লম্বকর্ণদের অনুকূলে গেছে ঈস্টার দ্বীপের মনোরম আবহাওয়া। বেশী শীতল আবহাওয়া। গাছ নেই। কাজেই পাথর খোদাইয়ের দিকে ঝুঁকেছে। আবহাওয়ার শীতলতার জন্যেই তারা প্রেমভালবাসার জীবন নিয়ে মেতে থাকেনি পলিনেশিয়ার অন্যান্য দ্বীপের মানুষের মত।'

'সিনর কোনটাইকি, ভাইকিংরা আইসল্যাণ্ডে আস্তানা গেড়েছিল। সেখানকার আবহাওয়াও শীতল, বৃক্ষ বিরল। কিন্তু ঈস্টার দ্বীপের মত একখণ্ড

পাথর কেটে দানোমূর্তি কেউ সেখানে বানায়নি। বানায়নি ইউরোপ, নর্থ আমেরিকা আর এস্কিমোদের পূর্ব পুরুষরা। এ বস্তু পাওয়া যায় কেবল মেক্সিকো থেকে পেরু পর্যন্ত মধ্য আমেরিকার একটানা নিরক্ষীয় অরণ্য অঞ্চলে।'

'কথাটা ঠিক', মাথা চুলকে বললেন থরসাহেব।

আকু-আকু বললে—'পলিনেশিয়ানদের হাতের কাছে পাথর থাকা সত্ত্বেও মূর্তি গড়তে কখনো বসেনি। পাথর খাদে নেমে চাঁই কেটে সময় নষ্ট করেনি। নিউজিল্যাণ্ডের শীতলতম অঞ্চলেও এ অভ্যেস কারো নেই। এ কাজ করতে গেলে দরকার বহু পুরুষের পাথর কাটার অভিজ্ঞতা। শুধু অভিজ্ঞতা থাকলেও হবে না। মেয়রের মত উন্মত্ত তাগিদ না থাকলে দুরূহ এই ব্রতে ব্রতী হতে কেউ চায় না। সিনর কোনটাইকি, তুমি শুষ্ক ঘটনা নিয়ে বড্ড ডুবে আছো। ঈস্টার দ্বীপের রোম্যান্টিক অতীত নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করো। নিয়তি বড নির্মম। সব জিনিস কি কর্নিক দিয়ে মাটি চেঁচে তোলা যায়।'

'আগেই বলেছি, আবার বলছি, বিজ্ঞানের-কর্তব্য নিছক গবেষণা। অনুমান সিদ্ধান্ত এখানে ঠাঁই পায় না।'

'বেশ তো বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী মশায়, বলো তো ঈস্টার দ্বীপের লাল চুলো প্রজাতিরা বিশ্বের কোন্ অঞ্চল থেকে এসেছিল?'

'প্রথম ইউরোপিয়ানরা যখন দ্বীপে পা দেয়, তখন তারা ছিল—এই-টুকুই কেবল জানি। মেয়র তাদেরই বংশধর। এর বেশী কিছু বলা মানেই—অবৈজ্ঞানিক কথা বলা।'

'লাল-চুলোরা ঈস্টার দ্বীপে এসেও কিন্তু লাল-চুলো কাউকে দেখেনি।'

'যা জানি না, তা নিয়ে একটা কথাও বলতে রাজী নই।'

'সিনর কোনটাইকি, তাহলে বলো তুমি কি-কি জানো। শোনবার পর বলব, আমি কি-কি জানি।'

'মহাপণ্ডিতের মত কথা যখন বলছো, তোমার কথাই আগে শোনা যাক।'

'ফাইন। সিনর কোনটাইকি, তোমার কি মনে হয় দ্বীপের আবহাওয়ার জন্যেই লাল চুলের সৃষ্টি হয়েছে?'

'ননসেন্স! লালচুলো মানুষ ঈস্টার দ্বীপে কোনো এককালে এসেছিল তো বটেই। আদিবাসীদের মধ্যেও লাল চুলো থাকা অসম্ভব নয়।'

'ধারে কাছে লাল চুলো মানুষ কোথাও আছে কি?'

'বেশ কয়েকটা দ্বীপে আছে। যেমন, মারকুইসাস দ্বীপপুঞ্জে।'

'মূল ভূখণ্ডে?'

'পেরুতে আছে। ইন্কা সাম্রাজ্য আবিষ্কারের সময় স্প্যানিয়ার্ডরা ইন্কা পরিবারের মানুষদের মাথায় লাল চুল দেখেছিল। গায়ের রঙও ছিল স্প্যানিয়ার্ডদের চেয়ে সাদা। মাথায় বেশ লম্বা। আ্যান্ডিজ ইন্ডিয়ানরা কিন্তু বেঁটে আর গাঢ় গাত্রবর্ণের। পেড্রো পিজারো হুবহু এই কথাই লিখে গেছেন। লাল চুল আর সাদা চামড়া দেখেছিলেন পেরুর বিশেষ কয়েকজনের ক্ষেত্রে। মামীদের বেলাও দেখা গেছে একই ব্যাপার। প্রশান্তের উপকূলে, পারাকাস-য়ের বালুকা মরুভূমিতে, মানুষের তৈরী বিরাট প্রশস্ত একটা ভূগর্ভ কবরখানা আছে। অসংখ্য মামীদেহ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে সেখানে। কাপড়ের আচ্ছাদন সরালে দেখা যায় কিছু মামীর চুল পুরু, শক্ত কালো—আজকালকার রেড ইন্ডিয়ানদের চুল যেরকম হয়। আবার একই পরিবেশে রাখা সত্ত্বেও কিছু মামীর চুল লাল, রেশমের মত হাল্কা, ঢেউ খেলানো—যেমন হয় আজকালকার ইউরোপীয়দের হয়। এদের আকৃতিও বেশ লম্বা, মাথার খুলিও লম্বাটে—আজকালকার পেরুভিয়ান ইন্ডিয়ানদের মত নয় মোটেই। কেশ বিশারদরা আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, নর্ডিক চুলের সঙ্গে মোঙ্গোল বা আমেরিকান চুলের যে তফাৎ, সে সব বৈশিষ্ট্যই মামী চুলে রয়েছে।'

আমু শাকু বললে—'অণুবীক্ষণে সব জিনিস তো আর ধরা পড়ে না—কিংবদন্তী কি বলে?'

'কিংবদন্তীতে কিছু প্রমাণিত হয় না।'

'কিন্তু কি বলে শুনতে ক্ষতি কী?'

'সাদা চামড়া লাল চুলোরা আসলে কারা, জিজ্ঞেস করেছিলেন পিজারো। ভিরাকোচাসদের শেষ বংশধর—জবাব দিয়েছিল ইন্কা ইন্ডিয়ানরা। ভিরাকোচাসরা নাকি স্বর্গের দূত শ্বেতকায়—দাড়ি ছিল তাদের। অবিকল ইউরোপীয়দের মত তাদের দেখতে। তাই ইন্কা সাম্রাজ্যে ইউরোপীয়রা পৌঁছোনো মাত্র তাদের ভিরাকোচাস্ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। ইতিহাস বলে, এই কারণেই মুষ্টিমেয় অনুচর নিয়ে ফ্রান্সিসকো পিজারো সটান ঢুকে যেতে পেরেছিলেন ইন্কাদের কেন্দ্রভূমিতে, সূর্যরাজকে গ্রেপ্তার করে দখল করেছিলেন তার বিপুল সাম্রাজ্য—কেশাগ্র স্পর্শ করারও সাহস হয়নি কারোর। দুর্মদ এবং বিপুল ইন্কা ফৌজ কাঠের পুতুলের মত কেবল দাঁড়িয়ে থেকেছে। ভেবেছে, ভিরাকোচাসরাই বুঝি

জাহাজে করে ফিরে এসেছে প্রশান্তের ওপর দিয়ে। ওদের মূল কিংবদন্তী অনুসারে, প্রথম ইঙ্কাদের রাজত্বের আগে সূর্যদেব কোনটাইকি ভিরাকোচা সমস্ত প্রজাদের নিয়ে পেরুর রাজত্ব চলে যান প্রশান্ত মহাসাগরে।'

'তারপর?' আকু-আকু যেন কৌতুক তরলিত।

'আনড্রেজ-এর লেক টিটিকাকায় এসে স্প্যানিয়ার্ডরা দেখেছিল দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বিরাট ভগ্নস্তূপ—টিয়াহুয়ানাকো। দেখেছিল অসংখ্য নরাকার প্রস্তর মূর্তি, দেখেছিল কিভাবে একটা আস্ত পাহাড় কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে থাকে থাকে বিশাল পাথরের গায়ে গায়ে সুন্দরভাবে সাজিয়ে। ইণ্ডিয়ানদের জিজ্ঞেস করেছিল এ কীর্তি কাদের। তারা বলেছিল, ইন্কারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্বেই বিস্মৃত এই স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল। স্প্যানিয়ার্ডদের মতই দাড়িওয়ালা শ্বেতকায় পুরুষরা নির্মাণ করেছিল বিস্ময়কর এই পিরামিড ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত নিজেদের-প্রস্তর মূর্তি ফেলে রেখে দিয়ে শ্বেতকায়রা তাদের দলপতি কোনটাইকি ভিরাকোচার সঙ্গে চলে যায় প্রথমে কাজকো তে। সেখান থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে। ভিরাকোচা একটা ইঙ্কা নাম—মানে, সমুদ্রের ফেনা। কারণ, তাদের গায়ের রঙ ছিল সাদা এবং ফেনার মতই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সমুদ্রের ওপর দিয়ে।'

টিটকিরি দিল আকু আকু—'বাহা! সেই তো বেশ ইন্টারেস্টিং তত্ত্ব পরিবেশন করছো।'

কিন্তু তাতে কিছুই প্রমাণিত হল না।'

'কিছুই হল না?' আকু-আকু যেন বিস্ময় বিস্মিত। 'মেয়র নিজে এই ধরনের লালচুলো ফ্যামিলির বংশধর। মেয়র নিজেকে লম্বকর্ণ দাবী করে—তার যে পূর্বপুরুষরা ঈস্টার দ্বীপের প্রস্তর মূর্তিগুলো বানিয়েছে, তারাও নিজেদের লম্বকর্ণ বলেছে। এত মেহনৎ করে কান বিঁধিয়ে ওজন ঝুলিয়ে কাঁধ পর্যন্ত কান লম্বা করার ব্যাপারটা কি অদ্ভুত বলে মনে হয় না। এত রকমারির কারণটা নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে যায় না?'

'অদ্ভুত ভাবলেই অদ্ভুত—আসলে এর ভেতরে অদ্ভুত বলে কিছুই নেই। এ-রীতি মারকুইসাস দ্বীপপুঞ্জেও ছিল। বোর্নিওতেও ছিল। আফ্রিকার কিছু কিছু জাতির মধ্যেও ছিল।'

'পেরুতে ছিল না?'

'ছিল বই কি। স্প্যানিয়ার্ডদের লেখায় সে খবর পাওয়া গিয়েছে। শাসক ইঙ্কা ফ্যামিলিরা নিজেদের ওরিজোন্স বলতো—যার মানে লম্বকর্ণ। প্রজাদের কান লম্বা ছিল না—কিন্তু রাজাদের কান কৃত্রিমভাবে লম্বা করে

দেওয়া হত। ভাব গম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওজন ঝুলিয়ে। পেড্রো পিজারো লিখেছেন, বিশেষ করে এই লম্বকর্ণরাই ছিল শ্বেতকায়।'

'সিনর কোনটাইকি, এবার বলতো বাপু কিংবদন্তী কি বলে।'

'ঈস্টার দ্বীপের কিংবদন্তী বলে, কান লম্বা করার এই রীতি নাকি আমদানী করা হয়েছিল দ্বীপের বাইরে থেকে। প্রথম যে রাজা সমুদ্রযাত্রার উপযোগী জাহাজে চেপে পূব দিক থেকে রওনা হয়ে সূর্যাস্তের দিকে ষাট দিন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসে নেমেছিল ঈস্টার দ্বীপে, তার কান ছিল লম্বা।'

'পূব দিক থেকে? কিন্তু পূর্ব দিকেই তো ইঙ্কা সাম্রাজ্য ছিল। কিংবদন্তী কি বলে?'

'বলে যে পশ্চিমাভিমুখে সমুদ্র যাত্রা করার সময়ে কোনটাইকি ভিরাকোচার সঙ্গে ছিল লম্বকর্ণরা। লেক টিটিকাকা থেকে বেরিয়ে উত্তরে কাজকো-তে গিয়েছিল ভিরাকোচা—সেখান থেকে প্রশান্তের উপকূলে। কাজকোয় নিয়োগ করেছিল আলকাভাইজা নামে এক সর্দারকে—হুকুম দিয়েছিল তার প্রস্থানের পর উত্তরসূরীদের প্রত্যেকের কান যেন লম্বা করা হয়। লেক টিটিকাকায় পৌঁছে স্প্যানিয়ার্ডরাও ইণ্ডিয়ানদের মুখে শুনে ছিল, লেক টিটিকাকার জলে নলখাগড়ার তৈরী নৌকোয় যারা চাপত, তাদের কান ছিল লম্বা, দলপতির নাম ছিল কোনটাইকি ভিরাকোচা। কান বিঁধিয়ে ইয়া মোটা তোতোরা আঁটি ফুটোয় ঢুকিয়ে রেখে নিজেদের বলতো 'রিনগিম'—যার মানে 'কান'। ইণ্ডিয়ানরা বলে, টিয়াহুয়ানাকোতে পরিত্যক্ত একশ টনেরও বেশী ওজনের অতিকায় পাথরের চাঁই তুলতে এবং বয়ে নিয়ে যেতে কোনটাইকি ভিরাকোচাকে সাহায্য করেছিল এই লম্বকর্ণরাই।'

'কিভাবে অতিকায় পাথরের চাঁই এভাবে নাড়াচাড়া করেছিল, তা জানা আছে কি?'

'কেউ জানে না, কি ভাবে। গুপ্তরহস্য সংরক্ষণের জন্য কোনো মেম্বর রেখে যায়নি টিয়াহুয়ানাকোর লম্বকর্ণরা। কৌশলটা উত্তরসূরীদের শিখিয়ে দেওয়ার মত কেউ আর ছিল না। কিন্তু ঈস্টার দ্বীপের রাস্তার মতই তারাও পাথর বাঁধিয়ে রাস্তা তৈরী করেছিল। কিছু কিছু বিশালতম পাথরের চাঁই নিশ্চয় নলখাগড়ার নৌকোয় চাপিয়ে লেক টিটিকাকার ওপর দিয়ে তিরিশ মাইল দূরে বয়ে এনেছিল—কেন না এই বিশেষ যে পাহাড় থেকে তাদের কেটে বার করতে হয়েছে, সে পাহাড় রয়েছে লেকের অন্য প্রান্তে—

ইঙ্কাদের পূর্বপুরুষরাও যে সমুদ্র-অভিযাত্রী ছিল—এই অনুমান করতে বাধা আছে?'

'না, নেই। তারা যে ঘন ঘন গ্যালাপাগোজ দ্বীপপুঞ্জে গেছে, আমরা তা জানি। এও জানি যে দীর্ঘকায় লালচুলো মামাদের যেখানে পাওয়া গেছে সেই প্রাচীন ইঙ্কা ভেলার মধ্যে ভেলার মাঝের পাটাতনও পাওয়া গেছে—মুঠোয় ধরার মত কারুকাজ করা হাতল সমেত। মাঝের পাটাতন পাল ছাড়া ব্যবহার করা যায় না। জলপোত ছাড়া কোথাও পাল থাকে না। এ একটি মাঝের পাটাতন থেকেই প্রাচীন পেরুর নৌচালনাবিদ্যে সম্বন্ধে যে খবর জানা যায় তা কিংবদন্তী বা পরিত্যক্ত সামগ্রী থেকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়।'

'তাহলে তোমাকে আরও কিছু বলা যেতে পারে।'

'কিন্তু আমি শুনতে চাই না। কারণ, তোমার রোগ হল সিদ্ধান্ত টেনে নেওয়া। নিছক ধারণায় মন ওঠে না তোমার। আমি যা করেছি, তা বৈজ্ঞানিক অভিযান—টিকটিকিগিরি নয়।'

'মানলাম,' জবাব দিল আকু আকু—'কিন্তু চোরকে ধরার চেষ্টা না করে কেবল আঙুলের ছাপ সংগ্রহ অভিযান ক'রে গেলে মূর্তিগুলো ইঙ্কাদ বেশীদিন যেতে পারে কি?

থতমত খেয়ে গেলেন সাহেব।

আকু আকু বলে চলল সকৌতুকে—'ইস্টার দ্বীপে লালচুলো লম্বকর্ণরা লালঝুঁটিওলা লম্বকর্ণ মূর্তি বানিয়েছে। এ কাজ তারা করে থাকতে পারে দুটো কারণে। হয় কনকনে হাওয়ায় জড়োসড়ো হয়ে না থেকে গা গরম করতে চেয়েছিল। অথবা, এমন একটা দেশ থেকে তাদের আবির্ভাব ঘটেছিল যে দেশে বিরাট মূর্তি নির্মাণ এবং খাড়া করায় তারা নৈপুণ্যে অভ্যস্ত ছিল। এদের পরেই কিন্তু আসে হ্রস্বকর্ণরা। তারা পলিনেশীয় ঠাণ্ডায় জড়োসড়ো হয়নি বরং ঈস্টার দ্বীপে এত কাঠ পেয়েছিল যে মনের আশা মিটিয়ে দারুমূর্তি নির্মাণ করে গেছে। পাখী মানুষের মূর্তি খোদাই করেছে। দাড়ি, লম্বা কান আর বাঁকানো ইঙ্কা নাকওলা রহস্যজনক পিশাচ মূর্তি খোদাই করেছে। কোত্থেকে এল এই হ্রস্বকর্ণরা?'

'পাশের মার্কেসাস অথবা অন্যান্য দ্বীপ থেকে।'

'পলিনেশিয়ানরাই বা এল কোত্থেকে?'

'ভাষার সাদৃশ্য দেখে মনে হয় তাদের সঙ্গে দূর সম্পর্ক রয়েছে মালয় দ্বীপপুঞ্জের খর্বকায় চ্যাপ্টা-নাক মানুষদের। এই দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে এশিয়া আর অস্ট্রেলিয়ার মাঝখানে।'

'সেখান থেকে পলিনেশিয়ায় এল কেমন করে?'

'কেউ তা জানে না। মালয় দ্বীপপুঞ্জ আর পলিনেশিয়ার মধ্যে কোনো দ্বীপে অথবা সে চিহ্ন পাওয়া যায় নি। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়

এশিয়ার উপকূলের সমুদ্র স্রোত ধরে তারা পৌঁছেছিল উত্তর পশ্চিম আমেরিকায়। অনেক চমকপ্রদ নিদর্শন মেলে সেখানকার উপকূলে। এই জায়গা থেকেই সেখানকার পেল্লায় ডবল ডেক ওলা ক্যানোয় চেপে একই স্রোতে তরী ভাসিয়ে হাওয়ার ঠেলায় হাওয়াই যাওয়া এবং সেখান থেকে অন্যান্য দ্বীপে ছড়িয়ে পড়া অসম্ভব নয়। একটা বিস্ময় পরীক্ষার জানা গেছে: ঈস্টার দ্বীপে এরা পৌঁছেছিল সবশেষে—ইউরোপীয়রা সে দ্বীপে পৌঁছোনোর প্রায় একশ বছর আগে।'

'তাহলে যদি লম্বকর্ণরা এসে থাকে পুব থেকে আর হ্রস্বকর্ণরা এসে থাকে পশ্চিম থেকে, তাহলে এই সমুদ্রে দুই দিকেই পাল তুলে যাতায়াত সম্ভব।'

'নিশ্চয় সম্ভব। এদিকে যাওয়ার চেয়ে অবশ্য হাওয়ার গুণে সহজ এক দিকে যাওয়া। আমাদের আদি আত্মীয়দের ব্যাপারটাই দেখ না কেন। আমেরিকা আবিষ্কারের আগে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোয় যাওয়ার চাবি কাঠির সন্ধান কেউ রাখত না। ইন্দোনেশিয়ায় ঘাঁটি ছিল ইউরোপীয়দের। সেখান থেকে দীর্ঘদিন এশিয়া উপকূল বরাবর যাতায়াত করেছে। কিন্তু বিপরীত বাতাস আর স্রোত ঠেলে উন্মুক্ত প্রশান্তে তারা অভিযান চালায়নি। কলম্বাস ইউরোপীয়দের আমেরিকায় নিয়ে যাবার পর সেখান থেকে পর্তুগীজ আর স্প্যানিয়ার্ডরা বাতাস আর স্রোতের পেছন-ঠেলা পেয়ে আবিষ্কার করেছে উদার বিশাল প্রশান্তকে। বস্তুত: পলিনেশিয়া আর মেলানেশিয়াকে সম্পূর্ণ আবিষ্কার করে স্প্যানিয়ার্ডরা। পেরু থেকে সমুদ্র স্রোত অনুসরণ করেছিল তারা—পথ নির্দেশ এসেছিল কিন্তু ইন্‌কা নাবিকদের দিক থেকে। এমন কি এশিয়ার উপকূল লগ্ন যে মাইক্রোনেশিয়া—মানে পালক [illegible] [illegible] দ্বীপ গুলোকেও সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে দক্ষিণ আমেরিকা। স্বভাবতই প্রশান্ত মহাসাগরে রওনা হয় একটার পর একটা অভিযান—সবই কিন্তু আমেরিকা থেকে—এশিয়া থেকে একটিও নয়। প্রশান্ত মহাসাগরের বুক দিয়ে আসতে সে-পথ দিয়ে ফেরার ক্ষমতা তখনকার জাহাজগুলোর ছিল না। দু-শ বছর জাহাজ বেরিয়েছে মেক্সিকো আর পেরু থেকে, প্রশান্তের নিরক্ষীয় অঞ্চল পেরিয়ে গেছে পশ্চিম দিকে এশিয়ার উপকূলে, কিন্তু আমেরিকায় ফেরার সময়ে তাদের প্রত্যেককে যেতে হয়েছে উত্তর দিকে জাপানী স্রোতের সঙ্গে উত্তর প্রশান্তের ধূ ধূ পথ পরিক্রমা করে হাওয়াইয়ের অনেক ওপর দিয়ে। ইউরোপীয় জাহাজ ও-পথে যতটা আশা করা যায় তার বেশী মালয় ক্যানো বা ইন্‌কা বালসা ভেলা অথবা নলখাগড়ার নৌকো আশা করাটা ঠিক হবে না আমাদের পক্ষে।'

দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল আকু-আকু। আচমকা ঘুম জড়ানো গলায় বললে—'কি কথা হচ্ছিল?'

'হ্রস্বকর্ণদের কথা হচ্ছিল। মালয়-বাসীদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় তারা।'